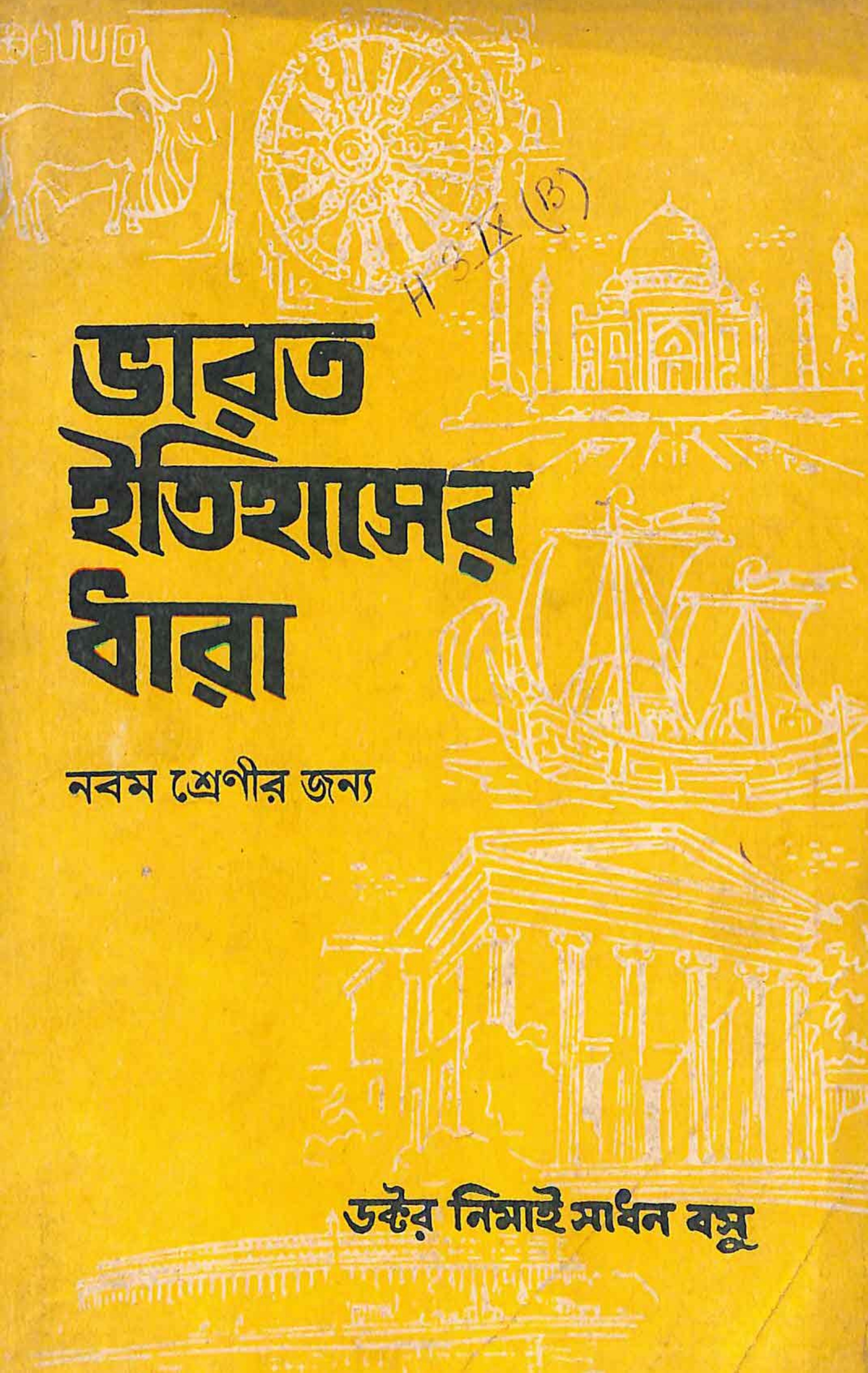


ভারত ইতিহাসের ধারা

নবম শ্রেণীর জন্য

ডক্টর নিমাই সাধন বসু

H 3 IX (B)

4617
10.7.89

Approved as a textbook for Class IX by the West Bengal
Board of Secondary Education,
Vide Notification No. T. B. SYLL/H/IX/87/89, dated 13.11.87

ভারত-ইতিহাসের ধারা

প্রথম খণ্ড

(নবম শ্রেণীর জন্য)

ডক্টর নিমাইসাধন বসু, এম. এ. (ক্যাল.), পি.-এইচ্. ডি. (লণ্ডন),
ডি. লিট্. (লণ্ডন),
প্রফেসর অফ্ হিস্ট্রি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়;
ভারতবর্ষের ইতিহাসের 'ভিজিটিং প্রফেসর', দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
(১৯৭৮-১৯৮০)
এবং
ভূতপূর্ব রিসার্চ ফেলো, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৬-১৯৬৭)
বর্তমানে উপাচার্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

বুক ফোরাম প্রাঃ লিঃ
৩৮, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯
১৯৮৮

BOOK FORUM (P) LTD.,
CALCUTTA-700009

.C.E.R.T., West Bengal
Date 10 7 89
Acc. No. 4617

Copyright © Dr. Nemaisadhan Bose, 1987

H IX
NIM

First Edition December, 1987
According to New Syllabus

Published by A. Kar for Book Forum (P) Ltd., 38 Surya Sen Street, Calcutta-700 009 and Printed by Prabartak Printing & Halftone Ltd. 52/3, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12.

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে 'ভারত ইতিহাসের ধারা' রচিত হয়েছে। নীরস ও অপ্রয়োজনীয় নাম, সন-তারিখ, ঘটনা ইত্যাদি উল্লেখ করে ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিশক্তি ভারাক্রান্ত ও ইতিহাসপাঠে নিরুৎসাহ না করে তাদের ভারতীয় ইতিহাসের মূলধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য, ঐতিহাসিক ঘটনার কার্য-কারণ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও আধুনিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান সন্নিবিষ্ট করে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে সম্ভাব্য প্রশ্নও পরিশেষে যোগ করা হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরের প্রতি দৃষ্টি রেখে পাঠ্য-পুস্তক রচিত হওয়া উচিত নয়। জাতীয় ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিস্ফুট হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই গ্রন্থ রচনাকালে সীমিত পরিসরের মধ্যেও সেই দিকে লক্ষ্য রেখেছি। ভারতের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য, ভারত-সংস্কৃতির বৈচিত্র, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির উন্মেষ, ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ ও ঐতিহ্য, বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করে তোলা এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য। কতখানি সফল হয়েছি তার বিচার করবেন সহৃদয় শিক্ষকমণ্ডলী। এই গ্রন্থের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত অমূল্য ও অপরিহার্য বলে মনে করি। পূর্ববর্তী পাঠ্যক্রম অনুসারে রচিত ভারত-ইতিহাসের ধারা শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রছাত্রীদের সমাদর লাভ করেছিল। আশা করি এই গ্রন্থটিও অনুরূপ সমাদর লাভ করবে।

এই গ্রন্থ রচনায় অনেকের পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীঅজিত কুমার রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন
৯ মে, ১৯৮৭

নিমাইসাধন বসু

TRUE COPY

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
77/2, Park Street, Calcutta-16.

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX.

Page

Chapter—I : *Geography & History* : 5

(a) Chief physical features of the Indian subcontinent and its main othnic elements ;

(b) Influence of Geography on History;

(c) The Fundamental unity;

(d) Source of ancient Indian History.

Chapter—II : *Dawn of Indian Civilisation* : 5

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of cultures.

(b) Harappan Civilisation (Chalcolithic) Chief features—its antiquity (with special reference to its extent, urban character, town planning, and social, economic and religious life), relations with outside world.

Chapter—III : *The Vedic Age* : 9

(a) The "Aryans"—their original homeland; Their first literary work in India—the Rig Veds;

(b) Vedic literature; Later *Samhitas*, *Brahmans*, *Aranyakas*, *Upanishadas* and *Sutras*;

(c) Life of the people as reflected in the Vedic literature—

(i) Social, economic and religious life and political and administrative activities of the people as known from the Rig-Veds;

(d) (ii) later developments;

(d) Expansion of Vedic culture in the subcontinent;

(e) Beginning of the Iron Age.

Chapter—IV : *Protest Movement* : 10

(a) Social, economic and religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age-old Vedic or Brahmanical culture;

(b) Jainism and Buddhism;

(c) Lives and teachings of the Buddha and Mahavir;

Chapter—V : *The Age of Imperialism and Political Unification.*

(a) Reference to sixteen Mahajanapadas.

(b) A bare outline of the history of the growth of the power of Magadha from the days of Bimbisara to the rise of the Mauryas; 2

(c) History of the Maurya empire—with special reference to the periods of Chandragupta (his achievements, administration of the age as known from the account of Megasthenes and the *Arthasastra* of Kautilya dated generally to the Maurya Age) and Asoka (his conquest of Kalinga, limits of his empire, propagation of Buddhism and his Dharma, his humanitarian work, his contacts with outside world and his place in world history). 6

Page

(a) Mughal—Afghan contest—its nature—a brief narrative of the building up of an empire by Sher Shah—special stress on the administrative and revenue systems. Sher Shah's contributions—a brief reference to the re-establishment of the Mughal power. 3

(b) Widening of the empire and its consolidation by Akbar: Stress on the methods by which Akbar achieved it: (detail of the wars to be omitted)—foundation of a new administrative system—Jagirdari system—revenue system—cultural life; Din-i-Ilahi—Akbar's Court—His building activities. 7

(c) Jahangir and Shahjahan: Assessment as rulers: particular stress on their patronage of art and architecture—Their policy towards European traders. 4

(d) Aurangzeb: a short note on the wars of succession—stress on two developments in the political sphere: further widening of the empire on the one hand, and the emergence on the other of certain conditions which tended to weaken the imperial authority: Roots and nature of his troubles in Northern and North-western India; the Deccan polity—Shivaji and the first phase of the Mughal—Maratha conflict—organisation of the civil and military administration by Shivaji—assessment of Shivaji as a ruler—the far-reaching consequences of Aurangazeb's Deccan wars—organisation by Aurangazeb of the civil and military administration—His religious policy—his character and personality—a brief estimate as a ruler. 10

(e) Activities of the European Trading companies (a brief outline). 3

3. India under the Mughals: Political unification of a large part of India—measures in connection with the assertion of the Central Authority—the Mughal rulers and Jagirders—land revenue system—the ruler society of India in the eyes of foreigners—trade, industry and commerce—European traders—special emphasis on the cultural life: art, architecture, paintings, literature—history writing—music—some reference to some distinctive regional cultures. 7

HISTORY OF INDIA : 1707—1947.

1. Decline and disintegration of the Mughal Empire—beginning of the process during Auranzeb's time—threats to the Mughal Empire from different quarters—drain on the imperial finances due to wars—implications of the fast increasing jagirs, while the revenue income did not increase—increased factionalism in the Mughal Court—different parties and factions—weakness of the successors of Aurangzeb—power struggle—the nobles etc. further consolidated their powers—Central control over the different Subas and regions gradually disappeared,—effects of the invasion of Nadir Shah. 7

2. *Growth of regional powers* (emphasis on those, whose encounters with the British affected the later political scene). 8

(i) The regions to be particularly studied Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise of the Sikhs upto Guru Govind—

(ii) Growth and decline of the Marathas (till 1761)—Expansion of the Maratha Power—Third battle of Panipath (1761)—its impact.

3. Growth of European Commerce and conflict among European trading Companies—Anglo French conflict—Carnatic: the first area of conflict—Effects of the Anglo-French rivalry in

সূচীপত্র

প্রাচীন ভারত

মধ্যকালীন ভারত
(১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত)

মুঘল যুগ

(১৫২৬-১৭০৭)

ভারতের ইতিহাস

(১৭০৭-১৮৫৭)

প্রাচীন ভারত

প্রথম অধ্যায় | ভূগোল ও ইতিহাস

ভূমিকা

ইতিহাসের নায়ক মানুষ। তার প্রচেষ্টা, প্রয়াস, চিন্তা, সংগ্রাম ও পরিবর্তনই ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু। রাজা-মহারাজার ব্যক্তিগত কাহিনী, রাজ্যজয় বা যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণই কোন দেশের প্রকৃত ইতিহাস হতে পারে না। সাধারণ মানুষের নিরন্তর অগ্রগতির সংগ্রামই ইতিহাসের মুখ্য প্রসঙ্গ। এই অগ্রগতির প্রকৃতি, বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জাতিবৈচিত্র্য

ভৌগোলিক সীমা

ভারতের ভূখণ্ডকে প্রাচীন ভৌগোলিকরা "চতুঃ সংস্থান সংস্থিতম" বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ভারতের চতুর্দিক সুসংস্থিত। ভারতের আয়তন বিশাল, ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী। উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে তার গগনচুম্বী বিশাল বিস্তার। ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর। বহু জাতি, বহু সম্প্রদায় ও বহু ভাষাভাষী মানুষের সমন্বয় হয়েছে এই ভারত ভূমিতে। তাই ভারতবর্ষ উপমহাদেশ নামে অভিহিত।

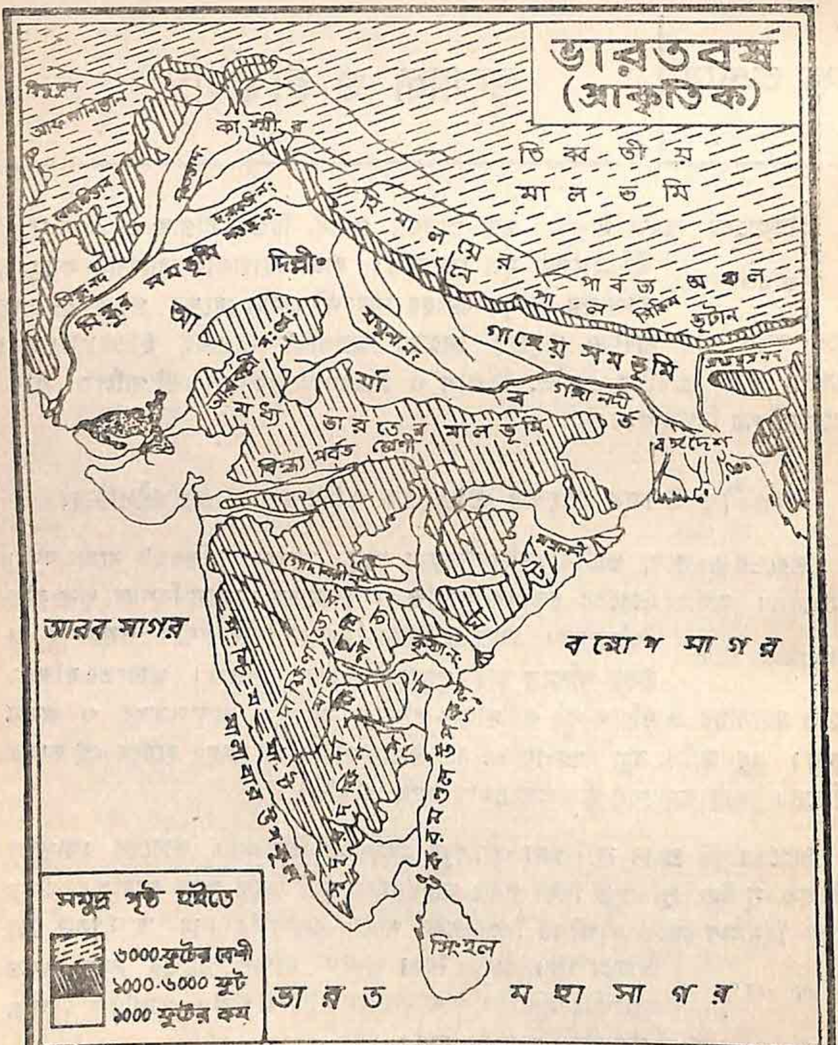
বিন্ধ্য পর্বত

ভারতের দুই প্রধান নদী গঙ্গা ও সিন্ধুর উৎসস্থলে হিমালয়। ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত সু-উচ্চ সুবিস্তৃত বিন্ধ্য পর্বত ভারতবর্ষকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর দিকে হিমালয় থেকে দক্ষিণের বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত অঞ্চলটির নাম **আর্যাবর্ত** বা **উত্তরাপথ**। আর বিন্ধ্য থেকে দক্ষিণ প্রান্তের সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চলটির নাম **দাক্ষিণাত্য** বা **দক্ষিণাপথ**। প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে ভারতবর্ষকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ভারতবর্ষের প্রধান পাঁচটি প্রাকৃতিক বিভাগ

(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলঃ** হিমালয় সংলগ্ন কাশ্মীর, কাংড়া, নেপাল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি রাজ্য এই অঞ্চলভুক্ত। এই ভূভাগকে 'হিমালয় অঞ্চল' বলা হয়।

(২) **সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমতল অঞ্চলঃ** ভারতের ইতিহাসে এই অঞ্চলটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ হিমালয় থেকে উৎসারিত


ভারতবর্ষ
(প্রাকৃতিক)
তি ব্ব তী য়
মা ল ভূ মি
কাশ্মীর
দিল্লী
গাঙ্গেয় সমভূমি
মধ্য ভারতের মালভূমি
বিন্ধ্য পর্বত শ্রেণী
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
সিংহল
ভা র ত ম হা সা গ র
সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে
৩০০০ ফুটের বেশী
১০০০-৩০০০ ফুট
১০০০ ফুটের কম

সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত সমতল প্রদেশেই বহু প্রাচীন সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু নদের নিম্ন উপত্যকার সিন্ধু প্রদেশ এখন পাকিস্তান সীমানাভুক্ত।

(৩) **মধ্যভারতের মালভূমিঃ** উপরোক্ত অঞ্চলের দক্ষিণে এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর উত্তরে এই অঞ্চলটির অবস্থান।

(৪) **দক্ষিণাপথের মালভূমিঃ** বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ দিকে দাক্ষিণাত্যের এই অধিত্যকা। এই সুবিশাল অঞ্চলের পশ্চিম দিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং পূর্বদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা। গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে।

(৫) **সুদূর দাক্ষিণাত্যঃ** কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ থেকে শুরু করে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত মালভূমি অঞ্চলকে 'সুদূর দাক্ষিণাত্য' বলা হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের মানুষ ও জাতিবৈচিত্র্য

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) ভারতবর্ষকে 'নৃতাত্ত্বিক যাদুশালা' বলে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসের সূচনাকাল থেকে শুরু করে কাল-স্রোতে ভারতবর্ষের বুকে কত যে বিভিন্ন জাতির আগমন, মিলন ও সমন্বয় ঘটেছে তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। বিশ্বের মানুষের মিলনভূমি ভারতকে রবীন্দ্রনাথ 'পুণ্যতীর্থ' এবং 'মহা-মানবের সাগরতীর' বলে বন্দনা করেছেন। প্রাচীন ভারতের দুই প্রধান জাতি ছিল আর্য ও দ্রাবিড়। এই দুই জাতির মধ্যে প্রথম উন্নতিলাভ করেছিল দ্রাবিড়রা। দ্রাবিড় সভ্যতার পর উন্নত হয় আর্য সভ্যতা। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন বিদেশী জাতির আগমন। ভারতের সীমান্ত দিয়ে পর পর আসতে থাকে পারসীক, গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতি। ক্রমে ক্রমে এই সব জাতি ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে এই দেশের জনসমুদ্রে মিশে যায়। মধ্যযুগেও বৈদেশিক আগমনের স্রোত বন্ধ হয়ে যায়নি। ইসলাম ধর্মাবলম্বী যে সব জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বসবাস বা রাজ্য স্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে ছিল তুর্কী, আফগান, মোঙ্গল এবং আবিসিনীয়রা। আরও পরে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে জলপথে ভারতবর্ষে এসে বসবাস করতে শুরু করে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরাজ ও ফরাসী প্রমুখ বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে ভারত-জনমণ্ডলী সমৃদ্ধ হয়েছে।

ভারতবর্ষ বহুজাতির মিলনভূমি

দেহের গঠন ও ভাষার ভিত্তিতে সাধারণতঃ ভারতের জনসাধারণকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়ঃ

ভারতের প্রধান জাতিবিভাগ

নর্ডিক আর্যজাতিঃ এই জাতি ছিল সুদর্শন, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়। প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের বসবাস।

দ্রাবিড় জাতি ঃ দ্রাবিড় জাতির বাসভূমি ছিল দাক্ষিণাত্য। দেহের গড়ন, সামাজিক প্রথা, ভাষা ও সংস্কৃতি সকল দিক থেকেই দ্রাবিড়রা আর্যদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

নেগ্রিটো জাতি ঃ আফ্রিকার নিগ্রো জাতি থেকে উদ্ভূত নেগ্রিটো জাতিভুক্ত মানুষ কৃষ্ণবর্ণ, খর্বকায় ও খর্বনাসা। এই জাতির মানুষ এখন খুব বিরল। আন্দামান-নিকোবর, আসাম ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে নেগ্রিটো জাতির মানুষের বসবাস আছে।

মোঙ্গলীয় জাতি ঃ এই জাতিভুক্ত মানুষের গায়ের রং হলদে, মুখ এবং নাক চ্যাপ্টা। গোঁফদাড়ি প্রায় নেই। এরা আস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চলে এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় এই জাতির মানুষ বাস করে।

কোন ভারতীয়েরই জাতিগর্ব করার কারণ নেই

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন ভারতীয়েরই নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ মনে করে গর্ববোধ করার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নেই। বিভিন্ন জাতির মেলামেশা ও সামাজিক যোগসূত্রের ফলে একের সঙ্গে অপরের রক্ত মিশে গেছে। ভারতের প্রতিটি মানুষ এক বিরাট মানবগোষ্ঠীর অংশ মাত্র। এই তার প্রকৃত ও সঠিক পরিচয়।

ইতিহাসে ভৌগোলিক প্রভাব

ইতিহাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক

যে কোন দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা 'নীল নদের দান' রূপে খ্যাত। সুমের ও ব্যাবিলনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী এবং তাদের উপত্যকাকে কেন্দ্র করে। ভৌগোলিক পরিবেশ প্রাচীন গ্রীসদেশের অধিবাসীদের সামুদ্রিক বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনে সহায়তা করেছিল। পৃথিবীব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ভিত্তি ছিল বৃটিশ নৌশক্তি। চারদিকে জল-পরিবেষ্টিত দ্বীপে বাস করার জন্যই ইংরাজ জাতি নৌবাহিনীর বিশেষ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ও চারিত্রিক গঠন ঐ দেশের ভৌগোলিক সীমানার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস ও জীবন এই ঐতিহাসিক সত্যের ব্যতিক্রম নয়।

ভারতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব ঃ পর্বতশ্রেণী ও অসংখ্য ছোট বড় নদনদী ভারতের ইতিহাস ও জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। পর্বত ও সমুদ্রবেষ্টিত একটি সুসংহত সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক একক (entity) হিসাবে ভারতের অবস্থান। এই ভৌগোলিক অবস্থিতি ভারতীয় জনমানসে রাজনৈতিক ঐক্যবোধ জাগাতে সাহায্য করেছে। গিরিরাজ হিমালয় উত্তর সীমান্তে ভারতবর্ষকে এশিয়া মহাদেশ তথা

বিশ্বের অন্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। হিমালয় প্রাচীরের অন্তরালে অবস্থিত ভারত শুধুমাত্র মধ্য এশিয়ার শুষ্ক শীতল বায়ু বা সেখানকার যাযাবর জাতিসমূহের নির্বাধ আক্রমণ থেকেই রক্ষা পায়নি, নিজস্ব মৌলিক সংস্কৃতি গড়ে তোলারও অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু হিমালয় কোন দিনই সম্পূর্ণ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল না। উত্তর-পশ্চিমের খাইবার, বোলান, গোমল, কারাকোরম প্রভৃতি বিভিন্ন গিরিপথ দিয়ে যুগ যুগ ধরে ব্যবসায়ী, ভাগ্যান্বেষী ও রাজ্যলোভীরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। ঐ একই পথ ধরে ভারতীয় পণ্যসামগ্রী ও সংস্কৃতি বাইরের জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। গিরিপথগুলিই ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণ ও বৈদেশিক কর্তৃত্ব স্থাপনে সহায়তা করেছে। গ্রীক, শক, হূণ, পাঠান ও মুঘলরা গিরিপথগুলি অতিক্রম করেই ভারতে এসেছিল। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীকরাজ্য, শকরাজ্য, কুষাণ সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার মূলে গিরিপথগুলির বিশেষ ভূমিকা ছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গিরিপথগুলির বিশেষ প্রভাব ছিল। ভারতবর্ষের জাতি-বৈচিত্র্য এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বিত রূপের জন্যও গিরিপথগুলির প্রভাব স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গিরিপথের প্রভাব

ভারতের জনজীবন ও অর্থনীতি চিরকালই প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে মৌসুমী বায়ু ও বৃষ্টিপাত এই দেশের কৃষিকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে প্রকৃতির লীলার গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। প্রসন্না প্রকৃতিদেবী যেমন ঢেলে দেন প্রাচুর্য তেমনি তাঁর রুদ্রাণীরূপ সৃষ্টি করে বন্যা, অনাবৃষ্টি ও মহামারী। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা প্রাচীন যুগের মানুষের ছিল না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ ছিল নিষ্ফল। ফলে প্রাচীন ভারতের মানুষ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকে সমানভাবে মেনে নিত।

ভারতীয় মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রাকৃতিক প্রভাব

'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' দেশ ভারতবর্ষ। এ দেশের উর্বর মাটিতে নানা রকমের শস্য ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ভারতে তেল, কয়লা, লোহা, অভ্র, সোনা প্রভৃতি খনিজ সম্পদ রয়েছে। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভারতীয় বণিকরা ভোগ করে এসেছে। অন্য দিকে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য বিদেশী শত্রুর লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বারবার। এর ফলে ভারতের বুকে একাধিকবার বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুফল ও কুফল

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দীর্ঘ অবসর ভারতীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পচর্চা ও ধর্মসাধনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ভারতীয় জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে হিমালয়, বিন্ধ্য প্রমুখ পর্বতশ্রেণী, গভীর অরণ্যরাজি, গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, কৃষ্ণা, গোদাবরী ইত্যাদি নদনদী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে।

জ্ঞানচর্চা ও ধর্ম-সাধনার সুবিধা

আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াত খুব সহজসাধ্য ছিল না। ফলে উত্তরের আর্যসভ্যতা ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সভ্যতা এক বৃহত্তর ভারত সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও নিজের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য রক্ষা করে প্রবাহিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক ঐক্যের পথে প্রাকৃতিক বাধা

কিন্তু বিন্ধ্য দুর্লঙ্ঘ্য না হওয়াতে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ একই ভৌগোলিক পরিধির অংশ হয়ে থাকা সম্ভব হয়েছে। নদনদী, পর্বত, মরুভূমি ও দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথ ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মিলনের পথে অন্তরায় হয়েছে। ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ খুব সহজ ছিল না।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাব ভারতীয়দের চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গী ও বৃত্তিগত পার্থক্যেও লক্ষ্য করা যায়। পর্বত, অরণ্য বা মরু অঞ্চলের মানুষ কঠোর পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও নির্ভীক। সমতল অঞ্চলের লোক কৃষি ও শিল্প-নির্ভর। তাদের জীবন সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। অন্যদিকে প্রয়োজনের তাগিদে সীমান্ত অঞ্চলের মানুষ রণকুশল ও দৃঢ়চেতা। উপকূল অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রধান বৃত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য ও মৎস্যশিকার। এইভাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ভারতীয় জীবনযাত্রায় বিভিন্নতা ও বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে।

ভারতীয় জীবন-যাত্রার প্রকৃতির প্রভাব

ভারতের উপকূল দীর্ঘ ও বহু বন্দর সমন্বিত। এর ফলে প্রাচীন কাল থেকে ভারত সমুদ্রপথে সিংহল, চীন, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই সমুদ্রপথেই ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতে আসে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে উপকূলের প্রভাব

ভারতের মূলগত ঐক্য

বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের মূলগত ঐক্যঃ ভারত বৈচিত্র্যের দেশ। জনসংখ্যা বিশাল। একই দেশের মানুষের মধ্যে এত বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষকে পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়। ভারতীয় জনসাধারণের বেশীর ভাগ হিন্দু হলেও মুসলমানদের সংখ্যা কম নয়। এমন কি বহু ইসলাম-ধর্মাবলম্বী দেশের জনসংখ্যার থেকেও ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। এছাড়া বহু বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, জরথুস্ত্রবাদী পারসিক এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষ ভারতে বাস করে। ভারতে চৌদ্দটি প্রধান ভাষা ছাড়া আরও দু'শোর বেশী ভাষার প্রচলন আছে।

ভারতের বৈচিত্র্য

ঐতিহাসিক স্মিথ্ ভারতবর্ষের বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করার সময় এই দেশের 'মৌলিক ঐক্য' এবং 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' এই দুটি কথার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভাষা, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির মিলনের

বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন

পীঠস্থান আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ। ভারতীয় কবি, সাহিত্যিক ও মনীষীরাও এই ঐক্যের কথা বলেছেন।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।

ভৌগোলিক ঐক্যবোধ

অতি প্রাচীন যুগে পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন প্রভৃতি হিন্দু পণ্ডিত ও মনীষীরা ভারতের ভৌগোলিক ঐক্যের কথা লিখেছেন। চিরকালই আমাদের মাতৃভূমি 'ভারতবর্ষ' নামে সারা বিশ্বে পরিচিত। অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বহু ভারতীয় নানান কারণে যাতায়াত করেছে। আধুনিক যুগে এই ভৌগোলিক ঐক্যের রূপ আরও সুস্পষ্ট হয়েছে।

রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ

সাধারণভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মাঝে মাঝেই রাষ্ট্রনৈতিক অনৈক্য দেখা দিলেও রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ সুপ্রাচীন। বেদ, পুরাণ ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'চক্রবর্তী রাজা', 'একরাট্', 'সম্রাট', 'রাজাধিরাজ' প্রভৃতি রাজপদের এবং 'রাজসূয়', 'অশ্বমেধ' ও 'বাজপেয়' যজ্ঞের উল্লেখ থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রের চিন্তা কতখানি প্রবল ছিল।

ধর্মীয় ঐক্য

দেবভূমি ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে এক সুগভীর ধর্মীয় ঐক্য। ভারতের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড়, খ্যাত-অখ্যাত তীর্থস্থান। তীর্থযাত্রা ও তীর্থবাসকালে হাজার হাজার পুণ্যার্থী অখণ্ড ভারতের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেন। দেবাত্মা হিমালয় ও পুণ্যসলিলা গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী নদী হিন্দুধর্মে বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বৈদিক সাহিত্য, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের মত কাব্যগ্রন্থ ও মহাকাব্য ভারতের জাতীয় ঐক্যবোধকে সুদৃঢ় করেছে। প্রাচীন ভারতীয় দেবভাষা সংস্কৃত থেকে বহু আধুনিক ভারতীয় ভাষার জন্ম হয়েছে।

সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সমন্বয়

হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পৃথক ও স্বতন্ত্র হলেও দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়ে উভয়ের আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, ভাষা, এমন কি ধর্মকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। বৃটিশ আমলে একই বিদেশী শাসকের অধীনে সুখদুঃখের সমভাগী হওয়ার ফলেও এই দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছে।

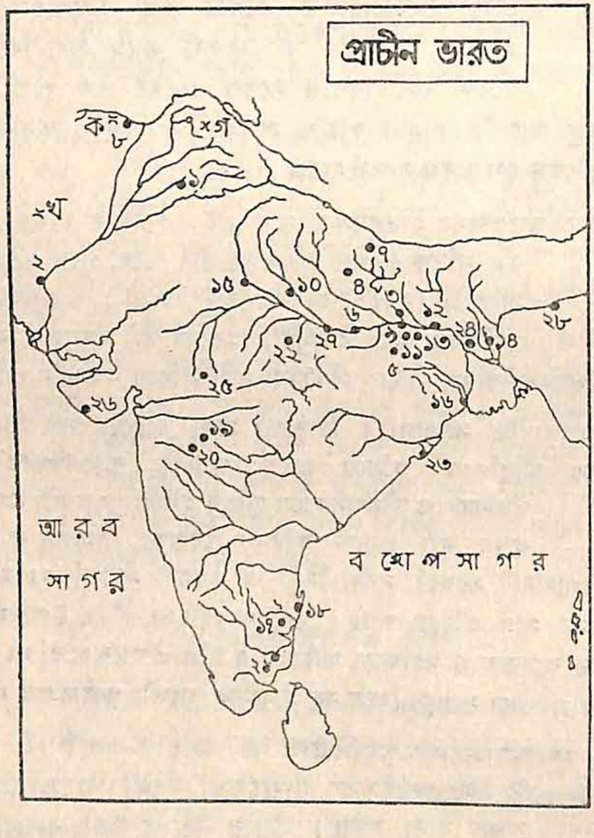
স্বাধীনোত্তর রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য

বৃটিশ শাসনের কল্যাণেই ভারতে এসেছে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐক্য—এটি আংশিক সত্য মাত্র। কিন্তু বিদেশী শাসনের শিকলমুক্ত হবার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যে ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক রাষ্ট্রচেতনা ও স্বদেশ-প্রেমের উন্মেষ হয়েছিল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

স্বাধীনতা লাভের পর, ছোট, বড় দেশীয় রাজ্যগুলি (Native States) ভারতের সঙ্গে সংযোজিত হবার পর রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হয়।

বন্দেমাতরম ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রভাব

স্বাধীনতার মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্', 'জয় হিন্দ' এবং 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীত সমস্ত ভারতবাসীকে এক আত্মিক বন্ধনে বেঁধেছে। এই আত্মিক ঐক্যের মধ্যেই ভারতের মূলগত ঐক্য ধরা পড়েছে।



১ হরপ্পা ২ মহেঞ্জোদড়ো ৩ বৈশালী ৪ কপিলাবস্তু ৫ বুদ্ধগয়া ৬ বারাণসী ৭ কুশীনগর ৮ পুরুষপুর (পেশোয়ার) ৯ পাটলিপুত্র ১০ কান্যকুব্জ ১১ নালন্দা ১২ বিক্রমশীলা ১৩ উদ্দন্তপুরী (বিহার) ১৪ সোমপুরী (উত্তরবঙ্গ) ১৫ মথুরা ১৬ তাম্রলিপ্ত ১৭ কাঞ্চী ১৮ মহাবলীপুরম্ ১৯ অজন্তা ২০ ইলোরা (আওরঙ্গাবাদ) ২১ তাঞ্জোর ২২ খাজুরাহো ২৩ কোনারক ২৪ গৌড় ২৫ উজ্জয়িনী ২৬ সোমনাথ ২৭ প্রয়াগ ২৮ প্রাগজ্যোতিষপুর (গৌহাটি)।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ সাহিত্যিক,

প্রত্নতাত্ত্বিক এবং বিদেশীদের লিখিত বিবরণ। বৈদিক সাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে।

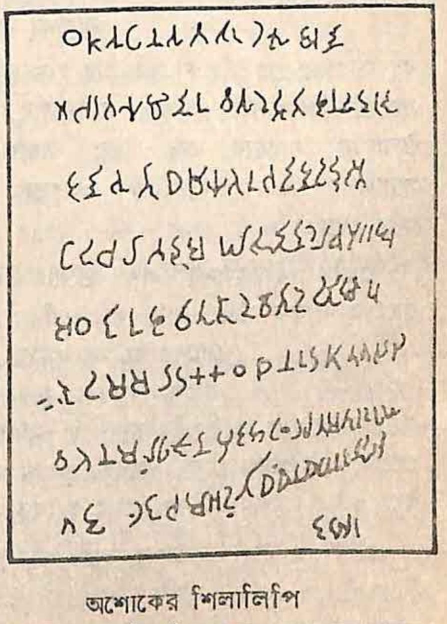
সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্য পাঠ করলে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়। পরবর্তী যুগের মানুষ ও তাদের জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় অন্যান্য সাহিত্যে। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণ, পড়লে সমসাময়িক জীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করা যায়। এই প্রসঙ্গে 'জাতক', 'ত্রিপিটক', 'মহাবংশ' ও 'দীনবংশের' উল্লেখ করা যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', বাক্‌পতির 'গৌড়বাহ', হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত', বিশাখাদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম', হর্ষবর্ধনের 'রত্নাবলী' ও পাতঞ্জলীর 'মহাভাষ্য' ইত্যাদি অসংখ্য গ্রন্থে প্রাচীন যুগের ইতিহাস সম্পর্কে বহু তথ্য রয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার আর এক প্রধান উপাদান হল শিলালিপি। বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও অর্থনীতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় শিলালিপিতে।

শিলালিপি ও তাম্রলিপি

সম্রাট অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে ইংরাজ পণ্ডিত ও রাজকর্মচারী জেমস্ প্রিন্সেপ্ মৌর্য যুগ সম্বন্ধে জ্ঞানভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। পরবর্তী কালের রাজা ও রাজবংশসমূহের শিলালিপিও বিশেষ মূল্যবান। তাম্রশাসন ও তাম্রলিপিও নির্ভরযোগ্য উপাদান। বেশীর ভাগ তাম্রলিপি ছিল দানের দলিলের মত। রাজার নাম, রাজবংশের পরিচয়, রাজত্বকাল ও অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ থাকায় এই সব তাম্রফলকের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। ভারতের বাইরেও কোন কোন দেশের কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তথ্য আছে। এইগুলির মধ্যে এশিয়া মাইনরের বোঘাজ-কাইতে প্রাপ্ত লিপিগুলি বিশেষ মূল্যবান।


অশোকের শিলালিপি

স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু এবং স্ফটিক, মৃৎপাত্র প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ লিপি থেকেও মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। প্রখ্যাত উৎকীর্ণ-লিপিগুলির (inscriptions) মধ্যে কলিঙ্গরাজ খারবেল-এর হাতিগুম্ফা শিলালিপি, সৌরাষ্ট্রের শক-শাসক রুদ্রদামনের

জুনাগড় শিলালিপি, গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি, দ্বিতীয় পুলকেশীর 'আই হোল' শিলালিপি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

মাটির নীচে ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে প্রাচীন ইতিহাসের বহু উপাদান পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায়। এ ছাড়া নালন্দা, রাজগৃহ, সারনাথ, সাঁচী, মহাবলীপুরম, খাজুরাহো, কোনারক, বর্তমান বাংলাদেশের পাহাড়পুর প্রভৃতি



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বহু জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে। এই সব আবিষ্কার আমাদের শুধু সেই সময়ের শিল্পরীতি, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের অগ্রগতি, শিল্পীর দক্ষতা ও কি ধরনের উপাদান ব্যবহার হত তার সম্বন্ধে ধারণা দেয় না, তখনকার ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ করে দেয়।

মুদ্রা

প্রাচীন ইতিহাসের এক প্রয়োজনীয় উপাদান হল মুদ্রা ও সীলমোহর। রাজ্যের শাসক তাঁর নাম, সন তারিখ ও তাঁর শাসনকাল সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া দেশের আর্থিক অবস্থা, বৈদেশিক প্রভাব ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও ধারণা পাওয়া যায় মুদ্রা থেকে। গুপ্ত রাজবংশের দুই শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে তাঁদের মুদ্রা থেকে। ভারতের গ্রীক, পহ্লব, কুষাণ ও শক রাজাদের সম্পর্কে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা বিশেষভাবে সে যুগের আবিষ্কৃত মুদ্রার ওপর নির্ভরশীল।

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কত বিদেশী যে ভারত সম্বন্ধে লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাস ও গ্রীক চিকিৎসক টেসিয়াস এ দেশে না এলেও তাঁদের লেখা

ইতিহাসে ভারতের প্রসঙ্গ আছে। অন্যান্য বিদেশীদের মধ্যে মেগাস্থিনিস, টলেমি, প্লিনি, জ্যাস্টিন, কুইণ্টাস, কার্টিয়াস, প্লুনার্ক, ডিওডোরাস ও আরো



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

অনেকের ভারত-সম্পর্কীয় রচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' নামে একটি গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ ও ইৎ সিং-এর বিবরণীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধযুগের ইতিহাস রচনার জন্য বৈদেশিক রচনা এবং তথ্যের মূল্য অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথের নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আল-বিদুরী, সুলেমান, আল-মাসুদী, হাসান নিজামী, ইবন-উল-আথির প্রভৃতি আরব বণিক ও পর্যটকদের লেখা থেকে অষ্টম ও নবম শতাব্দীর ভারত সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলমান লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিচিত হলেন পণ্ডিত আল বেরুনী। তিনি দশম শতকে এদেশে এসে 'কিতাব-উল-হিন্দ' নামে যে বইটি লিখেছিলেন তাতে সমসাময়িক যুগ সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে।

বৈদেশিক বিবরণ

ইতিহাস ঐতিহাসিকের কল্পনাপ্রসুত কাহিনী নয়। বিভিন্ন প্রকারের প্রামাণ্য উপকরণ বা উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করেন। যে সব মৌলিক তথ্যের সাহায্যে ইতিহাস রচিত হয়, সেইগুলিকে ইতিহাসের উপাদান বলে।

ইতিহাসের উপাদান কি?

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাধারণতঃ তিনটি যুগে ভাগ করা হয়—প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ। প্রতিটি যুগের আছে নিজস্ব রূপ ও বৈশিষ্ট্য। কালক্রমে মানুষ ও তার পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের উপাদানেরও প্রকারভেদ ঘটেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় | ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ

প্রাগৈতিহাসিক ভারত ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা

পণ্ডিতেরা ভারত তথা পৃথিবীর আদিম মানুষের ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন : **পুরাতন-প্রস্তর যুগ, অন্তর্বর্তী-প্রস্তর যুগ, নব্য-প্রস্তর যুগ,** ও তারপর **ধাতুর যুগ**। এই এক-একটি যুগ বলতে কয়েক হাজার বছর বোঝায়।

ভারতের আদিম মানুষের ইতিহাস

পুরাতন-প্রস্তরযুগ : পুরাতন-প্রস্তর যুগের (Palaeolithic Age) মানুষ খাদ্য সংগ্রহ ও হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ভোঁতা পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। চাষবাস করতে ও আগুন জ্বালাতে জানত না। তারা যাযাবর প্রকৃতির লোক ছিল এবং গাছের ফলমূল ও পশুর কাঁচা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। গাছের ও জীবজন্তুর ছাল পরত। ধাতুর ব্যবহার তাদের জানা ছিল না। এই যুগের মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র কিছু পাওয়া গেছে।

পুরাতন-প্রস্তর যুগ

অন্তর্বর্তী-প্রস্তর যুগ : পুরাতন এবং নতুন প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তীকালীন সময়কে অন্তর্বর্তী-প্রস্তর যুগ (Mesolithic Age) বলা হয়। পুরাতন-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগের মধ্যে বহু হাজার বছরের ব্যবধান। এই যুগে পুরাতন-প্রস্তর যুগের উন্নতির ক্রমবিকাশ দেখা যায়, যা নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষের আচার আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

নব্য-প্রস্তর যুগ : এরপর শুরু হয় নব্য-প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। এ যুগের মানুষও পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্রের ওপর নির্ভর করত। তবে তারা পাথরকে মসৃণ করতে ও প্রয়োজনমত আকার দিতে জানত। তারা কৃষি-কাজ ও আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। মাটির জিনিস তৈরী করত, গরু-ছাগল প্রভৃতি জীবজন্তু পালন করত। এই যুগের মানুষ গুহায় বাস করত, কাপড় বুনত ও মৃতদেহ কবর দিত; অনেকে মনে করেন যে ভারতের পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসীরা নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষেরই বংশধর।

নব্য-প্রস্তর যুগ

ধাতুর যুগ : কালক্রমে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল। প্রথমে সোনার অলংকার এবং পরে তামার ও লোহার অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্রের ব্যবহার শুরু হয়।

পাথর থেকে ধাতুর ব্যবহার ঠিক কোন্ সময়ে আরম্ভ হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। তবে পণ্ডিতদের মতে উত্তর ভারতে প্রথমে পাথর থেকে তামা ও তারপর লোহার ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে পাথরের পরই লোহার যুগ এসেছিল। ভারতে ব্রোঞ্জের বহুল প্রচলন কখনও হয়নি। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন সময়কেই ব্রোঞ্জের যুগ বলা হয় না।

ধাতুর যুগ

এ যুগের লোকেরা কাঁচা মাটির ইঁটের তৈরী বাড়ীতে বাস করত। মাটির তৈরী জিনিস করে তাতে রঙ লাগিয়ে মূর্তি আঁকত। এ যুগে কৃষিকার্যের বিশেষ প্রচলন হয়।

সিন্ধু সভ্যতা ঃ হরপ্পান সভ্যতা—ধাতুর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষ ও ঐতিহাসিক যুগের সূচনা। তাম্রযুগের সভ্যতা কতখানি উন্নত হয়েছিল, তার অপূর্ব ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হল সিন্ধু সভ্যতা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের শাখা রাভি (ইরাবতী) নদীর ধারে **হরপ্পা** এবং সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধু নদের ধারে **মহেঞ্জোদড়ো** নামে দুটি জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে একই ধরনের এক প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার



মহেঞ্জোদড়োর অর্থ mound of the dead, এই নাম লারকানার স্থানীয় লোকেরা দিয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় 'মহেঞ্জোদড়ো' ও পাঞ্জাবের মণ্টগোমরী

জেলায় 'হরপ্পার' প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই জায়গা দুটি বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। **এই সভ্যতা সিন্ধু নদের উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল বলে এর নামকরণ হয় সিন্ধু সভ্যতা।** এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী, স্যার জন মার্শ্যাল ও স্যার মর্টিমার হুইলারের। এই আবিষ্কারের ফলে জানা যায় ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। এখানেই আবিষ্কারের গুরুত্ব।

সিন্ধু উপত্যকার মাটি খুঁড়ে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার স্তরবিভাগের সাহায্যে এই সভ্যতার প্রাচীনত্ব স্থির করার চেষ্টা হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা করে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে বা খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে প্রথম গড়ে উঠেছিল। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মনে করা হত যে আর্য সভ্যতা হল ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। কিন্তু মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কার প্রমাণ করল যে সিন্ধু সভ্যতা আরও পুরনো।

সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনত্ব

হরপ্পান সংস্কৃতি: সিন্ধু সভ্যতার যে পর্যায় বা অংশটি মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পায় আবিষ্কৃত হয়, তাকে হরপ্পান সংস্কৃতি বলা হয়। সিন্ধু প্রদেশে আরও তিনটি সংস্কৃতি পাওয়া গেছে। 'আমারি', 'ঝুকার' এবং 'বাঙ্গারে'। প্রথমটি হরপ্পার আগে ও পরবর্তী দুটি পরে।

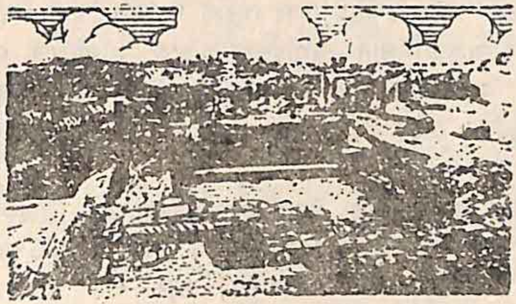
কিছুকাল আগে সরস্বতীর উপত্যকায় কালিবাঙ্গায় অনুরূপ একটি সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। পাঞ্জাবের চানহুদরো, সুৎকাজেনদোরেও অনুরূপ ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন সিন্ধু সভ্যতা, সিন্ধু, পাঞ্জাব ছাড়াও উত্তর রাজস্থান, কাথিয়াওয়ার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্ততঃ কিছু অংশে বিস্তৃত ছিল।

সিন্ধুর অধিবাসিরা লোহার ব্যবহার জানত না। তামা এবং ব্রোঞ্জের জিনিস ব্যবহার করত। তাই তাদের সভ্যতাকে বলা হয় **তাম্র সভ্যতা।**

সিন্ধু সভ্যতা মূলতঃ ছিল নাগরিক সভ্যতা। হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়োয় নগরের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। ঐ নগরগুলির গঠনরীতি দেখে বোঝা যায় যে নগর পরিকল্পনা বা নগর বিন্যাসের মান তখন খুব উন্নত ছিল। শহরের ইঁটের তৈরী ছোট বাড়ীগুলির বাইরের সৌন্দর্য না থাকলেও ভেতরে থাকার ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। বাড়ীগুলির নির্মাণ শৈলী উন্নত মানের ছিল। বাড়ীগুলি সাধারণতঃ পোড়া মাটির ইঁট দিয়ে তৈরী হত, তাতে পালিশ করা মেঝে, দেওয়াল থাকত। মাঝে মাঝে উল্লেখযোগ্য ভাবে বড় আকারের ইঁট পাওয়া গেছে। সংলগ্ন স্নানাগার, কূপ, জল-নিষ্কাশের ব্যবস্থা ছিল আধুনিকধরনের।

নগর পরিকল্পনা

বাড়ীর স্নানাগার ছাড়া সর্বসাধারণের ব্যবহার-উপযোগী স্নানাগারও ছিল। মহেঞ্জোদড়োয় একটি খুব বড় স্নানাগারও পাওয়া গেছে। হরপ্পায় শস্য মজুত রাখার একটি বড় গোলা ছিল। শহরের প্রশস্ত রাজপথগুলি ছিল সোজা ও বাঁধানো।



মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার

বড় বড় রাস্তার সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট রাস্তায় অন্ততঃ একটি করে পাকা ইঁটের তৈরী কূপ থাকত। মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি শহরে উন্নত মানের পয়-প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। রাস্তার ধারে তলদেশে নর্দামা ছিল। নর্দামায় জমা আবর্জনা ও ময়লা আটকাবার জন্য মাঝে মাঝে গর্ত (Soak Pit) থাকত। গর্ত-গুলি পাথরের ঢাকনা দেওয়া চাপা থাকত। বাসগৃহ ছাড়া যে বড় বড় বাড়ী-গুলি দেখা যায় সেগুলি পৌরসভাগৃহ বলে অনুমান করা হয়। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুই শহরের একদিকে ছিল ধনীর প্রাসাদ আর অন্য দিকে নিম্ন-বিত্তের গৃহ। ডঃ কোশাম্বী-র মতে এখানকার নগর পরি-কল্পনায় শ্রেণী তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এ. এল. ব্যাসম-এর মতে শ্রমিক বা দাস শ্রেণীর জন্য দুই কক্ষ যুক্ত ইঁট নির্মিত বাড়ী থাকত। শহরের বাড়ীগুলির এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল—যে বড় রাস্তার দিকে কোন দরজা জানালা ছিল না। বাড়ীর পাশের গলির দিকের দরজা দিয়ে যাতায়াত হত। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক জীবনের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে।

নাগরিক জীবন

সিন্ধু সভ্যতার লোকদের খাদ্য ছিল খেজুর, দুধ, মটর, যব, গম, তরমুজ ইত্যাদি। মাছ, মাংস, ডিমও তারা খেত। হাতী, গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ও উট ছিল গৃহপালিত জীবজন্তু। হরপ্পায় সম্ভবতঃ অশ্ব ছিল না। মহেঞ্জোদড়োতে একটি ঘোড়ার কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সাধারণতঃ যাতায়াত ছিল গরুর গাড়ী করে। এই যুগের মানুষ তুলো ও পশমের জামা-কাপড় পরত। সাজ-পোশাক ছিল

খাদ্যদ্রব্য, বেশভূষা

সামাজিক জীবন

জমকালো। মেয়েরা ও ছেলেরা উভয়েই সোনা, রূপার অলঙ্কার পরত।* আধুনিক ভারতীয় প্রথায় সুন্দর করে নানাভাবে কবরী বাঁধত। প্রসাধন সামগ্রীর নিদর্শনও পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও হাতের কাজ ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল, মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থানের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা হয়। দক্ষিণ ভারত এবং আফগানিস্থান থেকে তামা এবং রাজপুতানা থেকে শ্বেত পাথর আমদানি করা হত। ধাতু ও মৃৎশিল্পে তারা দক্ষ ছিল।

জীবিকা

সে সময় পৌর শাসন ব্যবস্থা উন্নত মানের ছিল এবং অধিকাংশ নাগরিকের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। তবে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর উপর মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর শাসন পরিলক্ষিত হয়। প্রধানতঃ গরুর গাড়ী ব্যবহার করা হত। তুলোর চাষ হত খুব বেশী। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় কাঠের ও মাটির তৈরী অনেক ছোট ছোট মূর্তি ও জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। তারা পালিশ করা পোড়ামাটির ওপর গৃহপালিত জীবজন্তু, মানুষের মূর্তি, ফুল, লতা ও পাখীর সুন্দর রঙিন ছবি আঁকতে পারত। তাদের শিল্পজ্ঞান খুবই উন্নত ছিল। তামা, সীসা ও ব্রোঞ্জের তৈরী কুঠার, বর্শা, ছোরা, ক্ষুর, বঁড়শি ইত্যাদি ব্যবহার করত। তারা সোনা রূপার ব্যবহার জানত, কিন্তু এই যুগের লোহার কোনো জিনিস পাওয়া যায়নি। এই সময়ে প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি হয়েছিল, বিশেষ করে মৃৎশিল্প ও ধাতু শিল্পে। কিন্তু কোনো আত্মরক্ষা মূলক অস্ত্র বা সামরিক দ্রব্যাদির নিদর্শন পাওয়া যায়নি।



সীলমোহর

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োয় প্রায় দু'হাজার সীলমোহর পাওয়া গেছে। এইগুলিতে জীবজন্তুর মূর্তি ও একরকম লেখা পাওয়া গেছে। এই লেখার পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি। মনে হয় এই সীলমোহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগত। কয়েকটি সীলমোহরে উল্লেখযোগ্যভাবে নৌকার ছবি পাওয়া যায়।

* স্যার মর্টিমার হুইলারের মতে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োয় অধিকাংশ অধিবাসীরা বানিজ্যজীবি ও ধনিক শ্রেণীর ছিলেন। শহরের জীবনযাত্রায় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিটি ব্যবসায়ী ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সীলমোহর ছিল। হয়তো মাদুলি করেও পরত। সম্ভবতঃ ওজন ও মাপের জন্য দশমিক ও কিউবিক প্রথা চালু ছিল। পরিবহনের জন্য প্রধানতঃ গরুর গাড়ী ব্যবহার হত।

সীলমোহর

সিন্ধু সভ্যতার লোকেদের ধর্ম কি ছিল তা সঠিক বলা সম্ভব নয়। কোনও উপাসনাগৃহ বা মন্দির পাওয়া যায়নি। যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কয়েকটি হল দেবী ও পুরুষ মূর্তি। এর থেকে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে জগন্মাতা দুর্গা ও জগৎপতি শিব-পশুপতির পূজার প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ পশুপতির আদি মূর্তি এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়। শিবলিঙ্গ পূজারও রীতি ছিল। অগ্নি, জল, পাথর, গাছপালা ও জীবজন্তুর পূজাও হত। তবে কোনো সর্বজনীন পূজার স্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

ধর্ম

সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে মিশর ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উন্নত নাগরিক জীবন, মৃৎ শিল্পের ব্যবহার পোড়ামাটির ইঁট, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী জলযানের ব্যবহার, চিত্রলিপি এইরূপ কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের যে যোগাযোগ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দুই অঞ্চলের দুই প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কি ছিল এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

অন্য প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কারা এ বিষয়েও ঐতিহাসিকেরা একমত নন। একটি মত হল, সুমেরীয়রা বাইরে থেকে এসে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো গড়েছিলেন। অপর একটি বিশ্বাস হল, দ্রাবিড় জাতি সিন্ধু সভ্যতা গড়েছিলেন। ধর্ম এবং লিপির সাদৃশ্য ছাড়াও দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার ব্রাহুই উপজাতির ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু কোন একটি জাতির মানুষ সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন বলে মনে হয় না। বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে এই সভ্যতার জন্ম হয়েছিল এই মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা সম্বন্ধে মতানৈক্য

সিন্ধু সভ্যতা কি করে ধ্বংস হয়েছিল সে বিষয়েও মতভেদ আছে। একটি অনুমান হল যে সিন্ধুনদের আকস্মিক প্রবল প্লাবন, ভূমিকম্প বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আর একটি অনুমান হল যে কোন দুর্ধর্ষ ও নৃসংশ বিদেশী আক্রমণের ফলে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো ধ্বংস হয়েছিল। এই আক্রমণকারীদের রাজ্যস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল না। সম্পূর্ণ বিনষ্ট করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। বারে বারে বন্যার ফলে মহেঞ্জোদড়োর প্রভূত ক্ষতি হয়েছে।

ধ্বংসের কারণ

অনেকের মতে জলের অভাবের ফলে খাদ্যের অভাব অন্যতম কারণ। Wheeler এর মতে নাগরিক জীবনের নিয়ম কানুন অমান্য করে, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করে, সিন্ধুর অধিবাসীরা যখন সভ্যতাকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, তখন বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে।

প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য

আধুনিক গবেষণায় আভ্যন্তরীণ কারণ—যেমন কৃষিজমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সিন্ধু নদের গতি পরিবর্তন, মরুভূমির সম্প্রসারণ, বন্যা ইত্যাদির উপরও কেউ কেউ বলেন যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পোড়া ইঁট তৈরীর ব্যবস্থা করতে অরণ্য সম্পদ ক্রমশঃ নষ্ট হয়, বৃষ্টিপাতের অভাব হয় ও দলে দলে মানুষ শহর পরিত্যাগ করে চলে যায়। এর ফলে এই সভ্যতা লুপ্ত হয়।

নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন অভিমত পোষণ করা যায় না।

বৈদিক যুগ

তৃতীয় অধ্যায় | আর্যদের ভারতে আগমন

আর্য কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'শ্রেষ্ঠ', সংকুলজাত বা সুসভ্য। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় তা নিয়ে মতভেদ আছে। একটি মত হল, ভারতবর্ষই তাদের বাসভূমি। কিন্তু বেশীর ভাগ পণ্ডিতের বিশ্বাস যে আর্যরা বাইরের কোন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। এঁদের কেউ বলেন আর্যদের আদি বাসভূমি মধ্য এশিয়া, কেউ বলেন উত্তর মেরু-প্রদেশ, কেউ বলেন রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, আবার কারোর মতে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও বোহেমিয়ায়। কোন্ মতটি যে বেশী গ্রহণযোগ্য তা বলা দুরূহ। তবে আর্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুলপ্রচলিত মত হল যে বহুদিন আগে কোন এক অঞ্চলে গ্রীক, রোমান জার্মান, ইংরাজ, ফরাসী ও রুশ জাতির পূর্বপুরুষেরা ও আর্যরা একসঙ্গে বাস করতেন। পরে একসময়ে এঁরা বিভক্ত হয়ে নানান দিকে যাত্রা করেন। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাঁদের বংশধরদের বসতি গড়ে ওঠে। এইরকম দুটি দল পারস্য ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কালক্রমে ভারতবর্ষে তাঁরা যে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন তা **আর্য সভ্যতা** বা তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধর্মসাহিত্য বেদের নামানুসারে **বৈদিক সভ্যতা** নামে খ্যাতি লাভ করে।

আর্যদের আদি বাসভূমি

আর্যদের উৎপত্তি

আর্যদের ভারত আগমনের সঠিক কালনির্ণয় সম্ভব হয়নি। তবে খ্রীস্টের জন্মের আনুমানিক দু'হাজার বছর আগে তাঁরা ভারতে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এই মতের স্বপক্ষে যুক্তি আছে।

আর্যদের ক্রমবিস্তার

প্রথমে আর্যরা আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব অঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। সিন্ধু প্রভৃতি সাতটি নদীর নামানুসারে সমগ্র এলাকাটির প্রাচীন নাম ছিল **'সপ্তসিন্ধু'**। ক্রমে ক্রমে আর্যরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ও কুরুক্ষেত্র, কোশল, বিদেহ, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যবসতি গড়ে ওঠে। আরও দীর্ঘদিন পর দাক্ষিণাত্যেও আর্যপ্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আর্যজাতির কোন কোন শাখা বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে দাক্ষিণাত্যে বসতি স্থাপন করে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে পশ্চিম ভারতে আর্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব ভারতে আর্য অধিকার বিস্তারে অনেক দেরী হয়েছিল।

বৈদিক সাহিত্যঃ আর্য ও আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল বেদ বা বৈদিক সাহিত্য। আর্যদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন ধর্মসাহিত্যের নাম বেদ। বেদ শব্দের উৎপত্তি বিদ্ ধাতু বা জানা বা জ্ঞান থেকে। হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদ স্বয়ং ঈশ্বর-নিঃসৃত বাক্য। বেদ অভ্রান্ত ও তর্ক-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বেদ 'নিত্য' ও 'অপৌরুষেয়'। বেদ লিখিত সাহিত্য ছিল না। ঋষিরা মুখে মুখে বেদ রচনা করতেন। গুরুর কাছে শ্রবণ করে শিষ্য বেদ মুখস্থ করে নিতেন। শিষ্য আবার পরে তাঁর শিষ্যদের বেদ শোনাতেন। এইজন্য বেদের অপর নাম **শ্রুতি**। সকলের আশঙ্কা ছিল যে বেদ-পাঠে কোন ভুল ভ্রান্তি হলে বিপদ হবে। তাই কেবলমাত্র শ্রুতিনির্ভর হলেও বৈদিক মন্ত্র বা স্তোত্রের কোন বিকৃতি ঘটেনি। পরবর্তী যুগের হিন্দুধর্ম, সমাজ, দর্শন ও সাহিত্যের মূল উৎস বেদ।

(বেদ; বেদের আর এক নাম শ্রুতি)

বেদ চারভাগে বিভক্ত—**ঋক্, সাম, যজু** এবং **অথর্ব**। প্রত্যেকটি বেদের আবার দুটি ভাগ আছে—**সংহিতা** ও **ব্রাহ্মণ**। সংহিতা পদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ গদ্যে রচিত। সংহিতায় আছে প্রার্থনা, মন্ত্র ও দেবদেবীর স্তবস্তুতি। ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞের বিধি-নিয়ম নির্দেশ করা আছে। পরবর্তী যুগে বেদের আরও দুটি ভাগের সৃষ্টি হয়—**আরণ্যক** ও **উপনিষদ্**। যাঁরা বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করে অরণ্যবাসী হতেন, তাঁদের উপযোগী ধর্মতত্ত্ব রয়েছে আরণ্যকে। উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্ব সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট রেখা টানা শক্ত, কেননা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপনিষদ্ আরণ্যকের অংশমাত্র। সমগ্রভাবে উপনিষদ্গুলি বেদের অন্ত বা শেষ অংশ। এই কারণে উপনিষদের আর এক নাম **বেদান্ত**।

(চতুর্বেদ; সংহিতা ও ব্রাহ্মণ; আরণ্যক ও উপনিষদ্; বেদান্ত)

কালক্রমে বৈদিক সাহিত্য বিশাল ও জটিল হয়ে উঠলে তার নির্ভুল সংক্ষিপ্তসার রূপে সৃষ্টি হয় **সূত্র-সাহিত্য**। সূত্র-সাহিত্যের দুটি ভাগ—**বেদাঙ্গ ও ষড়্‌দর্শন**। বেদাঙ্গের সংখ্যা ছ'টি। যথা—শিক্ষা, (উচ্চারণ) ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের উৎপত্তির ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ ও কল্প (যাগযজ্ঞের বিধান)। ছ'টি হিন্দু দর্শন-শাস্ত্র ষড়্‌দর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

(সূত্র-সংহিতা)

কালক্রমে আর্যরা আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ, সঙ্গীত ও শিল্পশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কারুকর্ম, অশ্ববিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েরও বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে বৈদিক সাহিত্য এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চাকে সমৃদ্ধ করেন।

(অন্যান্য বিষয়ের সাহিত্য)

সমগ্র বেদ একই সময়ে রচিত হয়নি। বৈদিক সাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে সৃষ্টি

হয়েছিল। **চতুর্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। খ্রীস্টের জন্মের আনুমানিক দু'হাজার থেকে দেড় হাজার বছর আগে** ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য অংশ রচিত হয়। সবশেষে রচিত হয়েছিল অথর্ব বেদ।

ঋগ্বেদ

বৈদিক সভ্যতা: আর্য সভ্যতাকে **আদি-বৈদিক** ও **উত্তর-বৈদিক** এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, কেননা প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও বেশী দীর্ঘ সময় ধরে এই সভ্যতা বিবর্তিত হয়েছিল। **ঋগ্বেদে বর্ণিত আর্য সভ্যতাকে আদি-বৈদিক সভ্যতা বলা হয়।**

বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায় যে আর্যদের নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য বহু যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে হয়েছিল। বৈদিক যুগের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত এবং এর ফলে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিত ; এক রাজা অন্য রাজাদের পরাজিত করে রাজচক্রবর্তী বলে নিজেকে ঘোষণা করতেন। 'রাজসূয়', 'অশ্বমেধ' প্রভৃতি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করে শক্তিশালী সম্রাট তাঁর প্রাধান্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতেন। আর্যদের শুধু নিজেদের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যেই নয়, এদেশের আদিম অনার্য অধিবাসীদের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। তাদের **পাণি** এবং **দাস** বলে বর্ণনা করা আছে।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা

আর্যদের **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন**, পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। পরিবারের কর্তাকে বলা হত 'গৃহপতি'। কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি নিয়ে 'গ্রাম' এবং গ্রামের সমষ্টি নিয়ে 'বিশ্' বা 'জন' গঠিত হত। গ্রামের প্রধান 'গ্রামণী', 'বিশ্' বা 'জন'-এর প্রধান 'বিশ্পতি' বা 'রাজন্' নামে পরিচিত হতেন। রাজন্ বা রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। বৈদিক যুগে রাজতন্ত্রের প্রচলন থাকলেও অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী বা 'গণ' এবং তাদের নেতা 'গণপতি' বা 'জ্যেষ্ঠ'-এর কিছু কিছু উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগে রাজারা ছিলেন প্রধানতঃ সামরিক নেতা। সামরিক ক্ষমতা, দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা এবং প্রজাদের ধনসম্পত্তি রক্ষা ও সুশাসন করার উপরই রাজার স্থায়িত্ব নির্ভর করত। বৈদিক যুগে প্রজারা রাজাদের নিয়মিত ভাবে কোনো কর দিতেন না। রাজাদের জমির উপর কোনো অধিকার বা স্বত্ব ছিল না। প্রজারা স্বেচ্ছায় রাজাদের কর দিত। যজ্ঞের ভাগ এবং শত্রুজয়ের পর শত্রুসম্পত্তির লুঠের ভাগ রাজারা পেতেন। বয়স্ক ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ রাজাকে রাজ্য-শাসনে সাহায্য করতেন। পুরোহিত অথবা প্রধান পুরোহিত এবং সেনানী ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাজ্যশাসনে রাজার কাছে কাছে থাকতেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন

রাজা রাজ্যের মধ্যে সর্বশক্তিমান হলেও স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। তিনি 'গ্রামণী', 'সেনানী' ও পুরোহিতের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। পুরোহিত রাজ্যের কল্যাণ কামনায় মন্ত্রণা দান ও যাগযজ্ঞ করতেন। সেনানী সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিলেন।

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 10. 7. 89
4617

এছাড়া 'সভা' ও 'সমিতি' নামে জনসাধারণের দুটি রাজনৈতিক পরিষদ ছিল। বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সভা গঠিত হত ও জনসাধারণদের নিয়ে গঠিত হত সমিতি। তবে এই দুটি সঙ্ঘের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে রাজ্যশাসনে রাজা পরিষদ-সদস্যদের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে প্রজারাই রাজাকে নির্বাচন করতেন। পরে উত্তরাধিকার প্রথার প্রচলন হয়। এর ফলে প্রজাদের ক্ষমতা হ্রাস পেলেও রাজা প্রজাকল্যাণের আদর্শচ্যুত হতে পারতেন না। তাঁকে ধর্মগ্রন্থসমূহের নির্দেশ অনুযায়ী রাজকর্তব্য পালন করতে হত।

রাজশক্তি

সভা ও সমিতি

আর্যদের সামাজিক জীবনেরও মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবারের প্রধান ছিলেন গৃহপতি। গৃহের মধ্যে স্ত্রীর ছিল উচ্চাসন ও মর্যাদা। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে যজ্ঞ ও পূজার্চনা করতেন। স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করলে চিরজীবন অবিবাহিতা থাকতে পারতেন। কন্যারা পিতৃগৃহে সুশিক্ষা লাভ করতেন। অবরোধ বা পর্দা প্রথা ছিল না। লোপামুদ্রা, মমতা, বিশ্ববারা, ঘোষার মত উচ্চ-শিক্ষিতা ও বিদুষী নারী বেদমন্ত্রও রচনা করেছিলেন। এক-বিবাহ প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। বহুবিবাহ যে হত না তা নয়। সম্ভবতঃ বিধবা বিবাহ প্রথাও চালু ছিল। পরবর্তী সাহিত্যে বহুপতি গ্রহণের কথার উল্লেখ আছে। বাল্যবিবাহ হত না। পারিবারিক জীবনের মান ও নৈতিক আদর্শ ছিল সুউচ্চ।

সামাজিক জীবন

আর্য সমাজ-ব্যবস্থার দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল **বর্ণভেদপ্রথা** ও **চতুরাশ্রম**। বর্তমান হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথা বৈদিক যুগের বর্ণভেদ প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে এই জাতি-ভেদ ছিল কিনা সন্দেহ। তখন দুই প্রধান ভাগ ছিল, বিজয়ী গৌরবর্ণ আর্য জাতি ও বিজিত কৃষ্ণবর্ণ অনার্য জাতি। এই দুইএর সমন্বয় সাধন আর্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। ক্রমে ক্রমে আর্যদের মধ্যে চারটি শ্রেণীর জন্ম হয়—**ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র**। ঋগ্বেদের পুরুষ সুক্ত একটি মন্ত্রে এই শ্রেণী-ভেদের উল্লেখ আছে। অনেকে আবার মনে করেন এটি অনেক পরে রচিত। শাস্ত্রপাঠ ও যাগ-যজ্ঞাদিতে যাঁরা দক্ষ ও নিযুক্ত থাকতেন তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। রাজ্যশাসন, রাজ্যরক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও নিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। কৃষিকর্ম, শিল্প ও বাণিজ্য যাঁদের জীবিকা ছিল তাঁরা খ্যাত ছিলেন বৈশ্যরূপে। সমাজের সর্বনিম্নশ্রেণীর মানুষ, যাঁরা ভৃত্য বা দাসের কাজ করতেন, তাঁদের পরিচয় ছিল শূদ্র। গুণ ও কর্ম অনুসারে এই বিভাগ করা হয়।

বর্ণভেদ প্রথা

প্রথমে বৃত্তিনির্ভর এই বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বা বৃত্তি পরিবর্তনে কোন বাধানিষেধ ছিল

না। কিন্তু কালক্রমে বর্ণপ্রথা কঠোর ও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। পূর্বের উদারতা লোপ পায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বর্ণভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মানুষের জীবন চারটি 'আশ্রম' বা ভাগে বিভক্ত ছিল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আশ্রম বলতে জীবনের একটি বিশেষ অবস্থা বোঝাত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষার্থী গুরুগৃহে সংযমী ও সদাচারী হয়ে বাস করে অধ্যয়ন করত। গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহ ও সংসার ধর্ম পালন করা কর্তব্য ছিল। বানপ্রস্থাশ্রমে সংসার জীবনের শেষে প্রৌঢ় বয়সে নির্জনে ধর্ম সাধনারত হওয়া আবশ্যক ছিল। সবশেষে সন্ন্যাসাশ্রমে সমস্ত সাংসারিক বন্ধনমুক্ত হয়ে পরমার্থ-চিন্তামগ্ন হওয়া ছিল একমাত্র লক্ষ্য। এই অবস্থার আর এক নাম যতি ও ভৈক্ষ্য। সকলের পক্ষে চতুরাশ্রমের আদর্শ পালন করা সহজসাধ্য না হলেও, ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ পালন ছিল অপরিহার্য।

চতুরাশ্রম

আর্যদের জীবনে আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আমোদ-প্রমোদের বাহুল্য বা আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল জনপ্রিয়। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা উত্তরীয় ও মাথায় উষ্ণীষ পরতেন। তাঁরা সুতো ও পশমের জামাকাপড় পরতেন। ঘি, দুধ, মাখন, যব ও ফলমূল ছিল প্রধান খাদ্য। উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাংসভোজন হত। সোমরস ও সুরা পান প্রচলিত ছিল। যাগ-যজ্ঞের জন্য সোমরসের প্রয়োজন ছিল। আর্যরা নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্র পছন্দ করতেন। জীবজন্তু-শিকার, রথচালনা, পাশাখেলা ইত্যাদি ছিল তাঁদের প্রিয় আমোদ-প্রমোদ।

আহার, পোশাক ও আমোদ প্রমোদ

আর্যরা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতেন। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ ও শক্তিকে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী কল্পনা করে বন্দনা করতেন। আর্যদের উপাস্য দেব-দেবীর মধ্যে ছিলেন ধাত্রী, বিধাত্রী, বিশ্বকর্মন প্রজাপতি, শ্রদ্ধা, মায়া, পৃথ্বী, অদিতি, ঊষা, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য (মিত্র) ইত্যাদি। কিন্তু, বহু দেব-দেবীর উপাসনা করলেও আর্যরা উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সুতরাং বৈদিক আরাধনার অন্তর্নিহিত মূল আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল একই ঈশ্বরের পূজা বা একেশ্বরবাদ। দেবতাদের তুষ্টির জন্য আর্যরা যাগযজ্ঞ করতেন। অনেকের মতে এটাই তাঁদের ধর্মীয় জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যজ্ঞাগ্নিতে দুধ, ঘি, যব ইত্যাদি আহুতি দেওয়া হত। প্রথম দিকে যাগযজ্ঞের বিধান সহজ সরল থাকলেও পরে জটিল হয়ে পড়ে। যজ্ঞ পরিচালনার জন্য বেদবিদ্ পুরোহিতের প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়। ক্রমশঃ আর্য

ধর্মীয় জীবন

উপাস্য দেব-দেবী ও অন্তর্নিহিত একেশ্বরবাদ

যাগযজ্ঞ

পূজা-উপাসনা পদ্ধতিতে অনার্য প্রভাব প্রবেশ করে। মূর্তি পূজা ও পশু বলিদান প্রভৃতি প্রথা প্রবর্তিত হয়। হিন্দুদের বর্তমান পূজাপদ্ধতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হয়েছে এই সংমিশ্রণের ফলে।

অর্থনৈতিক জীবন

আর্যরা আধা-যাযাবর পশুপালক জাতি হিসাবে ভারতে আসেন এবং পশুপালন-কেই তারা প্রধান জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। গরুর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হত। সোনা রুপার মত গরুকে (গোধন) মূল্যবান বিবেচনা করা হত। 'গাভিষ্ট' শব্দের অর্থ হল গরু খোঁজা। অর্থাৎ বিভিন্ন আর্যগোষ্টিগুলি পরস্পরের গরু ও গবাদি পশু লুঠ করত এবং তার ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে যুদ্ধ হত। সম্ভবতঃ গরুকে সম্প্রদায়ের প্রতীক বা পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে গন্য করা হত। এবং গাভী অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিল।

পশুপালন

গরু ছাড়া অন্য গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ঘোড়া খুব প্রাধান্য পেয়েছিল। কারণ পরিবহন, যুদ্ধ ও রথ চালাবার জন্য ঘোড়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল।

ক্রমশঃ স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আর্যরা পশুপালন থেকে তাঁদের উপজীবিকার পরিবর্তন করে কৃষিকার্যে, বিশেষ করে যখন লোহার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়ায় লাঙল ও অন্যান্য যন্ত্র তৈরী হয় এবং বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি চাষ করা সহজসাধ্য হয়।

কৃষিকার্য

কৃষিকার্য্যে উপজীবিকার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপজীবিকার পথ প্রশস্ত হয়। লাঙল ও রথ তৈরী করার জন্য সুত্রধরের কাজ সম্মানীয় উপজীবিকা হিসাবে গণ্য করা হত। লোহার ব্যবহারের প্রচলন হওয়ার ফলে বন পোড়ানোর বদলে আর্যরা বিভিন্ন অস্ত্রের সাহায্যে বন-জঙ্গল কাটত। কাঠ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে ব্যবহার হত। অপরাপর গ্রামীণ কারিগরী সম্প্রদায়ের মধ্যে উলেখযোগ্য হল, কর্মকার যারা তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা প্রভৃতি ধাতুর কাজ করত এবং কুম্ভকার, চর্মকার, তাঁতী ও বেণু-বাঁশের কাজ যারা করত।

বিভিন্ন উপজীবিকা

যাযাবর পশুপালকের উপজীবিকা থেকে, স্থায়ীভাবে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবর্তন করার ফলে আর্যসভ্যতা পুষ্ট সমাজে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট কার্য্যভিত্তিক পারদর্শী শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়।

বৈদিক যুগে সাধারণতঃ গ্রামবাসীরাই জমির মালিক ছিল। অর্থাৎ জমি ছিল গ্রামের সমষ্টিগত সম্পত্তি। পরে উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির অবক্ষয়ের ফলে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে জমি ভাগ হয়ে যায় ও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে বেশী জমির অনেক মালিক কৃষিজমি নিজেরা চাষ না করে, কৃষকদের দিয়ে চাষ করাত।

জমির মালিকানা

আর্যরা ছোট ছোট গ্রামে খড়ের ছাউনি দেওয়া কাঠের বা লতাপাতার তৈরী গৃহে বাস করতেন। নগরের কোন উল্লেখ আদি-বৈদিক সাহিত্যে নেই। কৃষিকর্ম ছিল প্রধান জীবিকা। সার ও জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। গৃহে তাঁরা পশুপালন ও দুগ্ধজাত খাদ্য উৎপন্ন করতেন। কিন্তু আর্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা উদাসীন ছিলেন না। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছাড়া তাঁরা সামুদ্রিক বাণিজ্যেও লিপ্ত ছিলেন।

অর্থনৈতিক জীবন

মুদ্রার ব্যবহার অজানা না হলেও বিনিময়-প্রথার বেশী প্রচলন ছিল। গলার স্বর্ণালঙ্কার 'নিষ্ক' বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু তৎকালে ঐ 'নিষ্কায়' মুদ্রার সকল বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল কিনা তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। নিষ্কার ওজন ও আকৃতির সমতা ছিল না। ঋক্‌বেদে স্বর্ণের 'মনা' নামে এক প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন ঐ মনার সঙ্গে ব্যাবিলনের ওজনের একক লাতিন 'মিনা'র সাদৃশ্য আছে। অবশ্য মুদ্রার সংখ্যা কম থাকায় বিনিময়ের মাধ্যমে বেশীর ভাগ ক্রয় বিক্রয় হত। প্রধান বিনিময় সামগ্রী ছিল গরু।

মুদ্রা

উত্তর-বৈদিক যুগের সভ্যতা: আদি-বৈদিক এবং উত্তর-বৈদিক যুগের মধ্যে সময়ের বিরাট ব্যবধানে আর্য সভ্যতার প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছিল। সংক্ষেপে এই পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভৌগোলিক আয়তন ও সেই সঙ্গে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃহত্তর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা প্রবল হয়। রাজার ক্ষমতা ও রাজ্যবৃদ্ধির ফলে রাজ্যশাসন ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। রাজারা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী এবং নিজেদের ভগবান প্রেরিত বলে দাবী করতে থাকেন। এইভাবে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

রাজনৈতিক

সামাজিক অনুশাসন ক্রমশঃ কঠোর হয়ে ওঠে। বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার উদারতা লুপ্ত হয়ে সামাজিক বৈষম্য ও জটিলতা দেখা দেয়। দেশরক্ষা ও শাসনে ক্ষত্রিয়ের এবং ধর্মজীবনে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য দুই শ্রেণীর—বিশেষ করে শূদ্রের অবস্থার অবনতি হয়। সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়নি, বরং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের প্রচলন হওয়ায় তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিল। তাঁরা আগের মত রাজনীতি ও ধর্মচর্চায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন না।

সামাজিক

ধর্মজীবনে প্রজাপতি, শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা প্রাধান্য লাভ করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতি ও সার্থকতা সম্পর্কে কোন কোন দার্শনিকের মনে সংশয় দেখা দেয়। উত্তর-বৈদিক যুগে আর্যদের অর্থনৈতিক জীবনেরও পরিবর্তন হয়। প্রথম যুগের বিশুদ্ধ

ধর্মজীবন

অর্থনৈতিক জীবন

গ্রামীণ সভ্যতার পরিবর্তে কাম্পিল, কৌশাম্বী, কাশীর মত জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী নগর গড়ে ওঠে। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হয়। ব্যবসায়ী সঙ্ঘ বা 'গণ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদিক সংস্কৃতির প্রসার

আর্যদের আদি বাসস্থান এবং ভারতবর্ষে আর্যদের প্রথম আগমনের সময় খুবই বিতর্কিত। তবে সাধারণ স্বীকৃত মত হল যে, আর্যরা অথবা ভারতীয় আর্যরা কিছুকালের জন্য ব্যাকট্রিয়া (Bactria) এবং উত্তর ইরাণের মালভূমি অঞ্চলে বসবাস করেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতাব্দীতে আর্যরা হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে উত্তর ভারতে আসেন।

ঋক্‌বেদে বিভিন্ন নদীর যে উল্লেখ আছে, বিশেষ করে 'সপ্তসিন্ধু', তাতে দেখা যায় যে আর্যরা ঋক্‌বেদের যুগে পাঞ্জাব, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন, কিন্তু পূর্বদিকে বা পূর্বভারতে তাঁরা যাননি।

পরবর্তী বৈদিক যুগে যে সব ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেছে বিশেষ করে তদানীন্তন কাব্যে, তাতে আর্যদের ভারতের ভৌগোলিক জ্ঞানের ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সব কাব্যে 'দুটি সমুদ্র', 'হিমালয়' ও 'বিন্ধ্য' পর্বত এবং সাধারণভাবে সমগ্র গাঙ্গেয় ভূমির উল্লেখ রয়েছে।

পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা-যমুনা, সরযু প্রভৃতি নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চলে আর্যগণ বসতি বিস্তার করেন। ঋক্‌বেদে সপ্তসিন্ধুর পশ্চিমে 'ক্রুমু' বা 'কুররম্', 'গোমতি', 'কুভা' বা 'কাবুল', 'সুভাস্তু' বা 'স্বাত' এর উল্লেখ প্রমাণ করে যে আর্যসভ্যতা বর্তমান আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে গঙ্গা উপত্যকা তাদের আয়ত্বে আসে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ' পূর্বদিকে বা পূর্বভারতে আর্যদের বসতি বিস্তারের কথা বলে। পূর্ব ভারতের বন-জঙ্গলগুলি মুক্ত করে এখানে বসতি স্থাপন করেন আর্যরা। এই বিস্তৃত অঞ্চলে আর্যদের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলি হ'ল—কুরুক্ষেত্র, কোশল, বিদেহ, পাঞ্চাল, কাশী ইত্যাদি।

বৈদিক যুগের শেষের দিকে আর্যরা বঙ্গদেশ, আসাম বা দাক্ষিণাত্যে বসতি বিস্তার করে। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার হয়। ঋষি অগস্ত্যর অগস্ত্য-যাত্রার কথা অনুসরণ করে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে অগস্ত্য-যাত্রার কাহিনী বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে আর্য সভ্যতা বিকাশের প্রতীক।

গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে অনার্যদের তাঁরা পরাজিত করেছিলেন, তাঁদের 'ম্লেচ্ছ' বা 'নিষাদ', 'শবর' বলে উল্লেখ করা আছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার উর্বর কৃষি

জমি ও তামা লোহা প্রভৃতি খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য আর্যদের পূর্বভারতে বসতি স্থাপনে আকৃষ্ট করেছিল।

আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার পরিলক্ষিত হয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুদয়ের সময়, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আর্যগণ উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যাপকভাবে চলে আসেন ও বসতি স্থাপন করেন। তার ফলে হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আর্যাবর্ত নামে পরিচিত হয়।

আর্যদের আর একটি প্রধান শাখা দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে অবন্তী উপত্যকা ধরে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ঐ অঞ্চল দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত।

আর্য সংস্কৃতি

পূর্বদিকে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার বেশীর ভাগ অংশে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হয়। শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভারতীয় উপনিবেশ একটি সাধারণ সর্বজনীন সংস্কৃতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। ঐ সংস্কৃতির পুরোধা আর্য, দ্রাবিড় এবং অন্যান্য উপজাতীয়রা ঐ সংস্কৃতিতে মূল্যবান সংযোজন করেন।

খাদ্যদ্রব্য
পোষাক পরিচ্ছদ

আর্যরা গম, যব, ফলমূল, মৎস্য, মাংস আহার করতেন। সোমরস তাঁদের একরকম প্রিয় পানীয় ছিল। তাঁরা তুলা ও পশমের তৈরী পোশাক ব্যবহার করতেন। নারীরা অলঙ্কার পরতে ভালবাসতেন। বৈদিক যুগে নারীদের শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হত। আর্য সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে নারীদের মর্যাদা হ্রাস পায়।

বিভিন্ন শিল্পে জ্ঞান

আর্যদের চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞান ছিল। তাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

গৃহ নির্মাণ শিল্পে আর্যদের জ্ঞান দেখা যায়। আর্যদের ছবি ও নক্শা আঁকা প্রভৃতি শিল্প জ্ঞানও ছিল।

সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য: বিশ্বের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ সভ্যতার মধ্যে অন্যতম সিন্ধু ও আর্য সভ্যতা ভারতবর্ষের মাটিতে গড়ে উঠেছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, এই দুই সভ্যতার মধ্যে কোনও সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল কি না। সিন্ধু ও আর্য সভ্যতার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধু সভ্যতা ছিল নাগরিক সভ্যতা, কিন্তু আর্য সভ্যতা মূলতঃ গ্রামীণ সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার যুগে লোহার ব্যবহার ছিল না। কিন্তু বৈদিক আর্যেরা এই ধাতুর অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরী করেছিলেন। তেমনি মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় অশ্বের উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বৈদিক সাহিত্যে অশ্বের উল্লেখ আছে। অশ্ব আর্য সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। সিন্ধু

সভ্যতার যুগে বৃষের উপাসনা হত, কিন্তু আর্যরা গাভীর পূজা করতেন। মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতায় মূর্তিপূজার প্রচলন থাকলেও আর্যরা মূর্তি উপাসনা করতেন না। সিন্ধু সভ্যতার ধর্মজীবনে মাতৃদেবীর আরাধনার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে পুরুষদেবতাদের আধিপত্য সুস্পষ্ট। লিঙ্গ পূজা সিন্ধু যুগে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে নিষিদ্ধ ছিল। এইসব বিভিন্ন কারণে পণ্ডিতরা মনে করেন যে সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীনতর এবং এই দুই সভ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না।

লৌহ যুগের প্রারম্ভ

লোহার ব্যবহার সিন্ধু সভ্যতায় অজ্ঞাত। সুতরাং বৈদিক সভ্যতা যে পরবর্তী স্তরের এই যুক্তি আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। পশুপালন থেকে কৃষিকার্যে উপজীবিকার পথ পরিবর্তন, কৃষির উন্নতি ও লাঙ্গল ইত্যাদির ব্যবহার, রথের চাকা, আত্মরক্ষার অস্ত্র-শস্ত্র ও সুদর্শন চক্র ইত্যাদি তৈরীতে লোহার ব্যবহার, লৌহ যুগ ও লৌহ সভ্যতার নিদর্শন।

চতুর্থ অধ্যায় | প্রতিবাদ আন্দোলন

বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি বা বর্ণের মধ্যে নানারূপ বৈষম্য গড়ে উঠে। ব্রাহ্মণেরা যাগ, যজ্ঞ, পূজা অর্চনার নামে নানা প্রকার ধর্মীয় বিধি নিষেধ আরোপ করতে থাকেন। পশুবলি যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হতে থাকে। ব্রাহ্মণেরা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেন। ব্রাহ্মণেরা বলতেন যে যাগ, যজ্ঞ, পশুবলী ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও আচার আচরণের মাধ্যমই ভগবৎ ভক্তির প্রকৃষ্ট উপায়। তাঁরা নানারকম ভাবে ধর্মীয় পূজা ও অর্চনার মাধ্যমে দান হিসাবে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

ক্ষত্রিয় বা রাজন্যবর্গ সামরিক ক্ষমতার জোরে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হতেন। বৈশ্যরা বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্যের দ্বারা ধনসম্পদ উপার্জন করতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের তুলনায় তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ছিল অনেক কম। শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদা ক্রমেই কমতে থাকে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা নিজেদের উচ্চবর্ণের বলে মনে করতেন। শূদ্রদের অপবিত্র বলে আখ্যা দেওয়া হতে থাকে। ধীরে ধীরে সমাজে অস্পৃশ্যতা দেখা দেয়। ফলে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এক বিরাট অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে, যার ফলে প্রতিবাদী আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত হয়।

লোহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারী লাঙল প্রস্তুত হতে থাকে। এর দ্বারা অনেক জমি একসঙ্গে আবাদ করা যেত, ফলে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি হয়। কিন্তু কৃষির উৎপাদন 'গৃহপতি' বা বৈশ্য শ্রেণীই বেশীর ভাগ ভোগ করে। শূদ্র বা কৃষকদের ভূমিদাস রূপে ব্যবহার করা হত। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সমাজে কর্মকার, কুম্ভকার, তাঁতী, চর্মকার প্রভৃতি কারিগরী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সড়ক নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। এর ফলে বিত্তশালী এক বণিক শ্রেণী সমাজে গড়ে ওঠে ও সমাজে ধনবৈষম্য দেখা দেয়। ধন বণ্টনের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় ধনীরা প্রচুর পরিমাণে ধনশালী হয়ে ওঠে এবং গরীবরা আরও দরিদ্র ও অত্যাচারিত হয়।

অর্থনৈতিক কারণ

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে নতুন ধনিক ও বণিক শ্রেণীর মনে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রীয়া দেখা দেয়। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের উপার্জিত অর্থ ব্রাহ্মণরা

ধর্মের অজুহাতে দান হিসাবে অনেকখানিই নিয়ে নিচ্ছে। সেজন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসনের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এই ধনিক শ্রেণী সোচ্চার হন এবং তাঁরা সমাজে সম্মানীয় উচ্চ আসনের জন্য আগ্রহী হন। এর ফলে সমাজে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবের বিরুদ্ধে বণিক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ ও প্রতিবাদ দেখা দেয়।

এরই সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সাধারণ কৃষক শ্রেণীর মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধর্মীয় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গভীর ভাবে দানা বেঁধে ওঠে।

এই সময়ে ভারতীয় জনমানসে উপনিষদের আদর্শে অনুপ্রাণিত এক নতুন ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে এই ধর্মীয় চিন্তাধারা বা ধর্মান্দোলন প্রতিবাদ-আন্দোলনের রূপ নেয়।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সাধনার তীর্থক্ষেত্র ভারতবর্ষ। যুগ যুগ ধরে যে সব ধর্মপ্রবর্তক, সংস্কারক, সাধক ও সন্ন্যাসী এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন **মহাবীর বর্ধমান ও গৌতম বুদ্ধ**। ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ হতে উদ্ভূত দুটি বিশিষ্ট ধর্মের প্র বর্তক ও প্রচারকরূপে এই দুই যুগপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। **বৈদিক যুগের শেষভাগে জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবৈষম্য, বলিদান, যাগযজ্ঞের বাহুল্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।** ধর্মের জটিলতা ও আচার অনুষ্ঠানের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণরা সমাজে নিজেদের যে প্রাধান্য সৃষ্টি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ধর্মের নামে জীবহত্যা অনেককে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে। ক্রমে ক্রমে এই বিক্ষোভ ধর্মান্দোলনের রূপ নেয় এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য এবং অন্তঃসারশূন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে **প্রতিবাদের পরিণতিরূপেই** জৈন ও বৌদ্ধধর্মের জন্ম হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

জৈন ধর্ম

মহাবীর বর্ধমান ও জৈনধর্ম : মহাবীরকে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মনে করা হলেও তাঁর আগে আরও তেইশ জন তীর্থঙ্কর (ধর্মপ্রবর্তক) এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। মহাবীর ছিলেন শেষ তীর্থঙ্কর, প্রথম ঋষভ। মহাবীরের আগের তীর্থঙ্কর ছিলেন **পার্শ্বনাথ**। তিনিই জৈনধর্মের সূত্রপাত করেন। তিনি যে মত প্রচার করেছিলেন তার মূল শিক্ষা ছিল অহিংসা, সত্য, অ-চৌর্য (চুরি না করা) ও অ-প্রতিগ্রহ (কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ না করা অর্থাৎ দান গ্রহণ না করা)।

পার্শ্বনাথ

মহাবীরের জীবনী

মহাবীরের পূর্ব নাম ছিল বর্ধমান। প্রাচীন বৈশালী নগরের কাছে খ্রীস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কিছুকাল গার্হস্থ্য জীবনের পর তিরিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। এরপর দীর্ঘ বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যার ফলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন ও 'জিন' (রিপুজয়ী) 'নির্গন্থ' (বন্ধন-মুক্ত) ও মহাবীর নামে পরিচিত হন। 'জিন' থেকে জৈন নামের উৎপত্তি হয়েছে। সিদ্ধিলাভের পর মহাবীর আরও তিরিশ বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। বাহাত্তর বছর বয়সে পাবা নগরে (বর্তমান পাটনা জেলায়) তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

পার্শ্বনাথ যে চারটি শিক্ষা প্রচার করেছিলেন মহাবীর তার সঙ্গে আরও একটি শিক্ষা যোগ করেন। পশ্চম শিক্ষাটি হল ব্রহ্মচর্য বা জিতেন্দ্রিয়তা। পাঁচটি নীতি একসঙ্গে **পঞ্চ** মহাব্রত নামে খ্যাত। এ ছাড়া মহাবীর ত্রিরত্ন অর্থাৎ সত্য-



মহাবীর

জৈনধর্মের মূলনীতি

বিশ্বাস, সত্য-জ্ঞান ও সত্য-আচরণ—এই তিনটি প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছিলেন। জৈনরা হিন্দুধর্মের কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশই তাঁদের মতে প্রকৃত ঐশী শক্তি। কৃচ্ছ্র-সাধন ও পঞ্চ মহাব্রত পালন করলে জন্মান্তরের বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়। জৈনমতে সকল বস্তুর প্রাণ আছে এবং হিংসা মহাপাপ। পরবর্তী কালে সঙ্কলিত মহা-

জৈন ধর্মশাস্ত্র

বীরের বাণী বারটি অঙ্গ বা খণ্ডে বিভক্ত। কালক্রমে জৈন ধর্মশাস্ত্রের এক নতুন সংস্করণ সংকলন করা হয়। পরিশোধিত জৈন ধর্মশাস্ত্রের চারটি ভাগ আছে—অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র।

প্রথম দিকে ব্যাপক প্রসার লাভ না করলেও মৌর্য যুগের সূচনায় জৈন ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। কথিত আছে যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষজীবনে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বহু জৈন সন্ন্যাসী উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করেন। এই দলের নেতা ছিলেন ভদ্রবাহু। তিনি মহাবীর-প্রবর্তিত রীতি অনুযায়ী জৈনদের বস্ত্র পরিধানের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু উত্তর দিকে যে জৈনরা রয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের নেতা স্থূলভদ্র শ্বেতবস্ত্র পরিধানের সমর্থক ছিলেন। এইভাবে বস্ত্র পরিধান সম্পর্কে বিরোধী মতকে কেন্দ্র করে জৈনরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে এই বিরোধ সুস্পষ্ট রূপ নেয়। পরবর্তী যুগে প্রায় সব জৈন ধর্মাবলম্বীরাই বস্ত্র পরিধান করলেও দুই শাখার মধ্যে বিরোধের অবসান হয়নি। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর শাখা দুটির মধ্যে বিরোধের আর একটি কারণ হল জৈন শাস্ত্র সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। দিগম্বর জৈনরা অবশিষ্ট চারটি 'অঙ্গ'কে প্রামাণিক জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে মূল 'অঙ্গ'গুলি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

জৈনধর্মের অন্তর্বিরোধ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জন্ম

জৈন ধর্ম কখনও বহির্ভারতে প্রচারিত হয়নি। কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বহু জৈন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। এখনও গুজরাট ও রাজপুতানা অঞ্চলে অনেক জৈন ধর্মী আছেন।


বুদ্ধ

বৌদ্ধ ধর্ম

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম : মহাবীর বর্ধমান ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ সমসাময়িক ছিলেন। গৌতমের আর এক নাম ছিল সিদ্ধার্থ। নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তু নগরের কাছে লুম্বিনী উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন তাঁর জন্ম হয়। পিতা শুদ্ধোধন ছিলেন ক্ষত্রিয় শাক্যবংশের নেতা। গৌতমের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাতা মায়া দেবীর মৃত্যু হয়। তখন নবজাত গৌতমের বিমাতা ও মাতৃস্বসা গৌতমী তাঁকে মানুষ করেন। ঐশ্বর্য ও

প্রাচুর্যের মধ্যে গৌতম বড় হতে থাকেন। ষোল বছর বয়সে যশোধরা বা গোপা নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঊনত্রিশ বছর বয়সে গৌতমের রাহুল নামে এক পুত্র হয়। ইতিমধ্যেই মানুষের জরা, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি দুর্দশা দেখে তাঁর মন সংসারে বীতরাগ ও অস্থির হয়ে উঠেছিল। পুত্রের জন্মের পর তিনি সংসার বন্ধনে আরও জড়িত হয়ে পড়ার ভয়ে একদিন গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করেন।

গৌতম বুদ্ধের জীবনী

সংসার ত্যাগ

সাধনা ও সিদ্ধিলাভ

গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গৌতম সত্যজ্ঞানের সন্ধানে দীর্ঘকাল নানান স্থানে ভ্রমণ ও শাস্ত্রপাঠ করেও মনে শান্তিলাভ করতে পারেননি। তখন তিনি কঠোর সাধনা ও কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হন। কিন্তু তবুও তিনি সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হন। এর পর তিনি বর্তমান বুদ্ধগয়ার কাছে এক বোধি বৃক্ষের নীচে গভীর ধ্যানমগ্ন হন ও অবশেষে 'বোধি' বা 'দিব্যজ্ঞান' লাভ করেন ও 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী নামে খ্যাত হন। তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ।

ধর্মপ্রচার

নির্বাণ

একা নিজের মুক্তিতে তৃপ্ত না হয়ে বুদ্ধ তাঁর জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ধর্মপ্রচার করেন। সর্বপ্রথম তিনি উপদেশ দেন বারানসীর কাছে সারনাথের মৃগদাব অরণ্যে। এই সময় পাঁচজন তাঁর শিষ্য হন। এ'দের মধ্যে ছিলেন সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলায়ন। ক্রমশঃ তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, মগধরাজ বিম্বিসার ও অন্যান্য বহু রাজ্যের ধনী ও দরিদ্র মানুষ তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেন। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারের পর আশি বছর বয়সে কুশীনগরে তাঁর দেহান্ত বা '**মহাপরিনির্বাণ**' ঘটে।

বুদ্ধের ধর্মমত

দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় সন্ধান করা বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। চারটি মূল নীতি বা 'আর্যসত্য' এই ধর্মের ভিত্তিঃ জগতে দুঃখ আছে; বিনাশের উপায় আছে। দুঃখ বিনাশ করতে কামনা-বাসনা দূর করতে হবে। কামনা-বাসনা নিবৃত্ত করার কতকগুলি উপায় আছে, যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সৎ কর্ম, সদ্‌বাক্য, সৎ সঙ্কল্প, সৎ চেষ্টা, সৎ জীবন, সৎ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। এই আটটি উপায়ের নাম '**অষ্টাঙ্গিক মার্গ**'। এই পথেই মুক্তি বা 'নির্বাণ' সম্ভব। নির্বাণ লাভ করলে মানুষের আর জন্ম হয় না, দুঃখভোগ থেকে মুক্তি হয়।

মূলনীতি

কর্মবাদ ও **অহিংসা** বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। এই ধর্মের আর এক বৈশিষ্ট্য '**পঞ্চশীল**'। এই শীল ও নীতিগুলি হল মিথ্যা না বলা, চুরি না করা, অন্যায় আচরণ না করা, জীব-হিংসা ও বিলাসব্যসন বর্জন করা। বুদ্ধ ভোগবিলাস বা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন দুয়েরই বিরোধী ছিলেন। তিনি 'মঝ্‌ঝিম পথ' বা মধ্যপন্থাকেই শ্রেয়ঃ মনে করতেন। বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে

কিছু বলেননি। তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। যাগযজ্ঞের সার্থকতায় তিনি অবিশ্বাস করতেন।

বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৌদ্ধ সংঘঃ বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত মুখে প্রচার করেছিলেন। সাধারণ মানুষ যাতে তাঁর উপদেশের মর্ম বুঝতে পারে তার জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষার বদলে পালি ভাষায় উপদেশ দিতেন। পালি ছিল সে যুগের কথ্য ভাষা। বুদ্ধের নির্বাণের পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করেন। সংকলিত উপদেশগুলি 'ত্রিপিটক' নামে পরিচিত হয়। এই সংকলনের তিনটি অংশ—(১) সূত্রপিটক ঃ এতে বুদ্ধের বাণী ও প্রচার-কাহিনী আছে ; (২) বিনয়পিটক ঃ এই অংশে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জন্য নির্দেশ ও নিয়মাবলী আছে ও (৩) অভিধর্মপিটক ঃ এই অংশে বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি ও তত্ত্ব সংকলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে জৈন ধর্মের মত বৌদ্ধ ধর্মও দুভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। একটির নাম হয় **হীনযান** ও আর একটির নাম **মহাযান**। এই মতভেদের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, ব্যাখ্যা, কোষগ্রন্থ প্রভৃতি লেখা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্যের আর এক সম্পদ 'জাতক'। জাতকের অপূর্ব সুন্দর গল্পগুলি বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী। জাতকের কাহিনীগুলিতে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানও রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের জন্য একটি সঙ্ঘ গড়েন ও তাঁদের জন্য কয়েকটি নিয়ম নির্দেশ করেছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা 'ভিক্ষু'রা বৌদ্ধ মঠ বা **সঙ্ঘারামে** বাস করতেন। প্রথমে বৌদ্ধ সংঙ্ঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও পরে তাদের 'ভিক্ষুণী' হবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের পর ক্রমে ক্রমে তাঁর মত ও পথের সঠিক ব্যাখ্যা ও অনুসরণ করা নিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। এর সমাধানের জন্য তাঁর শিষ্যরা রাজগৃহে প্রথম একটি **বৌদ্ধ সঙ্গীতি** (Buddhist Council) আহ্বান করেন। এই সম্মেলনেই বুদ্ধের উপদেশ সঙ্কলিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আরও তিনটি বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহুত হয়েছিল।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও সঙ্গীতি

হীনযান বৌদ্ধেরা বুদ্ধের সনাতন আদর্শ ও মতামতের কোনও পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মহাযান বৌদ্ধেরা তাঁদের ধর্মকে আরও সহজ সরল করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা মূর্তিপূজা, ভক্তিবাদ ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মভুক্ত করেছিলেন। বুদ্ধের দেহান্তের পরবর্তী যুগে বহু বিদেশী জাতির মানুষ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ও বিদেশী প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মত-বিরোধের প্রধান কারণ ছিল। কুষাণ আমলে মহাযান মতবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়

এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ এবং বহির্বিশ্বে প্রচারিত হয়েছিল। এদেশে

এবং বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট অশোক পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। কুষাণ যুগে, বিশেষতঃ কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায়, বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। মধ্য-এশিয়া, দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনও ঐ সব অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আছেন।

বৌদ্ধধর্মের বিস্তার

মৌর্য সম্রাট অশোক ও কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের মত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা, বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত উদারতা, যুগোপযোগী নমনীয়তা, সাংগঠনিক শক্তি এবং সকল মানুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বৌদ্ধ ধর্ম সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

সাফল্যের কারণ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য চিরস্থায়ী হয়নি। বর্তমান বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থাকলেও, এই ধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের মূলে কতকগুলি কারণ ছিল। ব্রাহ্মণরা এই ধর্মের প্রবল বিরোধী ছিলেন। কালক্রমে ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সক্রিয় হন। কণিষ্কের পর একমাত্র হর্ষবর্ধন ছাড়া বৌদ্ধ ধর্ম কোন শক্তিশালী ভারতীয় সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের উৎপীড়ন বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ। বৌদ্ধ সঙ্ঘের মধ্যেও কালক্রমে বহু অন্যায় ও অনাচার প্রবেশ করায় বৌদ্ধ সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। হিন্দু ধর্মের আত্মীকরণের ক্ষমতাও বৌদ্ধ ধর্মের পতনের আর এক কারণ।

পতনের কারণ

বৌদ্ধ ও জৈন এই দুটি ধর্মই প্রতিবাদী আন্দোলনের ফল স্বরূপ উদ্ভব হয়। দুটি ধর্মই উপনিষদের আদর্শে প্রভাবিত। অহিংসা এদের মূল কথা। দুই ধর্মমতেই জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলের প্রভাব স্বীকৃত। বেদের অপৌরুষেয়তা দুই ধর্মই স্বীকার করেছে। নির্বাণ বা মুক্তিই হল দুই ধর্মের মোক্ষ।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পার্থক্য

বৌদ্ধ ধর্মে সঙ্ঘ গঠন করা হয়, কিন্তু জৈনরা সঙ্ঘ গঠন করেননি। পরবর্তীকালে জৈন ধর্মে হিন্দুধর্মের প্রভাব কিছুটা দেখা যায়। এই ধর্মে 'গণেশ' ও 'লক্ষ্মী'র পূজা করা স্বীকৃত হয়।

পঞ্চম অধ্যায় | # সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের যুগ

ষোড়শ মহাজনপদ

অন্যান্য রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও নিজেকে 'সম্রাট' বা 'রাজচক্রবর্তী' রূপে ঘোষণা করা ছিল প্রাচীন যুগের রাজাদের এক প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য। ঐক্যবদ্ধ সুসংহত সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কালের নিয়মে এক সাম্রাজ্যের উত্থান ও অপর একের পতন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।

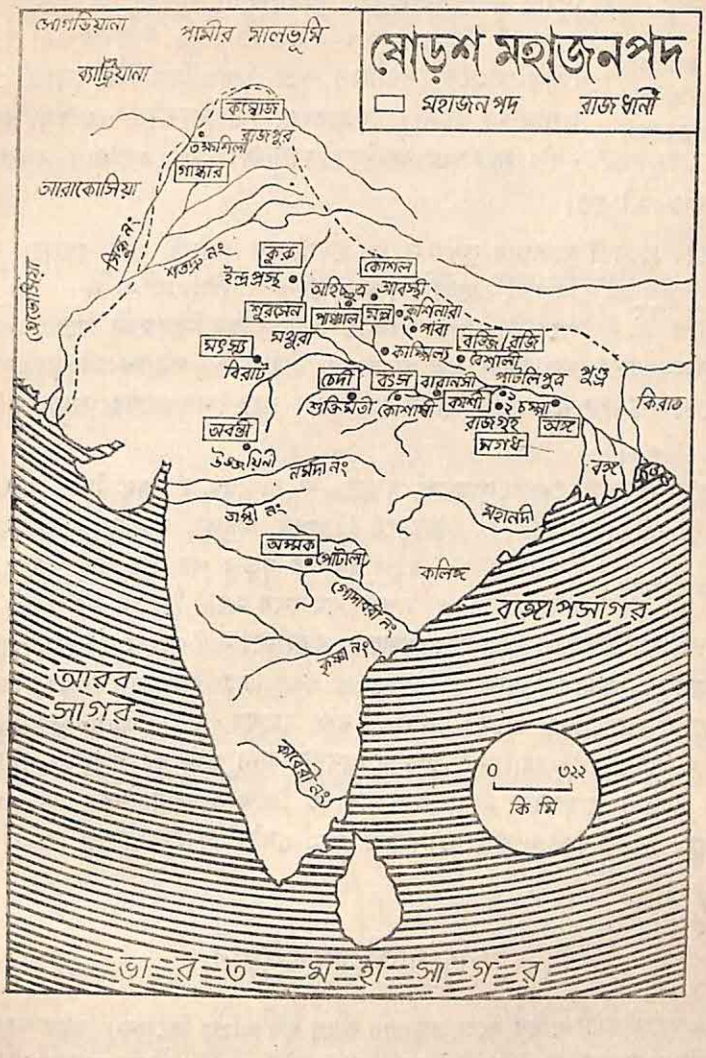
ভূমিকা

সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রায় অজানা রয়ে গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক যুগে আর্যাবর্তে কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল না। ঐ যুগের ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে ষোলটি মহাজনপদ' বা রাজ্যের নাম সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে, বৌদ্ধ "অঙ্গুত্তর নিকায়" ও জৈন 'ভগবতি সূত্রে' পাওয়া যায়। এই রাজ্যগুলি হল ঃ অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), কাশী (বারাণসী), কোশল (অযোধ্যা), বৃজি (উত্তর বিহার), মাল্লা (গোরক্ষপুর জেলা), ছেদি (যমুনা এবং নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চল), বৎস (এলাহাবাদ অঞ্চল) কুরু (থানেশ্বর, দিল্লী ও মীরাঠ জেলাগুলি), পাঞ্চাল (বেরিলি, বুদান এবং ফারাক্কাবাদ জেলাগুলি), মৎস (জয়পুর), সুরসেনা (মথুরা), আস্মক (গোদাবরী উপত্যকা), অবন্তী (মধ্যভারতের মালোয়া), গান্ধার (পেশোয়ার ও রাওয়ালপিণ্ডী জেলাগুলি), এবং কাম্বোজ (দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীর ও কাফোরস্থান)। এই রাজ্যগুলির কয়েকটি ছিল প্রজাতন্ত্র ও অন্য কয়েকটি ছিল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রশাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে বৃহত্তর ও শক্তিশালী ছিল কাশী, কোশল, অবন্তী, বৎস এবং মগধ।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের ষোলটি মহাজনপদ

মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়

কালক্রমে এই রাজ্যগুলির মধ্যে ক্রমাগত বিরোধের ফলে কোশল ও মগধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হর্যঙ্ক বংশের রাজা বিম্বিসার মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। বিম্বিসার কুটনৈতিক দৌত্য ও যুদ্ধ এই দ্বৈত নীতি অনু-


ষোড়শ মহাজনপদ
মহাজনপদ
রাজধানী
সোগডিয়ানা
পামীর মালভূমি
ব্যাক্ট্রিয়ানা
কম্বোজ
রাজপুর
তক্ষশিলা
গান্ধার
আরাকোসিয়া
সিন্ধু নং
শতদ্রু নং
কুরু
ইন্দ্রপ্রস্থ
কোশল
অহিচ্ছত্র
শ্রাবস্তী
শুরসেন
পাঞ্চাল
মল্ল
কুশিনারা
পাবা
মথুরা
মৎস্য
বিরাট
কাম্পিল্য
বজ্জি/বৃজি
বৈশালী
চেদী
বৎস
বারানসী
পাটলিপুত্র
কাশী
চম্পা
শুক্তিমতী
কৌশাম্বী
রাজগৃহ
অঙ্গ
কিরাত
অবন্তী
মগধ
উজ্জয়িনী
নর্মদা নং
বঙ্গ
তাপ্তী নং
মহানদী
অস্মক
পৌটালী
কলিঙ্গ
গোদাবরী নং
বঙ্গোপসাগর
কৃষ্ণা নং
আরব সাগর
কাবেরী নং
0 ৩২২
কি মি
ভারত মহাসাগর

সরণ করে তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি গান্ধার রাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং মদ্র, কোশল, বৈশালী রাজ্যের রাজকন্যাদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহ নীতি বিম্বিসারের রাজ্যবিস্তারে সাহায্য করেছিল। তাঁর রাজধানী ছিল রাজগৃহ। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু প্রতিদ্বন্দ্বী কোশলরাজকে পরাজিত করে মগধ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অজাতশত্রু পুত্র **উদয়ীর** সময় গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত **পাটলীপুত্র** (পাটনা) মগধরাজ্যের নতুন রাজধানী হয়।

হর্যঙ্ক বংশের অধীনে মগধের প্রাধান্য বিস্তার

উদয়ীর পরবর্তী রাজাদের কুশাসন ও উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা রাজ্যের বিশিষ্ট অমাত্য **শিশুনাগকে** সিংহাসনে বসান। শিশুনাগের পরে তাঁর পুত্র **কালাশোক** মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি হর্যঙ্ক বংশের শেষ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। কিছুকাল পর কালাশোককে হত্যা করে **মহাপদ্মনন্দ** মগধের সিংহাসন অধিকার করে নন্দবংশের শাসনের সূচনা করেন।

শিশুনাগ বংশ

নিম্ন বংশজাত হলেও মহাপদ্মনন্দ যোগ্যতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে এতবড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আর কেউ হয়নি। মহাপদ্মনন্দের মৃত্যুর পর তাঁর আট পুত্র পর পর রাজত্ব করেন। নন্দবংশের শেষ সম্রাট ছিলেন **ধননন্দ**। তাঁরই রাজত্বকালে **আলেকজাণ্ডার** ভারত আক্রমণ করেছিলেন (৩২৭-৩২৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ)। নন্দ সাম্রাজের সামরিক শক্তি ও বিশালতার কথা চিন্তা করে ও সৈন্যদের অনিচ্ছার জন্য আলেকজাণ্ডার আর অগ্রসর হননি। নন্দ বংশের শেষ রাজা ধননন্দ তাঁর অর্থ-লিপ্সা ও বিরাট সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রজাদের করভারে নিপীড়িত করেন। এজন্য প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই অবস্থায় **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য** ধননন্দকে সিংহাসনচ্যুত করে **মৌর্য রাজবংশের** ভিত্তি স্থাপন করেন।

নন্দবংশের শাসন

মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান

ধননন্দ অত্যাচারী শাসক বলে প্রজাদের কাছে খুব অপ্রিয় ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের অল্পকালের মধ্যেই **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য** নন্দবংশ উচ্ছেদ করে মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (আঃ ৩২১ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ)। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশপরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি শূদ্র না ক্ষত্রিয় ছিলেন তা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কথিত আছে যে নন্দবংশের উচ্ছেদ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কাজে চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশীলার এক অসাধারণ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছিলেন। এ'র

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

নাম ছিল চাণক্য বা কৌটিল্য।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধান কৃতিত্ব হল—

তিনি অত্যাচারী ধননন্দকে উচ্ছেদ করে সমগ্র মগধ সাম্রাজ্য দখল করেন,

গ্রীকদের বিতাড়িত করে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতকে বৈদেশিক শাসন মুক্ত করেন,

সেলুকাসের নিকট হতে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও মাকরাণ লাভ করেন এবং

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

উত্তরে হিন্দুকুশ ও হিমালয় থেকে দক্ষিণে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষকে শুধু বৈদেশিক আক্রমণ ও শাসন থেকে মুক্ত করেননি, এক বিরাট ভারতীয় ভূভাগকে একত্রীকরণ করে এবং এক রাজচক্রবর্তীর ছত্রচ্ছায়ায় এনে, তিনিই প্রথম রাষ্ট্রিয় ঐক্য সাধন করেন। ভারতীয় ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করেন।

আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তর কাছে পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সন্ধির ফলে কাবুল, কান্দাহার, হীরাট এবং বেলুচিস্থান মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। এর বদলে সেলুকাস পেয়েছিলেন ৫০০ হাতি। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে এক দূত পাঠিয়েছিলেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ

মহাকাব্যের যুগের কালনির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু মৌর্য যুগ থেকে ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিবর্তন অনুসরণ ও বিশ্লেষণ করতে অসুবিধা হয় না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ 'ইণ্ডিকা' থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনার সব কিছু নির্ভুল নয়।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা কিছুটা অতিরঞ্জিত। তবু তাঁর রচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে মগধ সাম্রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী ছিল। রাজধানী পাটলীপুত্র নগরী ও রাজপ্রাসাদ ছিল সুবিন্যস্ত, সুসজ্জিত ও অপূর্ব সুন্দর। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে মৌর্যযুগে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। নগরের শাসনব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠু।

মৌর্য যুগ সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণ

মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের সরলতা, সাধুতা ও সত্যবাদিতার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতীয়েরা মামলা-মকদ্দমা, বিরোধ পছন্দ করে না। চুরি বা অন্য অপরাধ খুব কম হয়। ভারতীয়েরা মিতাহারী ও মিতাচারী। বেশভূষার আড়ম্বর ও অলঙ্কার তাদের প্রিয়। ভারতীয়েরা বৃত্তি অনুসারে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—দার্শনিক, কৃষক, শিকারী ও পশুপালক, শিল্পী ও বণিক, সৈনিক, পরিদর্শক এবং অমাত্য।

ভারতীয়দের চরিত্র

কৃষকের সংখ্যা ছিল বেশী এবং যুদ্ধের সময় পর্যন্ত তারা নির্বিঘ্নে চাষ করতো, কেন না সকলেই জানতো কৃষকরা জনহিতকর কাজে ব্যস্ত থাকে।

বৃত্তি

মেগাস্থিনিস বলেছেন, শস্যশ্যামল উর্বর ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না। প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং জলসেচের সুব্যবস্থা আছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় না, মেগাস্থিনিসের এই ধারণা ঠিক না হলেও, তাঁর বর্ণনা থেকে মৌর্য যুগের কৃষিকর্মের উন্নতি ও আর্থিক সঙ্গতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মৌর্য যুগে রাজা বিশেষ ক্ষমতাশালী হলেও প্রজাকল্যাণ ও লোকহিতকর কর্ম ছিল তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য। বিচার-ব্যবস্থার প্রতি সম্রাটের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অপরাধীরা কঠোর শাস্তি পেত।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে শাসন ব্যবস্থা সুসংহত ছিল। রাজা ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক। শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু রাজা নিজে কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতার দাবী করতেন না। রাজাকে

চন্দ্রগুপ্তের শাসন ব্যবস্থা

রাজ্যশাসনে সাহায্য করতেন মন্ত্রী পরিষদ। রাজা শাসন কার্য্য ও বিচার বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতেন এবং যুদ্ধে নিজে সৈন্য পরিচালনা করতেন। চন্দ্রগুপ্ত, এমন কি দিবাভাগে নিজের বিশ্রাম উপেক্ষা করে প্রজাদের অভাব, অভিযোগ ও আবেদন শুনতেন। রাজ-কর্মচারী ও প্রজাদের জন্য মাঝে মাঝে রাজ্যশাসনের নীতি নির্দেশক নিয়ম-কানুন প্রকাশ করতেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের লেখা 'অর্থশাস্ত্র' নামক একটি গ্রন্থ ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সুশাসক ছিলেন। মৌর্য শাসনব্যবস্থা সুসংগঠিত ছিল। অবশ্য 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি ঠিক কোন শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল এবং এটি কৌটিল্যেরই লেখা কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে।

বিন্দুসার

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গ্রীসের রাজাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য ছিল। মিশরের রাজা তাঁর রাজসভায় এক দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতে মৌর্য অধিকার বিস্তার করেছিলেন।

অশোক

বিন্দুসারের পর তাঁর পুত্র অশোক মগধের রাজা হন (আঃ ২৭৩ খ্রীঃ পূঃ)। কিন্তু তাঁর অভিষেক সম্পন্ন হয় সম্ভবতঃ চার বছর পরে (২৬৯ খ্রীঃ পূঃ)। তাঁর শিলালিপিতে অশোক নিজেকে 'দেবানাম্প্রিয়' (দেবতাদের প্রিয়) এবং 'প্রিয়দর্শী' রূপে উল্লেখ করেন। কথিত আছে যে সিংহাসন লাভের জন্য অশোক প্রচুর রক্তপাত, এমন কি ভ্রাতৃহত্যা করতে পর্যন্ত দ্বিধা করেন নি। এই কারণে তিনি 'চণ্ডাশোক' নামে পরিচিত হন। কিন্তু চণ্ডাশোকই একদিন জগতে 'ধর্মাশোক' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তবন্যা ও মর্মান্তিক দৃশ্য অশোকের হৃদয়ের এই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। রাজ্যবিস্তারের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য নিয়ে অভিষেকের আট বছর পর অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে জয় হলেও যুদ্ধের রক্তস্রোত, ধ্বংসলীলা ও নিষ্ঠুরতা দেখে অশোক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। বিম্বিসার মগধ সাম্রাজ্যের যে বিস্তার শুরু করেছিলেন অশোক কলিঙ্গ বিজয়ে তার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন।

কলিঙ্গ জয়

সাম্রাজ্যের সীমানা

অশোকের রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্থানের কিছু অংশ, হিন্দুকুশ ও কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র থেকে পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত বড় সাম্রাজ্য আর কখনও গড়ে ওঠে নি।

কলিঙ্গ জয়ের পর শোকাহত এবং অনুতপ্ত সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সকল জীবের প্রতি দয়া, অহিংসা, সত্য, সততা, দান, পিতা-মাতা ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, অধীনস্থের প্রতি কোমল এবং শিষ্ট ব্যবহার, জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি ছিল অশোকের ধর্মের মূল কথা। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য 'নির্বাণ', 'আর্যসত্য', অষ্টাঙ্গিক মার্গ' প্রভৃতির উল্লেখ না থাকায় অশোকের প্রচারিত ধর্ম প্রকৃত অর্থে বৌদ্ধধর্ম কিনা এই বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধ সঙ্ঘের পরিচালনা ও সংগঠনের কাজে অশোক সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি সঙ্ঘের সংহতি রক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি এই উদ্দেশ্যে পাটলিপুত্রে একটি বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও ধর্ম প্রচার

অন্য ধর্ম ও ধর্মালম্বীদের প্রতিও তিনি উদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন। পরধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব যে অন্যায় ও ক্ষতিকর তা সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত অশোক দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের নীতি গ্রহণ করেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে সামরিক বলে জয় করার থেকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করাই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন এবং বৈদেশিক রাজ্যগুলি সম্পর্কেও একই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন রাজ্যে সামরিক অভিযানের পরিবর্তে অশোক প্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচার করতে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। সুদূর দাক্ষিণাত্যের চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে এবং তাম্রপর্ণী বা সিংহল দ্বীপে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) এবং ব্রহ্মদেশে তিনি এই উদ্দেশ্যে দূত পাঠান। সুদূর পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপের রাজ্যগুলিতেও তিনি শান্তি, মৈত্রী ও ধর্মপ্রচারের দূত পাঠিয়েছিলেন। সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডোনিয়া, কাইরেন, এপিরাস প্রভৃতি রাজ্যের গ্রীক নৃপতিদের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এর ফলে ভারত ও এই রাজ্যগুলির মধ্যে ধর্মীয় যোগাযোগ ছাড়া সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিকটতর হয়েছিল।

বৈদেশিক সম্পর্ক

রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রেও অশোক প্রজাকল্যাণের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। প্রজাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও উন্নতি ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাঁর মহান আদর্শ ও কৃতিত্বের জন্য অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে এক উজ্জ্বল তারকার মত বিরাজ করছেন। তাঁর পূর্বে বা পরে অন্য কোনও সম্রাট প্রজাকল্যাণ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি এবং অহিংসাব্রতকে এই ভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করেন নি। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রতীক 'অশোক স্তম্ভ' সম্রাট অশোকের আদর্শের প্রতি চিরন্তন শ্রদ্ধার স্বাক্ষর বহন করছে।

অশোকের মহত্ত্ব

অশোকের মৃত্যুর (আঃ ২৩২—২৩১ খ্রীঃ পূঃ) অল্পকালের মধ্যেই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়। অনেকে মনে করেন যে অশোকের পরবর্তী মৌর্য সম্রাটের

অযোগ্যতা, কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা, প্রাদেশিক কুশাসন, বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। আর একটি মত হল যে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে ও প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করে অশোক ব্রাহ্মণদের ক্ষুব্ধ করেছিলেন। তাদের বিরোধিতা মৌর্য শাসনকে দুর্বল করেছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে দিগ্বিজয়ের আদর্শ বর্জন এবং শান্তি ও মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করে অশোক রাজ্যের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন। এর ফলে অশোকের মৃত্যুর পর যখন বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হয় তখন সাম্রাজ্য রক্ষা করার মত শক্তি বা মনোবল মৌর্য শাসক ও সৈন্যদের ছিল না। এতগুলি মতের মধ্যে কোন একটিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়। বিভিন্ন কারণের সমাবেশেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল বলে অনুমান করাই সমীচীন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের অর্থনৈতিক কারণ আছে। মৌর্য আমলে প্রজাদের উপর উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য্য করা হয়। এই কর জমির উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ হিসাবে ধার্য্য হত। এর জন্য প্রজারা উৎপীড়িত হয় ও রাজ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। রোমিলা থাপারের মতে অশোক তাঁর সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেননি। প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের জন্য তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করতেন। বিপুল সংখ্যক কর্মচারী, বিরাট সৈন্যদল ও অশোকের জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প ও স্তম্ভ, স্তুপ প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হত। ফলে মৌর্য অর্থনীতিতে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মুদ্রায় খাদের ভাগ ক্রমশঃ বেশী হওয়ায়। রাজ্যে অর্থনৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। শাসক ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ফলে সাম্রাজ্যের পতন হয়। দীর্ঘকাল পর গুপ্তযুগে মগধের পুনরভ্যুদয় হয় ও মগধ তার প্রাচীন গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পায়।

ভারতে বৈদেশিক আক্রমণঃ প্রতিরোধ ও প্রভাব

গগনচুম্বী হিমালয় পর্বতশ্রেণী, বিশাল সমুদ্র ও দুস্তর মরুভূমির বেষ্টনী সত্ত্বেও ভারতভূমি বৈদেশিক আক্রমণমুক্ত থাকতে পারে নি। ভারতের ঐশ্বর্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য যুগে যুগে রাজ্য ও যশোলোভী বিদেশী বীর ও অর্থলোভী বণিক ও লুণ্ঠনকারীদের প্রলুব্ধ করেছে।

খ্রীস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সূচনা করেন অকেমিনিয়ান রাজ বংশের পারস্য সম্রাট কুরুস বা কাইরাস। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তারপর পারস্য-সম্রাট দারায়ুস গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা জয় করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে পারসীক অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

পারসীক আক্রমণ

পরবর্তী বৈদেশিক আক্রমণের ঘটনা (৩২৭-৩২৬ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ) ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সুপরিচিত অধ্যায়। পিতা ফিলিপের মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে আলেকজাণ্ডার গ্রীস দেশে ম্যাসিডনের রাজা হন। তিনি গ্রীসের প্রাচীন শত্রু পারস্য সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ জয় করে দিগ্বিজয়ের পথে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। উত্তর-পশ্চিম

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

ভারত তখন কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজনৈতিক অনৈক্য আলেকজাণ্ডারের ভারতজয়ের পথ সহজ করেছিল। তক্ষশীলার রাজা আম্ভি বিনা যুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। সিন্ধুনদের পশ্চিম পারের রাজ্যগুলি জয় করে আলেকজাণ্ডার বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী একটি ছোট্ট রাজ্য আক্রমণ করেন। এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন পুরু। আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে পুরুর সংগ্রামের কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। এর পর বিপাশা নদী পার হয়ে পূর্ব দিকে গাঙ্গেয় উপত্যকা জয় করে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত অগ্রসর হবার বাসনা আলেকজাণ্ডারের ছিল। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিশাল নন্দ সাম্রাজ্যের বিরাট সৈন্যবাহিনীর কথা শুনে গ্রীক সৈন্যরা আর অগ্রসর হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তারা দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সৈন্যবাহিনীর অনিচ্ছা ও অন্যান্য কারণে আলেকজাণ্ডার স্বদেশে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। পথে ব্যাবিলনে ৩২৩ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক অধিকারের অবসান ও সেলুকাসের পরাজয়

ভারতে গ্রীক অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রীক সেনাপতিদের পরাজিত করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলি গ্রীক অধিকারমুক্ত করেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি ও অন্যতম উত্তরাধিকারী **সেলুকাস** ভারতবর্ষে গ্রীক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে শান্তি ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফল

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় যে, তাঁর অভিযানের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে চারটি যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয় ; এর মধ্যে তিনটি স্থলপথ ও একটি জল পথ। এই যোগাযোগের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে এবং সংস্কৃতির আদান প্রদান হয়। এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রতিফলন দেখা যায় শিল্পকলায়, যেমন গান্ধার শিল্প ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, ও সাহিত্যে। গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণের ফলে গান্ধার শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। ভারতীয় মুদ্রা রচনা ও মুদ্রাঙ্কনেও গ্রীক ও রোমান প্রভাব পড়েছিল।

পরোক্ষ প্রভাব হল ম্যাসিডোনিয়ান অভিযানের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ক্ষমতা হারায় ও গ্রীকদের অধীনে আসে। পরবর্তী কালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঐসব অঞ্চল জয় করে মগধের অধীনে এক রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের গুরুত্ব হল যে, তাঁর সঙ্গে যেসকল গ্রীক ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে এই সময়কার ঘটনা-

বহুল ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করে যান, যার সাহায্যে সমসাময়িক ভারত ইতিহাস রচনার অনেক উপাদান পাওয়া যায়।



বুদ্ধের মূর্তি (গান্ধার শিল্প)

মৌর্য সাম্রাজ্যের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে ব্যাকট্রীয় গ্রীক বা ইন্দোগ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতিগুলির অনুপ্রবেশ ঘটে। হিন্দুকুশের অপর পারে ব্যাকট্রীয়ার নাম ছিল 'বহ্লীক দেশ'। এজন্য ব্যাকট্রীয় গ্রীক বা ইন্দো-গ্রীকদের বলা হত বহ্লীক।

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর (২৩২ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ) মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পার্থিয়া ও বহ্লীক দেশের গ্রীক রাজারা বারবার ভারত আক্রমণ করতে থাকেন। মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধের সিংহাসনে বসে শুঙ্গবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে শুঙ্গবংশের

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বহ্লীক গ্রীকদের (ইন্দোগ্রীক) আক্রমণ

রাজারাও দুর্বল হয়ে পড়েন ও কান্ববংশের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কান্ববংশের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শুঙ্গ ও কান্ব বংশের রাজত্বকালে যে সব বিদেশী রাজা উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার গ্রীক রাজা তৃতীয় আন্তিয়োকস্, ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজা ডেমেট্রিয়স্, য়ুক্রাতিদিস ও মিনান্দার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক অধিকারের সীমানা কম ছিল না। পাঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) নগর ছিল মিনান্দারের রাজধানী।

শক আক্রমণ

বহ্লীক রাজ্যের গ্রীকদের পর ভারতবর্ষে আসে মধ্য-এশিয়ার যাযাবর জাতি। এরা শক, পল্লব ও ইউ-চি এই তিন দলে বিভক্ত ছিল। শকদের আদি বাসস্থান ছিল অক্ষু (Oxus) নদীর উত্তর পারে। ঘটনাচক্রে ইউ-চি জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে শকরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের গ্রীকদের পরাজিত করে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। তক্ষশীলা, মথুরা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নগর তারা জয় করেছিল। ক্রমশঃ পশ্চিম ভারতের মালব ও সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শক রাজ্যগুলির শাসকদের মধ্যে সৌরাষ্ট্রের মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন (১৩০-১৫০ খ্রীস্টাব্দ) ও ভৃগুকচ্ছের (বর্তমান ব্রোচ) ক্ষত্রপ নহপান-এর বিশেষ ক্ষমতা ও খ্যাতি ছিল। পশ্চিম ভারতের শক রাজ্যগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত চতুর্থ শতকের শেষভাগে শকদের পরাজিত করে 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন।

পহ্লব আক্রমণ

উত্তর-পশ্চিম ভারতে শকদের পর আসে পহ্লব বা পারদ জাতি। পহ্লব রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল গণ্ডোফারনিস। এঁরই রাজসভায় যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস এসেছিলেন বলে কথিত আছে।

সামাজিক প্রভাব

বৌদ্ধ ধর্মে বিদেশী প্রভাব

ভারতবর্ষে বহ্লীক দেশীয় গ্রীক, শক্, পহ্লব, ইউ-চি প্রভৃতি যে সব জাতি প্রবেশ করেছিল তারা কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। অনেক গ্রীক হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিল। হেলিওডোরস্ নামে এক গ্রীক দূত বিষ্ণুভক্ত হয়ে একটি গরুড় স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এই যুগের বৈদেশিক জাতির অধিকাংশ মানুষই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মিনান্দার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধাচার্য নাগসেনকে বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত যে সব প্রশ্ন করেছিলেন তা 'মিলিন্দ পাঞ্হো' নামে একটি গ্রন্থে লেখা রয়েছে।

কুষাণ যুগে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের কথা সুপরিচিত। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে হীনযান ও মহাযান শাখার উৎপত্তির মূলে ছিল বৈদেশিক প্রভাব। মৌর্যোত্তর যুগের শিল্প ও স্থাপত্যেও এই প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রীক শিল্পীদের নির্মিত অনেক বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধলীলার প্রতিমা পাওয়া গেছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণের কারণ

বিদেশী জাতিভুক্ত অধিকাংশ লোকই কেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার কারণ উপলব্ধি করা দুরূহ নয়। ঐ যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে তাদের পক্ষে ভারতীয় সমাজে প্রবেশ ও মর্যাদালাভ করা অনেক সহজ ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মানলাভের জন্য জন্মগত পরিচয়ের মূল্য ছিল খুব বেশী। সেই তুলনায় বৌদ্ধ ধর্ম ছিল উদার ও সমদর্শী। তাছাড়া মৌর্যোত্তর যুগ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্যের যুগ। এই ধর্ম গ্রহণ করে সমাজে মেলামেশার ও স্বীকৃতি পাবার সুযোগ সুবিধা ছিল বেশী।

বিদেশী জাতির প্রতি হিন্দুধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

ভারতে আগমনের পর কালক্রমে গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতিভুক্ত লোকেরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে সক্ষম হয়। তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষে এদের উপেক্ষা বা অবহেলা করা আর সম্ভব ছিল না। প্রভাবশালী ও বিত্তশালী বৈদেশিক জাতিগুলিকে 'পতিত ক্ষত্রিয়' আখ্যা দিয়ে হিন্দু সমাজভুক্ত করার চেষ্টা শুরু হয়। গুপ্তোত্তর যুগে অনেক বিদেশী জাতি-উদ্ভূত মানুষ নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেছিল।

বিদেশী আগমনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া

হিন্দু সমাজব্যবস্থার ওপর বৈদেশিক জাতিগুলির আগমনের প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন বিদেশী জাতি দলে দলে ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করে তখন হিন্দু সমাজরক্ষকরা সমাজে 'ম্লেচ্ছ জাতির' অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েন। বিদেশীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি এবং প্রাধান্য জাতিভেদ প্রথার ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই সমাজব্যবস্থা রক্ষার জন্য নানারকম বিধিনিষেধ রচনা করা হয়। এর ফলে হিন্দুসমাজের উদারতা অনেকখানি লুপ্ত হয়ে সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়। জাতিভেদপ্রথা কঠোর হয়ে পড়ে। হিন্দুরা বিদেশীদের 'ম্লেচ্ছ' অভিহিত করে তাদের সঙ্গে মেলামেশা পরিহার করার চেষ্টা করতে থাকে।

সমুদ্র-যাত্রাবিরোধী মনোভাবের জন্ম

ক্রমে ক্রমে সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে হিন্দু শাস্ত্রকাররা বিধিনিষেধ আরোপ করতে শুরু করেন। 'কালাপানি' পার হওয়ার বিরুদ্ধে সংস্কারের জন্ম হয়। ধর্মজীবনে বাহিক আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য দেখা দেওয়ায় মনে করা হত যে সমুদ্র-যাত্রাকালে এবং বিদেশে (ম্লেচ্ছদের রাজ্যে) সবরকম বিধিনিষেধ ঠিক মত পালন করা সম্ভব নয়।

এই মনোভাব আরও তীব্র হলে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। এর ফলে দেশে বণিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্যও কিছুটা হ্রাস পেয়ে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

গুপ্তযুগের শেষ দিকে হূণ আক্রমণ ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। কিন্তু হূণ আক্রমণের সামাজিক প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই সময় দেশের চারিদিকে যে অরাজকতা দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দু ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন ও উপকারিতার কথা অনেকে অনুভব করে। কিন্তু এর ফলে সমাজে উচ্চজাতি বা বর্ণের প্রাধান্য আরও বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে নিম্নজাতিভুক্ত মানুষের মর্যাদা আরও কমে যায়। দেশ শাসন, রাজনীতি ও সংস্কৃতি-চর্চা ইত্যাদি কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বদেশ এমন কি স্বাধীনতা সম্বন্ধেও অনীহা দেখা দেয়। এই ক্রমবর্ধমান বিভেদ ও বৈষম্য ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল।

হূণ আক্রমণের সামাজিক কুফল

অর্থনৈতিক প্রভাব

ভারতে বিদেশী অধিকারের এক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ফল ছিল সমাজে বণিক শ্রেণীর উত্থান ও প্রাধান্য। বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির আগমনের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, পশ্চিম মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দূর-প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সমসাময়িক শিলালিপি, তাম্রলিপি ও সাহিত্যে বণিক শ্রেণীর আর্থিক সমৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সময়ে রোম সাম্রাজ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা আমদানি হত। বণিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য মৌর্যোত্তর যুগ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের এক বৈশিষ্ট্য। এই যুগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধির মূলেও ছিল এই শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা।

বণিক শ্রেণীর উত্থান ও প্রাধান্য

বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের আর একটি ফল ছিল কারিগরী শিল্পী এবং তাদের 'সঙ্ঘ'গুলির (Guild) সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। তাদের কর্মদক্ষতার ওপর রপ্তানি বাণিজ্য নির্ভরশীল ছিল বলে কারিগরী শিল্পীদের সামাজিক মানও উন্নত হয়। শিল্পী 'সঙ্ঘ'গুলি খনি-বিদ্যা, ধাতু-বিদ্যা, বয়ন-বিদ্যা, রঞ্জনীবিদ্যা ইত্যাদি কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্ররূপেও পরিচিতি লাভ করেছিল। যেখানে কাঁচামাল সহজলভ্য ছিল, সেখানে শিল্প গড়ে উঠেছিল।

কারিগরী শিল্প ও শিল্পীসঙ্ঘের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি

কৃষি কিন্তু রাজস্ব আদায়ের মূল উৎস ছিল, যদিও শুল্ক থেকে প্রচুর আয় হত। কৃষকদের নানা সুযোগ, সুবিধা দেওয়া হত। ভারী লাঙ্গলের দ্বারা ব্যাপক চাষ-আবাদ করা হত ও চাষের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা ছিল।

কৃষি কার্য

ভারতীয় জনসমাজে বৈদেশিক প্রভাব

ইতিহাসের প্রায় সূচনাকাল থেকে ভারতে বৈদেশিক জাতির আগমনের যে স্রোত শুরু হয়েছিল তা এদেশের কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বস্তরে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলেই দেখা দিয়েছিল ভারতের জাতি বৈচিত্র্য ও বৈষম্য। যুগ যুগ ধরে কত মানুষের কত স্রোত যে ভারতের জনমহাসমুদ্রে মিশে গিয়ে ভারত-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে তার হিসাব নেই। ভারতীয় জীবনের এই অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ভাবমূর্তিটি রূপ পেয়েছে কবিগুরুর 'ভারততীর্থ' সঙ্গীতে ঃ

'কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হূণদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।'

পারসিক আক্রমণের প্রভাব

ভারত-ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করলে বৈদেশিক প্রভাবের প্রকৃতি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মৌর্য শিল্পকলা পারস্যের শিল্পকলার প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই মত সকলে গ্রহণ করেন না। তাঁদের মতে মৌর্য শিল্পকলা ছিল আরও উন্নত এবং ভারতীয় শিল্পরীতিরই উজ্জ্বল নিদর্শন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফল

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে ভারতীয় শিল্প, জ্যোতিষ ও সাহিত্য কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় যে গ্রীক প্রভাব পরবর্তীকালে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় তা বহ্লীক দেশীয় গ্রীকদের (ইন্দোগ্রীক) সংস্পর্শের ফল।

গান্ধার শিল্পরীতির বিকাশ

ভারতীয় সভ্যতায় গ্রীক প্রভাবের এক অপূর্ব সুন্দর নিদর্শন হল গান্ধার শিল্প। গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণের ফলে এই শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার অঞ্চলে এই শিল্পরীতির প্রচুর নমুনা পাওয়া গেছে বলে এই নামকরণ হয়েছে। কুষাণ যুগে গান্ধার শিল্পের বিশেষ বিকাশ হয়েছিল। এই শিল্পে বৌদ্ধ বিষয়বস্তুর সঙ্গে গ্রীক আঙ্গিকের সমন্বয় ঘটেছিল বলে এই রীতিকে গ্রীক-বৌদ্ধ (Graeco-Buddhist) শিল্পরীতি নামেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পকলায় গান্ধার শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

ভারতীয় মুদ্রায় বিদেশী প্রভাব

ভারতীয় মুদ্রারচনা ও মুদ্রাঙ্কনেও গ্রীক ও রোমক প্রভাব পড়েছিল। বহ্লীক গ্রীকদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় মুদ্রাশিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেনি। কিন্তু পরবর্তী কালের মুদ্রাগুলিতে উন্নত রুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাসে বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে মুসলমান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত। প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছরের এই ইতিহাসকে, ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ্ 'রাজপুত জাতির ইতিহাস' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর কারণ, এই যুগে আর্যাবর্তের ইতিহাসে রাজপুত রাজ্যগুলির ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। গুর্জর-প্রতিহার, চন্দেল্ল, চৌহান, পরমার, চালুক্য, গাহড়বাল, কালাচুরি প্রভৃতি রাজ্যের শাসকরা জাতিতে রাজপুত ছিলেন। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবল মতভেদ আছে। একটি মত হল তাঁরা বৈদিক যুগের প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের বংশধর। কিন্তু বহু ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতরা শক, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়েছিল। এইসব জাতি ভারতীয় জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্য গ্রহণ করে এবং কালক্রমে এক নতুন ক্ষত্রিয় সমাজের সৃষ্টি হয়। এই নব ক্ষত্রিয়রাই ইতিহাসে রাজপুত জাতি নামে খ্যাতি লাভ করে। রাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য মতও আছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের ফলেই যে রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয় এই মত আধুনিক ঐতিহাসিকেরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তাঁরা বলেন যে 'রাজপুত' বলতে একটি জাতি বোঝায় না, এমন একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বোঝায় যাদের প্রধান বৃত্তি ছিল যুদ্ধ ও দেশশাসন। এই বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃতি পায়। রাজপুতদের উৎপত্তি ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাসে বৈদেশিক প্রভাবের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

সামাজিক পুনর্বিন্যাসে বৈদেশিক আক্রমণের গুরুত্ব

রাজপুত জাতির উৎপত্তি

মৌর্য সাম্রাজ্যের উন্নত শাসন ব্যবস্থা ও সড়ক নির্মাণের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের সুবিধা হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহ্লিকদের (ইন্দোগ্রীক) অবস্থান ভারতীয় বণিকদের পক্ষে ঐসব অঞ্চলে বাণিজ্যের সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করেছিল। ইন্দোগ্রীকরা পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগে উৎসাহ দিতেন। শক, পার্থিয়ান ও কুষাণরা মধ্য-এশিয়াকে ভারতীয় বণিকদের আওতায় এনেছিল এবং এর ফলে চীন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ

মৌর্য যুগে শিল্পকলার উন্নতি হয়েছিল। প্রায় সামগ্রিক ভাবে মৌর্য শিল্প গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে। রাজকীয় সাহায্য, বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং গিল্ড বা সঙ্ঘগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ মৌর্য শিল্পের প্রসার ও উন্নতিতে সাহায্য করেছিল। প্রস্তরশিল্পের প্রচলন এই সময় শুরু হয়। পাটলিপুত্র শহর ও রাজপ্রাসাদের পরিকল্পনা ও নির্মাণকৌশল মেগাস্থিনিসকে অভিভূত

করেছিল। বহু শতাব্দী পরে গুপ্ত যুগে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনও পাটলিপুত্র শহর দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। অশোক ও পরবর্তী মৌর্য রাজাদের নির্মিত গুহা, স্তূপ ও চৈত্যগুলির উৎকর্ষ মৌর্য শিল্পের উন্নতির সাক্ষ্য দেয়। অশোকের ধর্মচক্র, সিংহস্তম্ভ ইত্যাদির মসৃণতা ও সজীবতা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। মৌর্য যুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতি অব্যাহত থাকে। বেসনগরের গুরুড়-স্তম্ভ, ভারহুতের স্তূপ, সাঁচী তোরণ এবং বুদ্ধের জীবনীসংক্রান্ত প্রতিমূর্তিগুলির সূক্ষ্ম কাজ শিল্পচর্চার উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে।

শিল্পের উন্নতি

কুষাণ যুগ ঃ শক ও পহ্লবদের পর কুষাণরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। কুষাণরা ছিল মধ্য-এশিয়ার ইউ-চি জাতির একটি শাখা। আনুমানিক ৫০ খ্রীষ্টাব্দে কুষাণ নায়ক **কুজল কদ্‌ফিস্‌** কাবুল ও কান্দাহার জয় করে কুষাণ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ভারতবর্ষে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না। তাঁর পুত্র বিম কদ্‌ফিস্‌ বা দ্বিতীয় কদফিস্‌ কুষাণ সাম্রাজ্যকে গান্ধার থেকে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে এই ভারত সাম্রাজ্য শাসন না করে তাঁর প্রতিনিধিদের ওপর শাসনের ভার দিয়েছিলেন।

কুষাণ যুগের সূচনা



কণিষ্কের মুদ্রা

কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কণিষ্ক। তাঁর সঙ্গে বিম কদ্‌ফিসের কি সম্পর্ক ছিল বলা যায় না। কণিষ্ক কবে সিংহাসনে বসেছিলেন তা নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য আছে। একটি মত হল, যীশুর মৃত্যুর ৭৮ বছর পরে তিনি রাজা হন ও তখন থেকে শকাব্দ গণনা শুরু হয়। অনেকে কিন্তু এই মত গ্রহণ না করে অন্যান্য সময়ের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। সাম্রাজ্য বিস্তারে কণিষ্ক বিশেষ সাফল্যলাভ করেছিলেন। তিনি কাশ্মীর জয় করেন। চীনা এবং তিব্বতীয় সূত্রে শাকেত (অযোধ্যা), পাটলিপুত্র প্রভৃতি রাজ্যের শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর জয়লাভের কথা জানা যায়। তিনি কাশগড়, খোটান এবং ইয়ারখন্দ্‌ জয় করেন এবং চীনের সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে উল্লেখ আছে যে কণিষ্ক চীনের সম্রাটকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এক চীন রাজকুমারকে নিজের রাজ্যে জামিন স্বরূপ রেখেছিলেন। কণিষ্ক এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই সাম্রাজ্যের সীমানা মধ্য-এশিয়া থেকে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাংলা ও বিহারেও তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে। পুরুষপুর (পেশোয়ার) ছিল কণিষ্কের রাজধানী।

কণিষ্ক

কণিষ্কের সাম্রাজ্য

কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে পুরুষপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের

ওপর এক বিরাট স্তুপ নির্মিত হয়। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুমিত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ কবি ও দার্শনিক তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি পেশোয়ারে যে চৈত্য নির্মাণ করেন, তা পর্যটকদের প্রশংসা অর্জন করে। কণিষ্কের সাহায্যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় বৌদ্ধপণ্ডিত কশ্যপ-মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

কণিষ্কের ধর্মমত ও ধর্মপ্রচার

সংস্কৃত ভাষায় এই সময় বহু বৌদ্ধশাস্ত্র লেখা হয়। তাঁরই রাজত্বকালের শেষে বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে দূত প্রেরণ করেছিলেন। নিজে বৌদ্ধ হলেও কণিষ্ক হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় বিভিন্ন ধর্মের দেব-দেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়। সম্ভবতঃ এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে তিনি এই ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং উদারতার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন।

কণিষ্কের সময়ে শিল্পের বিকাশ হয়। খাঁটি ভারতীয় শিল্পরীতি সারনাথ, মথুরা ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। সাঁচীর তোরণ, ভারহুতের স্তুপ এই যুগের নিদর্শন। কণিষ্কের মস্তক বিহীন অবস্থায় প্রাপ্ত মূর্তি মথুরা শিল্পরীতির নিদর্শন। কণিষ্কের আমলে ভারতীয় শিল্পকলার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

গান্ধার শিল্পকলা

কণিষ্ক ছিলেন প্রাচীন ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। কেবলমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তারেই নয়, সুশাসক এবং সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকরূপেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মকে আন্তর্জাতিক ধর্মে রূপান্তরিত করার মূলে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। এই সময় থেকেই মহাযান মতবাদের প্রাধান্য ও প্রসার প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষপুরে নির্মিত চৈত্য বহু শতাব্দী পরেও চৈনিক এবং মুসলমান পর্যটকদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ এবং বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষক পার্শ্ব ও বসুমিত্র, 'বুদ্ধচরিত' রচয়িতা অশ্বঘোষ এবং বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন তাঁর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের স্রষ্টা চরক তাঁর রাজসভার ভূষণ ছিলেন।

কণিষ্কের কৃতিত্ব

এই সময়ে ভারতের সঙ্গে বৃহত্তর এশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। রোমের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কুষাণ স্বর্ণমুদ্রার উপর রোমান মুদ্রার প্রভাব ছিল। স্থলপথে ভারতের মসলিন ও রেশম বস্ত্র ব্যাকট্রিয়ার মধ্য দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যে পৌঁছাত। এর নাম ছিল রেশম রাস্তা। ভূমধ্যসাগরীয়, লোহিত সাগরীয় এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। তক্ষশিলায় বিভিন্ন অঞ্চলের দ্রব্য এসে জমা হত। এজন্য তক্ষশিলাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ

কুষাণ যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিশেষ উন্নতি ও

পরিবর্তন হয়। বিদেশী হলেও কুষাণরা কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও চিন্তাধারা গ্রহণ করে এদেশের মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কণিষ্কের রাজত্ব-কালে বহু মনীষীর সমাবেশের কথা এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে হীনযান ও মহাযান এই দুই মতবাদের জন্মের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ হয়েছিল এই যুগে।

কুষাণ যুগের সংস্কৃতি

কণিষ্কের মৃত্যুর পর **বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব** প্রভৃতি রাজত্ব করেন। কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমানা ক্রমশঃ ছোট হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কুষাণ অধিকার উত্তর-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

কুষাণদের পতন

সাতবাহন রাজবংশ

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত বারবার আক্রান্ত হলেও দক্ষিণ ভারতে কোন বৈদেশিক আক্রমণ হয়নি। গিরিপথ দিয়ে উত্তর ভারতে প্রবেশ করা খুব দুঃসাধ্য ছিল না। কিন্তু বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণী, নদনদী ও অন্যান্য বাধা থাকায় দক্ষিণ ভারত বিদেশী আক্রমণ হতে দীর্ঘদিন রক্ষা পায়। মৌর্যোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল **কলিঙ্গের চেত বংশ ও অন্ধ্রের সাতবাহন** রাজবংশ। কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন **খারবেল**। খারবেলের সমসাময়িক ছিলেন সাতবাহন রাজ **প্রথম শাতকর্ণি**। তিনি সাতবহন বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন। সাতবাহনরাজ **প্রথম শাতকর্ণির** মৃত্যুর পর সাতবাহন রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে পশ্চিম ভারতের শকরা এই রাজ্যের কিছু অংশ জয় করে নেয়। কিন্তু **গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি** (১০৭-১৩০ খ্রীস্টাব্দ) শকদের পরাজিত করে সাতবাহন-গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ছিলেন সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। নাসিক লিপি বা নাসিক প্রশস্তি থেকে তাঁর সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। তিনি দাক্ষিণাত্যে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর রাজ্য পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি সুশাসক ছিলেন এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করতেন। তাঁর চেষ্টায় দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে শকরা রাজ্য বিস্তারে অসমর্থ হয়। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি উজ্জয়িনীর শক অধিপতি **রুদ্রদামনের** কাছে পরাজিত হন। পরে দুই রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলেও শক-সাতবাহন বিরোধের অবসান হয়নি। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে দুই রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে।

দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

গুপ্ত সাম্রাজ্য

মৌর্য বংশের দুর্বলতার কারণে মগধের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার সুযোগে যে সব বিভিন্ন রাজ্য ও রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কণিষ্কের সময় এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠলেও

সাময়িকভাবে মগধের প্রাধান্য লোপ

তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর (অধুনা পাকিস্তান-অন্তর্গত পেশোয়ার)। দীর্ঘকাল পর গুপ্তযুগে মগধের পুনরভ্যুদয় হয় ও মগধ তার প্রাচীন গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পায়।

গুপ্তযুগে মগধের পুনরভ্যুদয়

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **শ্রীগুপ্ত**। প্রথমে তিনি ও পরে তাঁর পুত্র মগধের মধ্যে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। পরবর্তী রাজা **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত** (৩২০-৩৩০ খ্রীঃ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি বৈশালীর লিচ্ছবি বংশের রাজকুমারীকে বিবাহ করে গুপ্তরাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর রাজ্যসীমা মগধ থেকে প্রয়াগ ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সিংহাসন লাভের সময় থেকে **গুপ্ত সম্বতের** প্রচলন হয়।



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

সমুদ্রগুপ্ত

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর গুপ্ত সিংহাসনে বসেন তাঁর যোগ্যতম পুত্র **সমুদ্রগুপ্ত**। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন (৩৩০-৩৮০ বা মতান্তরে ৩৭৬ খ্রীঃ)। নিজের বাহুবলে সমুদ্রগুপ্ত গাঙ্গেয় উপত্যকার একটি গুপ্ত রাজ্যকে এক সর্বভারতীয় বিস্তৃত সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সভাকবি হরিষেণ রচিত প্রশস্তিতে (এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি) সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা আছে। এলাহাবাদের একটি স্তম্ভের গায়ে এই শিলালিপিটি আছে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য জয় করে তিনি গঙ্গা, যমুনা ও চম্বল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে নিজের অধিকার স্থাপন করেন। দক্ষিণ ভারতেরও বহু রাজাকে বিশেষ করে পল্লব রাজাদের তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তিনি এই সব রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত না করে আনুগত্যের শপথের বিনিময়ে বিজিত রাজাদের প্রত্যর্পণ করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে পাটলিপুত্র থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে সুশাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে কামরূপ

রাজ্যবিস্তার ও সামরিক কৃতিত্ব


গুপ্ত সাম্রাজ্য
গন্ধার
কাবুল
কাশ্মীর
তক্ষশীলা
কুষাণ রাজ্য
মদ্রক
যৌধেয়
হি মা ল য় প র্ব ত
দিল্লী
মিরাট
নেপাল
কপিলবস্তু
কামরূপ
আশ্রিত রাজ্য
মথুরা
বৈরাট
অযোধ্যা
কোশল
বৈশালী
পাটলিপুত্র
ব্রহ্মপুত্র
যমুনা
চম্বল
প্রয়াগ
কাশী
সাঁচী
শোণ
বুদ্ধগয়া
সমতট
বঙ্গ
শকরাজ্য
মালব
উজ্জয়িনী
নর্মদা
মহাকোশল
তাম্রলিপ্ত
সৌরাষ্ট্র
গিরনার
তাপ্তী
ওড্র
মহানদী
সুরাট
নাসিক
গোদাবরী
অন্ধ্র
অমরাবতী
বেঙ্গী
কৃষ্ণা
সিদ্ধপুর
কাঞ্চী
পল্লব
কাবেরী
চোল
সিংহল
অশোকের শিলালিপি
মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমানা
গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা
সমুদ্রগুপ্তের অভিযানপথ

(আসাম), সমতট (পূর্ব-দক্ষিণ বাংলা), উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে নেপাল, পাঞ্জাব, রাজপুতনা প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কুষাণ, শক ও খরপরিক রাজারা সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। দিগ্বিজয় শেষ করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ সামরিক শক্তি ও সাফল্যের জন্য ঐতিহাসিক স্মিথ সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়েছেন। সমুদ্রগুপ্ত তাঁর শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উপর জোর দেন।

সমুদ্রগুপ্তের বহুমুখী প্রতিভা

সমুদ্রগুপ্তের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতবিদ্যা-পারদর্শী। গুপ্ত যুগের কিছু মুদ্রায় সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূর্তি অঙ্কিত আছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তিনি অন্য ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাননি।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** (৩৭৬।৩৮০—৪১৫ খ্রীঃ) ছিলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাঁর কাছে মালব ও সৌরাষ্ট্রের শক রাজাদের পরাজয়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শক এবং ক্ষত্রপদের পরাভূত করে তিনি তাঁর রাজ্যসীমা পশ্চিমে আরব সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এর ফলে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের নীতি অনুসরণ করে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি তাঁর শক্তি ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি নিজে নাগবংশীয়া রাজকন্যা কুবেরনাগকে বিবাহ করেন। কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে বিদর্ভ অঞ্চলের শক্তিশালী বাকাটক বংশীয় রাজার বিবাহ দিয়েছিলেন।



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

দিল্লীর কাছে মেহেরৌলি নামে এক জায়গায় একটি লৌহস্তম্ভে চন্দ্ররাজ নামে এক রাজার দিগ্বিজয়ের উল্লেখ আছে। এই চন্দ্ররাজ ও গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন মনে করে কোন কোন ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে তিনি বঙ্গদেশ ও উত্তর-পশ্চিমের বহ্লীক জাতির অধিকৃত অঞ্চল গুলি সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শকদের পরাজিত করে 'শকারী' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। পাটলিপুত্র তাঁর রাজধানী হলেও তাঁকে উজ্জয়িনীরাজ রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এই সব কারণে অনেকে মনে করেন যে কিংবদন্তীর রাজা 'বিক্রমাদিত্য' ও **গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত একই** ব্যক্তি। তাঁর রাজসভায় কালিদাস, মিহির, বররুচি, ধন্বন্তরী, বেতালভট্ট প্রমুখ নবরত্নের সমাবেশ হয়েছিল। কিন্তু এই অনুমান ঠিক কিনা সন্দেহ আছে, কেননা নবরত্ন সভার নয়জন রত্নই একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মহাকবি কালিদাস খুব সম্ভব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি বীরসেন ছিলেন তাঁর মন্ত্রী ও সভাসদ্। তাঁরই রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারত পর্যটনে এসেছিলেন। তাঁর লেখা বিবরণ থেকে গুপ্তযুগে মগধ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, গৌরব ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। (পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই কি কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য ?

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র **প্রথম কুমারগুপ্ত** (৪১৫-৪৫৫ খ্রীঃ) ও পৌত্র **স্কন্দগুপ্ত** (৪৫৫-৪৬৭ খ্রীঃ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব ও সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যের নর্মদা অঞ্চলের পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যে বিপদ দেখা দেয়। স্কন্দগুপ্ত এই সংকট থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। স্কন্দগুপ্ত শুধু পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণ প্রতিহত করেননি, তিনি হূণদের আক্রমণও প্রতিহত করেন। স্কন্দগুপ্তের সময় হূণরা এক দুর্ধর্ষ শক্তি ছিল। হূণদের পরাজিত করে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা স্কন্দগুপ্তের একটি স্মরণীয় কীর্তি।

স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তাঁর রাজত্বকালেই হূণ আক্রমণ শুরু হয়েছিল। পরবর্তী দুর্বল গুপ্ত রাজাদের পক্ষে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। বৈদেশিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের মধ্যেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রাধান্য ও সীমানা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। মালব, বঙ্গদেশ, সৌরাষ্ট্র ও কনৌজ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। এইভাবে ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে মগধেও গুপ্ত অধিকার লুপ্ত হয় ও মগধ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও গৌরবের অবসান হয়।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বৈদেশিক আক্রমণ, কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও কর্মচারীদের শক্তিবৃদ্ধি, রাজপরিবারে আত্মকলহ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। পুষ্যমিত্র জাতির বিদ্রোহ এবং হূণদের আক্রমণ সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর আর

কোনও শক্তিশালী সুযোগ্য সম্রাট গুপ্ত সিংহাসনে বসেননি। এর ফলে একদিকে যেমন হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি, অন্য দিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি রোধ করা যায়নি। মান্দাসোরে যশোধর্মণ, উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় মৌখরী বংশ এবং পূর্ব ভারতে গৌড় রাজ্যের উত্থান গুপ্ত সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। রাজবংশের দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে গুপ্তবংশে আত্মকলহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য প্রমুখ পরবর্তী গুপ্তরাজাদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ, রাজ্যের সামরিক শক্তি ও বীর্যের দৈন্য প্রকাশ করে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কেন্দ্রীয় শক্তিকে উপেক্ষা করতে উৎসাহিত করেছিল। এই সময়ে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি ঘটে এবং অর্থ নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। অনেকের মতে এই অর্থনৈতিক অবক্ষয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের একটি অন্যতম কারণ।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যুগ হল গুপ্ত যুগ। রাষ্ট্র-শাসন, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই যুগে অভূতপূর্ব উন্নতি ও উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি প্রায় পনের বছর ভারতবর্ষে ছিলেন। রাজধানী পাটলিপুত্রের সমৃদ্ধি এবং নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখে ফা-হিয়েন মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শিক্ষালাভের জন্য পাটলিপুত্রে আসত। এজন্য পাটলিপুত্রে বৌদ্ধ বিহার ছিল। তিনি গুপ্ত-শাসনপদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করেছেন। রাজ-কর্মচারীরা যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্য পালন করতেন। দেশে চুরি-ডাকাতির উপদ্রব ছিল না। লোকে নির্ভয়ে ও শান্তিতে জীবনযাপন করত। গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অনেক কমে গিয়েছিল। শিব, কার্তিক, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, পার্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। যাগযজ্ঞের পরিবর্তে পূজায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। জন-সাধারণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। খাজনার হার ও জিনিসপত্রের দামও ছিল কম। তাম্রলিপ্ত (তমলুক) সে যুগের একটি বিখ্যাত বন্দর ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সামাজিক জীবনে চণ্ডালেরা অস্পৃশ্য ছিল। তারা শহরের বাইরে থাকত। চণ্ডাল ও নিম্নজাতির লোকেরা ছাড়া অন্যেরা জীবহত্যা করত না।

গুপ্তযুগের জীবনযাত্রা

ফা-হিয়েনের বিবরণ

রাজতন্ত্র ও রাজাদর্শের লক্ষ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। রাজা বিশেষ শক্তিশালী ও দেবতার মত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনিই ছিলেন রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের ধারক ও বাহক। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। শাস্ত্রীয় নির্দেশ, দেশাচার ও সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা তিনি

রাষ্ট্রীয় আদর্শ

নিয়ন্ত্রিত হতেন। জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছিল রাষ্ট্রের কর্তব্য।

সামাজিক অবস্থা

রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অমাত্য বা মন্ত্রী, রাজপুরুষবর্গ ও সামন্তদের অনেক ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক জীবনেও তাঁদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল। বহু বৈদেশিক জাতির আগমনের ফলে সাম্রাজ্যের চরিত্র ও শ্রেণীবিন্যাসের পরিবর্তন হয়। জীবিকা-নির্ভর উপবর্ণের সৃষ্টি হয়। জাতিভেদপ্রথা ও সামাজিক বিধিনিষেধ কঠোর হয়। সামাজিক ভিত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। নারীর সম্মান ও অধিকার কমে যায়। তখন পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চশ্রেণীজাত মেয়েরা বিদ্যার্জনের সুযোগ পেলেও অন্যান্য মেয়েরা এই সুযোগে বঞ্চিত ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য

গুপ্ত যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল। এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে ভারত থেকে রেশম রপ্তানির ক্ষেত্রে রোমের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। তাম্রলিপ্ত ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল ভৃগুকচ্ছ (ব্রোচ)। ভারতীয়েরা সেই সময় জাহাজে করে সমুদ্রপারে অনেক জায়গায় যেত।

গুপ্ত যুগের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

সাংস্কৃতিক উন্নতির অনুকূল পরিবেশ

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি ছিল। এই কারণে গুপ্তবংশের পক্ষে শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা সহজ হয়েছিল। সামুদ্রিক ও স্থলপথের বাণিজ্যের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এর ফলে কেবলমাত্র যে আর্থিক সমৃদ্ধি হয়েছিল তা নয়, ভারতীয়দের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম ও চিন্তাধারার বিকাশ দেশের রাজশক্তির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। কুষাণ যুগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলে ছিল কণিষ্কের বিরাট অবদান। তেমনি গুপ্ত যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রধান কারণ ছিল সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মত, গুপ্ত সম্রাটদের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহ ও অনুরাগ। অন্য দিকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। গুপ্ত যুগের সুশাসন-ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা সৃজনশীল কর্ম ও চিন্তাধারার পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। এই সব বিভিন্ন কারণের সমাবেশের ফলেই গুপ্ত যুগে ভারতীয় জীবন ও মননের সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়েছিল।

গুপ্ত যুগকে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যায়। মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। কালিদাসের 'মেঘদূত', 'বিক্রমোর্বশী', 'মালবিকাগ্নি-

মিত্রম্', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য শুধু ভারতীয় সাহিত্যের নয় বিশ্বের যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যের সম্পদ। গুপ্ত যুগের অন্যান্য সাহিত্যকীর্তির মধ্যে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' ও 'দেবী চন্দ্রগুপ্ত' বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', কবি ভট্টির 'ভট্টিকাব্য' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দুধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয়েছিল। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের সর্বশেষ সঙ্কলন ও সম্পাদন গুপ্ত যুগে সম্পূর্ণ হয়েছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসেও গুপ্ত যুগ এক গৌরবময় অধ্যায়। বিশ্ব-বিখ্যাত অজন্তার গুহা ও গুহাচিত্রাবলীর (হায়দ্রাবাদ রাজ্যে) অনেকগুলি গুপ্ত রাজাদের আমলে নির্মিত ও অঙ্কিত হয়েছিল। বেশীর ভাগ চিত্রই বোধিসত্ত্ব ও গৌতম বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে অঙ্কিত। ছবিগুলির লাবণ্য, বর্ণসজ্জা ও সজীবতা দর্শকদের অভিভূত করে। দেওগড়ের (ঝাঁসি) মন্দির ও বুদ্ধমূর্তি, ভিতরগাঁও (কানপুর জেলা) সারনাথের কয়েকটি মন্দির গুপ্ত যুগের স্থাপত্য ও কীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চন্দ্রের লৌহস্তম্ভ ও মথুরায় বুদ্ধের ব্রোঞ্জ মূর্তি ঐ যুগের ধাতুশিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণ।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা

গুপ্ত যুগে ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এই সব বিষয়ে গর্গ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ধন্বন্তরীর মত পণ্ডিতদের গ্রন্থ এই সময়েই রচিত হয়। গুপ্ত সম্রাটদের প্রায় আড়াইশো বছরব্যাপী রাজত্বকালে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনীষার যেরূপ বিকাশ হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। প্রাচীন গ্রীসে পেরিক্লিসের সময় এবং প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাট অগস্টাসের শাসনকালে অনুরূপ সার্বিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। এই কারণে ঐতিহাসিকেরা গ্রীস ও রোমের ঐ গৌরবময় যুগের সঙ্গে গুপ্ত শাসনের স্বর্ণযুগের তুলনা করে থাকেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

গ্রীস ও রোমের শ্রেষ্ঠ যুগের সঙ্গে তুলনা

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী যুগে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার প্রসার বন্ধ হয়ে যায়নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে যে সব রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছিল, তাদের মধ্যে মৌখরি বা পুষ্যভূতি বংশ উল্লেখযোগ্য। পুষ্যভূতি বংশের ক্ষমতাশালী রাজা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীঃ সিংহাসনে বসেন। হর্ষের রাজত্ব সুশাসিত ছিল বটে, কিন্তু মৌর্য ও গুপ্ত যুগের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে মনে হয় তখন রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার কিছুটা অবনতি হয়েছিল। হিউয়েন-সাঙ নিজেই দুবার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। দণ্ডবিধিও তখন ছিল খুব কঠোর। নতুন রাজধানী কনৌজ তখন জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য বড় শহরের মধ্যে প্রয়াগ, নালন্দা, মথুরা, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশের জনসাধারণের নৈতিক মান উন্নত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের সুদিন আর ছিল না।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যের অবস্থা

গুপ্ত যুগের জীবন ও সংস্কৃতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ঃ

মৌর্যরাজাদের মত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ধ্যান-ধারণা গুপ্ত রাজারাও পোষণ করতেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল। রাজ্যের সর্বত্র শাসন ব্যবস্থা সুসংহত ছিল। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। সরকারী নীতি নির্ধারণ, বিচার ব্যবস্থা ও দেশকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা রাজার অন্যতম কর্তব্য ছিল। জনকল্যাণ-মূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছিল রাষ্ট্রের কর্তব্য। গুপ্ত রাজাদের আমলে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত। কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ কম ছিল। এমনকি নগর শাসন ব্যবস্থায় পৌর প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন মতাবলম্বী স্থানীয় প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করতেন। বেশীর ভাগ গুপ্ত রাজারা কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীত শিল্পী, কারু ও ভাস্কর্য শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এর জন্য তাঁদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করার মত অর্থসংস্থান ছিল। গুপ্তযুগে বিজ্ঞানের চর্চার বিকাশ হয়েছিল, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রে। আর্যভট্ট ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও বরাহমিহির শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ রূপে পরিগণিত হতেন। সমসাময়িক সাহিত্যে নাবিকদের অভিজ্ঞতার বিবরণ ও ব্যবসায়ীদের একতার কথা জানা যায়। সেই সময় প্রচুর স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে গুপ্ত যুগে সুশাসন ব্যবস্থা ও সর্বত্র শান্তি বিরাজ করায় প্রভূত পরিমাণে অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি হয়েছিল। কৃষি যদিও রাজস্ব আদায়ের মূল উৎস ছিল, তবে বাণিজ্য শুল্ক থেকেও প্রচুর আয় হত।

রাজন্যবর্গ ও বণিক শ্রেণীর দানে মঠ, ধর্মীয় সংস্থাসকল ও পুরোহিত শ্রেণী সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। গুপ্ত রাজণ্যবর্গ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা ছিল।

গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন হয় ও বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সময়ে ভারতের এক বৃহৎ অংশ গুপ্ত রাজাদের অধীনে একই শাসন ব্যবস্থায় একত্রীভূত হওয়ায় রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির অনুকুল পরিবেশ সৃষ্ট হয়।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের আদান প্রদান ও হিন্দুধর্মের নবজাগরণের ফলে যে চিন্তা-ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছিল, তার ফলে গুপ্ত যুগের সংস্কৃতির উৎসমূল থেকে উদ্ভূত ঐতিহ্যমণ্ডিত আদর্শগুলির সার্বিক বিকাশ বিভিন্ন ধারায় প্রসারিত হয়েছিল। এই সময়ে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রূপান্তর হয়েছিল নতুন উদার হিন্দুধর্মের আদর্শে।

এযুগে শিল্পকলার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। অজন্তার গুহামন্দিরগুলির শিল্প সৌকর্য গুপ্ত-যুগের শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন। এই যুগে শিল্পে ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। মেহেরৌলির নিকট চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সকল দিকে গুপ্ত যুগের সার্বিক উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই যুগকে গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক গুপ্ত শাসনকে ভারতের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রভুত্ব স্থাপনের সংগ্রাম

উত্তর ভারত

হূণ আক্রমণ ঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের কয়েক শতাব্দী পর উত্তর ভারতে আর একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন মগধের গুপ্ত রাজবংশ। গুপ্ত যুগের গৌরবময় কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৫—৪৫৫ খ্রীঃ) ও পৌত্র স্কন্দগুপ্তের (৪৫৫—৪৬৭ খ্রীঃ) রাজত্বকাল থেকেই মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ বর্বর হূণ জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত হূণদের সাময়িকভাবে প্রতিরোধ করলেও পরবর্তী দুর্বল গুপ্ত বংশের রাজারা সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেননি। হূণরা তোরমান ও তাঁর পুত্র মিহিরকুল বা মিহিরগুলের নেতৃত্বে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মালব ও মধ্যভারতের কিছু অংশ জয় করে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। পরবর্তী দুর্বল গুপ্ত রাজাদের পক্ষে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। বৈদেশিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও অরাজকতা দেখা দেয়। এই অবস্থায় বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তিগুলি প্রভুত্ব বিস্তার করার চেষ্টা করে। মালব, বঙ্গদেশ, সৌরাষ্ট্র ও কনৌজ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। অত্যাচারী হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করে (আঃ ৫৩০ খ্রীস্টাব্দে) গৌরব ও খ্যাতি অর্জন করেন মালবের রাজা যশোধর্মণ। তাঁকে এই মহান কাজে সাহায্য করেছিলেন মগধের গুপ্তবংশীয় রাজা বালাদিত্য। হূণদের বিরুদ্ধে তাঁর অসামান্য সাফল্যের জন্য কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে যশোধর্মণই কিংবদন্তীর রাজা 'বিক্রমাদিত্য'। কিন্তু এই মতের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গুপ্তযুগে হূণ-আক্রমণ

মালব রাজ যশোধর্মণের কাছে হূণদের পরাজয়

যশোধর্মণ

গুপ্তযুগের শেষ দিকে হূণ আক্রমণ ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। কিন্তু হূণ আক্রমণের সামাজিক প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই সময় দেশের চারদিকে যে অরাজকতা দেখা দেয়, তার বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দু ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন ও উপকারিতার কথা অনেকে অনুভব করে। কিন্তু এর ফলে

সমাজে উচ্চজাতি বা বর্ণের প্রাধান্য আরও বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে নিম্নজাতিভুক্ত মানুষের মর্যাদা আরও কমে যায়। দেশ শাসন, রাজনীতি ও সংস্কৃতি-চর্চা ইত্যাদি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্বদেশ এমনকি স্বাধীনতা সম্বন্ধেও অনীহা দেখা দেয়। এই ক্রমবর্ধমান বিভেদ ও বৈষম্য ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল।

হূণ আক্রমণের সামাজিক কুফল

গৌড়রাজ্যের উত্থান

গৌড় বলতে যে কোন্ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বোঝায় তা নিয়ে মতভেদ আছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজত্বে গৌড়ের সীমানার পরিবর্তন হয়েছিল। পূর্বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভূখণ্ড মিলে বর্তমান যা আয়তন প্রাচীন বাংলার আয়তন তার থেকেও কিছু বেশী ছিল। এই অঞ্চলে পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত গৌড় প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদ ছিল। সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও জনপদগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে গৌড়ের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বঙ্গ বা বাংলাদেশের* বিভিন্ন অংশ মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

গৌড়ের অবস্থান

প্রাচীন জনপদ

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশ নানা ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হয়। ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে এই সব রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে শক্তি ও খ্যাতি অর্জন করে গৌড় রাজ্য। গৌড়ের উত্থানের মূলে ছিলেন শশাঙ্ক। গুপ্তদের পতনের পর মৌখরি ও পুষ্যভূতিদের বিরুদ্ধে মালবের সঙ্গে সন্ধি করে উত্তর ভারতে বঙ্গদেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন শশাঙ্ক। নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে তিনি স্বাধীন গৌড় রাজ্য স্থাপন করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। পশ্চিমে বারাণসী থেকে পূর্ব উপকূলের গঞ্জাম (উড়িষ্যা) পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কনৌজের মৌখরী বংশের রাজা গ্রহবর্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন এবং তাঁর রাণী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। শশাঙ্কের সহযোগী মিত্র ছিলেন মালবরাজ দেবগুপ্ত। এই দুসংবাদ পেয়ে রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা থানেশ্বররাজ রাজবর্ধন সসৈন্যে কনৌজ যাত্রা করেন। কিন্তু রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। ভগ্নী রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মণের মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসন তখন শূন্য ছিল। হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে শাস্তি দান ও রাজশ্রীকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কনৌজে উপস্থিত

গৌড় রাজ্যের উত্থান ও শশাঙ্ক

কনৌজ আক্রমণ

* বাংলাদেশ বলতে ইতিহাসে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ বোঝায়।

হন এবং বন্দীদশা থেকে তিনি রাজশ্রীকে মুক্ত করেন। এই সময়ে অমাত্যদের অনুরোধে হর্ষবর্ধন কনৌজের রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের যুদ্ধ

অগ্রজ রাজ্যবর্ধন ও ভগ্নীপতি গ্রহবর্মণের হত্যাকারী গৌড়রাজ শশাঙ্ককে পরাজিত করে শাস্তিদান করা ছিল হর্ষবর্ধনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। মালব ও মগধের রাজা মাধবগুপ্তের সঙ্গেও তাঁর মৈত্রীবন্ধন হয়। কিন্তু শশাঙ্কের জীবিতকালে হর্ষ গৌড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের ক্ষমতা হ্রাস করতে বা তাঁকে শাস্তি দিতে পারেন নি। অবশ্য কনৌজের মৌখরি বংশের রাজাকে পরাজিত করলেও, শশাঙ্ক কনৌজে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। হর্ষ থানেশ্বর ও কনৌজ দুটি রাজ্যেরই অধীশ্বর হয়েছিলেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের এবং হিউয়েন্-সাঙের বিবরণে শশাঙ্ক সম্বন্ধে অনেক বিরূপ মন্তব্য আছে এবং তাঁর শক্তিকে অনেক লঘুরূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাণভট্ট ও হিউয়েন-সাঙ দুজনেই হর্ষবর্ধনের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের বিবরণ কিছুটা পক্ষপাতদুষ্ট ও অতিরঞ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। শশাঙ্ক শৈব-ধর্মাবলম্বী এবং ঐ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হিউয়েন্-সাঙ যে বৌদ্ধ উৎপীড়নের অভিযোগ করেছিলেন তা সকলে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন না।

হর্ষ ও শশাঙ্কের বিরোধ

শশাঙ্কের কালনির্ণয়

শশাঙ্কের রাজত্বের সঠিক কাল নির্ণয় করা যায় না। অনুমান করা হয় যে হর্ষের রাজত্বকালের সূচনা থেকে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শশাঙ্কের ক্ষমতা হ্রাস পায় নি। ৬৩৭ থেকে ৬৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

কৃতিত্ব

গৌড়রাজ্যের উত্থানে শশাঙ্কের বিশেষ অবদান ছিল। তাঁর রাজত্বকালেই গৌড় ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার শশাঙ্ককে বাংলাদেশের রাজাদের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতিরূপে বর্ণনা করেছেন।

ভাস্করবর্মণ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য লুপ্ত হয় এবং বাংলাদেশে ভীষণ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন এবং হর্ষবর্ধনও মগধ অধিকার করে মগধরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

কনৌজ সাম্রাজ্যের উত্থান

হর্ষবর্ধনের বিজয়

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে যে সব রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল মৌখরি বা পুষ্যভূতি বংশ। মৌখরি বংশের রাজধানী

ছিল **কনৌজ** বা **কান্যকুব্জ**। কনৌজের মৌখরি বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন **ঈশানবর্মণ** (আঃ ৫৫৪ খৃস্টাব্দ)। এই বংশের শেষ রাজা গ্রহবর্মণ পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন **থানেশ্বর** রাজ্যের পুষ্যভূতি বংশের রাজা **প্রভাকরবর্ধনের** কন্যা **রাজ্যশ্রীকে** বিবাহ করেছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধনের রাজ্যলাভের অল্পকালের মধ্যেই গৌড়রাজ **শশাঙ্ক** মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহযোগিতায় মৌখরি রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মণ পরাজিত ও নিহত হন এবং রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। এই দারুণ দুঃসংবাদ পেয়ে রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে কনৌজ যাত্রা করেন। কিন্তু দেবগুপ্তকে পরাজিত করলেও রাজ্যবর্ধন নিজেও শশাঙ্কর হাতে নিহত হন।

কনৌজের মৌখরি বংশ ও থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ

গৌড়রাজ শশাঙ্কর মৌখরি রাজ্য আক্রমণ



হর্ষবর্ধন

রাজ্যবর্ধনের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা **হর্ষবর্ধন** ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। এই সময় থেকে **হর্ষাব্দ** গণনা করা হয়। ভগ্নী রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মণের মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসনও তখন শূন্য ছিল। হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে শাস্তিদান ও রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কনৌজে উপস্থিত হন। বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে রাজ্যশ্রী যখন অগ্নিতে জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময়ে হর্ষবর্ধন ভগ্নীর সন্ধান পান ও তাঁকে আত্মাহুতি থেকে নিবৃত্ত করেন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ও হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ

সকলের অনুরোধে হর্ষবর্ধন কনৌজের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। প্রথমে শুধুমাত্র 'রাজপুত্র' উপাধি গ্রহণ করলেও অল্পকাল পরে তিনি 'মহা-রাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর আর এক নাম বা উপাধি ছিল শিলাদিত্য। কনৌজের মৌখরি রাজ্য ও থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজ্য যুক্ত হয়ে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই নতুন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনৌজ আর্যাবর্তের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুর মর্যাদা লাভ করে।

কনৌজ ও থানেশ্বর রাজ্যের মিলন

অগ্রজ রাজ্যবর্ধন ও ভগ্নিপতি গ্রহবর্মণের হত্যাকারী গৌড়রাজ শশাঙ্ককে পরাজিত করে শাস্তিদান করা ছিল হর্ষবর্ধনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। মালব ও মগধের রাজা মাধবগুপ্তের সঙ্গেও তাঁর মৈত্রীবন্ধন হয়। কিন্তু শশাঙ্কের জীবিতকালে হর্ষ গৌড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিত' এবং চৌনিক পর্যটক হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হলো তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাসের প্রধান উপাদান। কিন্তু এঁরা উভয়েই ছিলেন হর্ষের অনুগ্রহভাজন। সুতরাং এঁদের বিবরণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। এই দুটি গ্রন্থে অতিশয়োক্তি ও অস্পষ্টতা আছে।

হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের যুদ্ধ

হর্ষ দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাতাপির চালুক্য বংশের রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হওয়ায় হর্ষের এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারেনি। বর্তমান গঞ্জাম জেলার অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন কোঙ্গোদ রাজ্য হর্ষ জয় করেছিলেন। পশ্চিম ভারতের বলভী রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় ধ্রুবসেন বা ধ্রুবভট্ট হর্ষের প্রাধান্য স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। একটি শিলালিপিতে হর্ষকে 'উত্তরাপথনাথ' অর্থাৎ সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অনেকে এটি অত্যুক্তি মনে করেন।

হর্ষের রাজ্যবিস্তার

রাজ্যসীমা

হর্ষের সামরিক সাফল্য ও তাঁর রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী তথ্য থাকায় কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তবে নেপাল, সিন্ধু, কাশ্মীর, পাঞ্জাবের কিছু অংশ, রাজপুতানা ও কামরূপ ছাড়া উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে হর্ষবর্ধনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বিষয়ে সাধারণভাবে মতৈক্য আছে।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীনদেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিখ্যাত চৌনিক পর্যটক হিউয়েন-সাঙ বা য়ুয়ান-চেয়াঙ হর্ষের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন (৬৩৫-৬৪৩ খ্রীঃ)। হর্ষ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে হর্ষের রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য আছে। হিউয়েন-সাঙ

ছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক। ভারত সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থের নাম "সি-ইউ-কি"। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় উত্তর ভারতে কনৌজ ছিল সমৃদ্ধিশালী নগরী। শ্রাবস্তী, পাটলিপুত্র, কপিলাবস্তু, ইত্যাদি ছিল পতনোন্মুখ। বারাণসী ছিল হিন্দুদের তীর্থস্থান। তাঁর গ্রন্থ থেকে পল্লব ও চালুক্য রাজবংশের সম্পর্কেও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

হিউয়েন-সাঙ এর বিবরণ

ভারতে প্রায় ৫০০০ বৌদ্ধ মঠ ছিল। হিউয়েন-সাঙের সম্মানে হর্ষ কনৌজে বৌদ্ধ সম্মেলন ডাকেন। প্রয়াগে হর্ষ মহামোক্ষ পরিষদ নামে প্রতি পাঁচ বছরে একটি করে মেলা করতেন। পশ্চিমবাংলার 'তাম্রলিপ্ত' বন্দর ছিল সর্বাপেক্ষা বড় বন্দর। এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

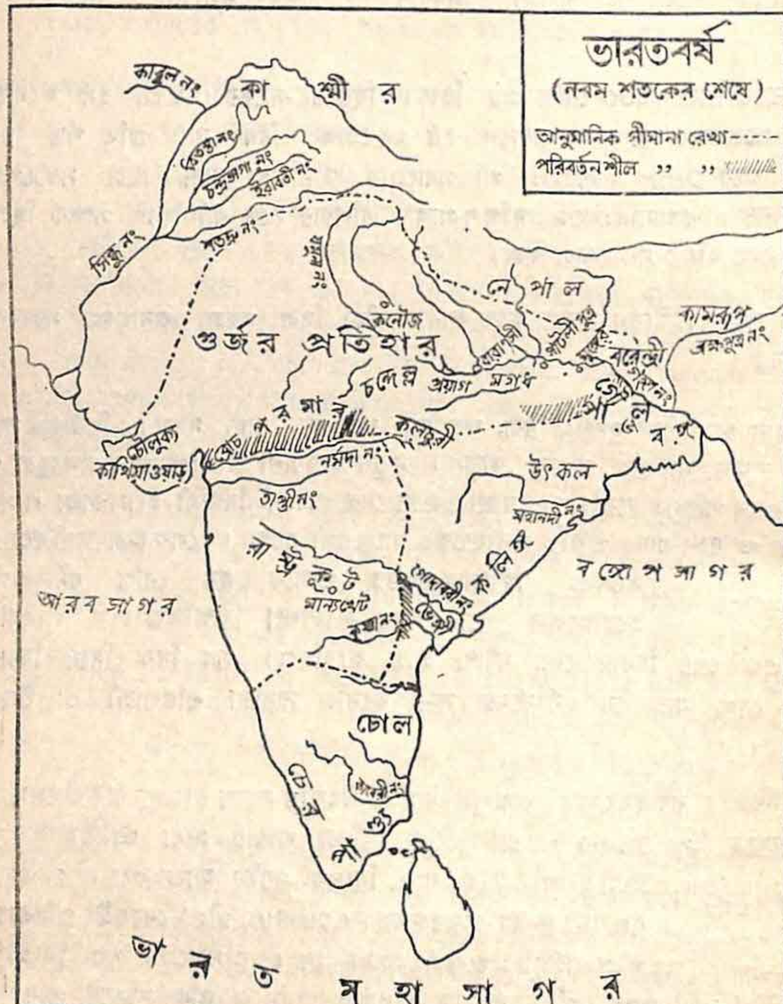
সে সময়ে হিউয়েন সাঙের মতে ভারতবাসীরা ছিল সরল, অনাড়ম্বর, সত্যবাদী ও ধার্মিক।

প্রধান খাদ্য ছিল দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফলমূল, যব, গম, মাছ, মাংস। হিউয়েন-সাঙ হর্ষের শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। নতুন রাজধানী কনৌজ তখন জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়েছিল। রাজা প্রজারঞ্জনের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাজ্য শাসন করতেন ও দান ধ্যান প্রভৃতি জনহিতকর কাজে ব্রতী হতেন। শৈব মতাবলম্বী হলেও সম্ভবতঃ হিউয়েন-সাঙের প্রভাবে হর্ষ বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হয়েছিলেন। তাঁর সময় **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়** পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনের মর্যাদা লাভ করেছিল। সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে হর্ষবর্ধনের সময় কনৌজ সাম্রাজ্য শক্তিশালী ও উন্নত হয়েছিল।

হর্ষের কৃতিত্ব

প্রতিহার রাজবংশঃ রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৪৪-৪৫)। রাজপুতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে **প্রতিহার** বা **গুর্জর-প্রতিহার** বংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। প্রতিহার **বৎসরাজ**-এর রাজত্বকাল (৭৩৮-৭৮৭ খ্রীঃ) থেকেই প্রতিহার-পাল-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় **নাগভট** (৮১৫-৮৩৩) খ্রীঃ) কনৌজ অধিকার করেন ও তাঁর সময়েই প্রতিহার রাজ্যের সীমানা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি পালবংশের রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করলেও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে **মিহিরভোজ** (৮৩৬-৮৮৫ খ্রীঃ) ও **প্রথম মহেন্দ্রপাল** (৮৮৫-৯১০ খ্রীঃ) প্রতিহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন।

কনৌজের গুর্জর-প্রতিহার বংশ



গুর্জর প্রতিহার পাল ও রাষ্ট্রকূট
সাম্রাজ্যের আনুমানিক সীমানা

প্রতিহার বংশের পতন ও বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের জন্ম

এর পর প্রতিহার রাজ্যের পতন শুরু হয়। রাষ্ট্রকূটরাজদের আক্রমণে কনৌজ সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়। এই সুযোগে ক্রমে ক্রমে জেজাকভুক্তিতে (মধ্য ভারতের বুন্দেলখণ্ড) **চন্দেল্ল**, মালবে **পরমার**, জব্বলপুর অঞ্চলে **কলচুরি**, গুজরাটে **চৌলুক্য**, আজমীরে **চৌহান**, এবং উত্তর প্রদেশে **গাহড়বাল** প্রভৃতি স্বাধীন রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব হয়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিহারদের কৃতিত্ব

প্রতিহার বংশের সাম্রাজ্য ছিল প্রাচীন ভারতের শেষ বৃহৎ হিন্দু সাম্রাজ্য। সুশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ধর্ম এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও প্রতিহাররা খ্যাতিলাভ করেছিলেন। যতদিন প্রতিহার সাম্রাজ্য শক্তিশালী ও অটুট ছিল ততদিন সিন্ধুদেশের আরবরা ভারত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি।

মাৎস্যন্যায় ঃ গোপালকে রাজা নির্বাচন ও পাল রাজাদের সূচনা

পাল বংশ ঃ আনুমানিক ৬৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। প্রায় একশো বছর ধরে সবলের অত্যাচার, অনাচার ও উৎপীড়নে বাংলাদেশের মানুষের জীবন অসহ্য হয়ে উঠলে দেশের নেতারা ও সাধারণ মানুষ '**মাৎস্যন্যায়**' বা অরাজকতা, হানাহানির অবসানের উদ্দেশ্যে **গোপাল** নামে এক বীর, গুণবান, যোগ্য ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এইভাবে রাজা নির্বাচনের দৃষ্টান্ত বিরল।

গোপাল (৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ)

গোপাল (আঃ ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ) রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম হয় **পাল বংশ**।

কনৌজ অধিকারের জন্য প্রতিহার-পাল-রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা

হর্ষের পরবর্তী যুগে কনৌজ সাম্রাজ্যের গৌরব ম্লান হলেও কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমেনি। আর্যাবর্তের রাজনৈতিক জীবনে কনৌজ তখনও ছিল কেন্দ্রবিন্দু। অষ্টম শতকে কনৌজ অধিকার ছিল রাজনৈতিক প্রাধান্যের প্রমাণ-স্বরূপ। কনৌজ অধিকার প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এক সময় **গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট এবং পাল রাজাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল।** কনৌজের জন্য এই **ত্রি-শক্তির সংগ্রাম** (Tripartite struggle) ঐ যুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

গোপালের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং নালন্দাতে একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তিনি স্থাপন করেছিলেন।

ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রীঃ)

গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল (আঃ ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) রাজা হন। তাঁর সময় থেকেই পাল রাজারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রাধান্য স্থাপন ও কনৌজ অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়েন। ধর্মপাল কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করে নিজের মনোনীত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক রাজসম্মেলনে ভোজ, মৎস্য, কুরু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা ধর্মপালের প্রাধান্য স্বীকার করেন। কিন্তু আর্যাবর্তে তাঁর আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট চক্রায়ুধকে কনৌজ থেকে বিতাড়িত করে সেখানে প্রতিহার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মুঙ্গেরের কাছে এক যুদ্ধে তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু এই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারত আক্রমণ করে প্রতিহাররাজকে পরাজিত করলে ধর্মপালের পরোক্ষভাবে লাভ হয়। তিনি তৃতীয় গোবিন্দের প্রাধান্য স্বীকার করে নেন। গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপালের হৃত প্রাধান্য ও মর্যাদা পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত হয়।

উত্তর ভারতে অধিকার বিস্তার

ধর্মপালের কৃতিত্ব

ধর্মপাল পালবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় পূর্ব ভারত এবং পাটলিপুত্র নগর অতীতের কিছু গৌরব ও খ্যাতি ফিরে পেয়েছিল। তিনি বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিহার ও সোমপুরী বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও ধর্মপাল পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ। ধর্মপাল সুশাসকরূপেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

দেবপাল (৮১০—৮৫০ খ্রীঃ)

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (আঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) গৌড় রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত করেছিলেন। এই সময়ের শিলালিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে দেবপালের রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং পশ্চিমে আরব সমুদ্র থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি গুর্জর, দ্রাবিড় ও হূণদের পরাজিত করেছিলেন। উৎকল ও কামরূপ অধিকার করেছিলেন। কিছুটা অত্যুক্তি হলেও দেবপালের সামরিক সাফল্য ও রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। হূণদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যের উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয় তিনি হিমালয়ের নিকটবর্তী কোন হূণরাজ্যের বিরুদ্ধে সফল অভিযান করেছিলেন।

রাজ্যবিস্তার

ত্রি-শক্তির সংগ্রামে সাফল্য

গুর্জর ও দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যের দাবী থেকে অনুমান করা যায় যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট-পাল এই ত্রিশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পুনরায় শুরু হয়েছিল। দেবপাল সম্ভবতঃ কনৌজের প্রতিহাররাজ মিহিরভোজকে পরাজিত করে তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করেছিলেন। দ্রাবিড়দের বিরুদ্ধে জয়লাভের উল্লেখ থেকে মনে হয় দেবপাল, রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষকেও পরাজিত করেছিলেন।

অন্য সূত্রে জানা যায় যে এই সময় আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে রাষ্ট্রকূটরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দেবপাল-বিজিত এই দ্রাবিড়রাজ্যটি ছিল সুদূর দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যরাজ্য।

দেবাপলের খ্যাতি ও কৃতিত্ব

দেবপালের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্যের খ্যাতি বহির্ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের সম্মতি নিয়ে নালন্দায় একটি মঠ নির্মান করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে এই মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন।

দেবপাল মুঙ্গেরে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নালন্দার পৃষ্ঠপোষক এবং শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত ও কবি ব্রজদত্ত তাঁর সভাকবি ছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্ত্রী ছিলেন দর্ভপাণি ও কেদারমিশ্র। আরব পর্যটক সুলেমান তাঁর ভারত বিবরণে দেবপালের সামরিক শক্তির উল্লেখ করে লিখেছেন যে পাল সৈন্যবাহিনী প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বাহিনীর চেয়ে শক্তিশালী ছিল। দেবপাল সগৌরবে প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ইতিপূর্বে এবং এর পরে বাংলাদেশের কোনও সম্রাট এত বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী হতে বা এত খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। আনুমানিক ৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে দেবপালের মৃত্যু হয়।

পাল বংশের পতন

দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের পতন শুরু হয়। পরবর্তী পাল রাজাদের মধ্যে প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়ণ পাল বা অন্যান্যরা কোন সামরিক কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে প্রতিহার রাজবংশ উত্তর ভারতে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করেন। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটদের কাছেও পালরাজারা পরাজিত হয়েছিলেন। **প্রথম মহীপাল** (আঃ ৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ) সাময়িকভাবে পাল বংশের গৌরব কিছুটা উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে কলচুরি, চন্দেল্ল এবং দাক্ষিণাত্যের চোল রাজবংশের রাজাদের আক্রমণে এবং **দ্বিতীয় মহীপালের** রাজত্বকালে কৈবর্ত সম্প্রদায়ের নেতা দিব্য বা দিব্বোকের নেতৃত্বে প্রজা-বিদ্রোহের ফলে পালবংশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। দিব্বোকের নেতৃত্বে উত্তর বঙ্গ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। দিব্বোকের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো ভীম উত্তরবঙ্গের সিংহাসনে বসেন। এদিকে দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা **রামপাল** তাঁর আত্মীয় রাষ্ট্রকূটদের সাহায্যে ভীমকে পরাজিত করে উত্তরবঙ্গে পাল রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। রামপালই ছিলেন পালবংশের শেষ শ্রেষ্ঠ রাজা। রামপালের পর তাঁর পুত্র কুমার পাল ও পরে পৌত্র তৃতীয় গোপাল রাজা হন। গোপালের পর রামপালের দ্বিতীয় পুত্র মদন পাল সিংহাসনে বসেন। অবশ্য রামপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের উত্তরোত্তর অবক্ষয় ও পতন ঘটে।

প্রথম মহীপাল

কৈবর্ত বিদ্রোহ

রামপাল

সেন বংশ : এইভাবে দেবপালের মৃত্যুর পর আরও প্রায় তিনশো বছর বঙ্গ-

দেশ ও মগধে রাজত্ব করার পর পাল শাসনের অবসান ঘটে ও সেন বংশের রাজত্বের সূচনা হয়। সেন বংশের রাজাদের মধ্যে বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ), বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) ও লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) সুপরিচিত।

সেন বংশ

দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে এক উল্লেখযোগ্য সামাজিক কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন। এই প্রথা অনুসারে আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে কয়েকটি বংশকে "কুলীন" আখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমান বাঙালী হিন্দু সমাজেও এই প্রথার কিছুটা প্রচলন আছে। এই সময়ে সমাজে নারীর মর্যাদা হ্রাস পায়। নিম্ন জাতির অধিকার সংকুচিত হয়ে অস্পৃশ্যতা দেখা দেয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে হিন্দু সমাজ গতিহীন ও স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল।

কৌলিন্য প্রথা

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে মগধ, কনৌজ এবং গৌড় সাম্রাজ্যের উত্থান ও আধিপত্যের কাহিনী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস অজানা থাকলে, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। বিশেষ করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি রাজ্যের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কনৌজের অধিকার নিয়ে উত্তরাপথের রাজনীতিতে যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দাক্ষিণাত্যের অমূল্য অবদান আছে। সুতরাং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন।

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের গুরুত্ব

দক্ষিণ ভারতের প্রাচীনতম রাজ্যগুলির মধ্যে পাণ্ড্য, চোল, চের, সাতবাহন, পল্লব প্রভৃতি রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হত। অন্ধ্রের সাতবাহন বংশ ও কলিঙ্গের চেতবংশের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমান বেরার ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের বাকাটক বংশের রাজ্য খ্যাতিলাভ করে।

প্রাচীনতম দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যসমূহ

গুপ্তোত্তর যুগের দক্ষিণ ভারতীয় রাজশক্তিগুলির মধ্যে বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাতাপি বা বাদামীর চালুক্য বংশ ছিল শক্তিশালী। বাতাপির চালুক্য বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৯-৬৪২ খ্রীঃ) হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করে তাঁর অগ্রগতি রোধ করেন। পুলকেশীর রাজত্বকালে চালুক্য বংশ দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন

বাদামীর চালুক্যবংশ

বাতাপির চালুক্যবংশ

রাজ্যকে পরাভূত করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশী শেষ জীবনে কাঞ্চীর পল্লব বংশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

কাঞ্চীর পল্লববংশ

পল্লব বংশ তৃতীয় শতকেই একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে পল্লবরা আরও পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য স্থাপনকে কেন্দ্র করে **চালুক্য ও পল্লব রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলে।** এই বিরোধের ফলে দুটি রাজ্যই ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে **রাষ্ট্রকূট বংশ** দাক্ষিণাত্যে নিজেদের অধিকার বিস্তার করে।

রাষ্ট্রকূট বংশ

রাষ্ট্রকূট রাজ্যের (মহারাষ্ট্র অঞ্চল) প্রতিষ্ঠা করেন **দান্তিদুর্গ**। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে **ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ, তৃতীয় ইন্দ্র ও তৃতীয় কৃষ্ণ** রাষ্ট্রকূট রাজ্য ও ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং কনৌজে অধিকার বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেন। দশম শতকের শেষের দিকে রাষ্ট্রকূট বংশের ক্ষমতা লোপ পায়। রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা কাক-কে পরাজিত করে রাজা **দ্বিতীয় তৈল কল্যাণীর পরবর্তী চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।** দ্বিতীয় তৈল বাতাপির চালুক্যরাজের বংশধর বলে দাবী করতেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য।** তিনি কল্যাণীর চালুক্য বংশের গৌরব উজ্জীবিত করেছিলেন এবং চোল রাজাদের পরাজিত করে মহীশূরের একাংশ জয় করেছিলেন। তিনি ১০৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে চালুক্য বিক্রমাদিত্য অব্দের সূচনা করেন। হিন্দু আইনের ইতিহাসে রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে আইনজ্ঞ বিজ্ঞানেশ্বর একটি হিন্দু-আইনের সার-সংগ্রহ (digest) প্রকাশ করেন। এই সময়ে কবিতা ও সাহিত্যেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার **বিহ্লন** বিক্রমাদিত্যের সাফল্য ও অবদান স্মরণীয় করে রাখতে "বিক্রমাদিত্য চরিত" রচনা করেন।

কল্যাণীর পরবর্তী চালুক্য বংশ

দক্ষিণ ভারত

কাঞ্চির পল্লব বংশ তৃতীয় শতকেই (কাঞ্চিতে রাজধানী স্থাপন করে) একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে পল্লবরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই বংশের রাজা **বিষ্ণুগোপ্** সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাজয় বরণ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন।

ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের শেষদিকে রাজা **সিংহবিষ্ণুর** রাজত্বকাল থেকে পল্লবদের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশদ জানা যায়। সিংহবিষ্ণু চোলদের রাজত্ব দখল করেন এবং দক্ষিণে লঙ্কা পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য স্থাপন করেন।

সিংহবিষ্ণুর পুত্র **মহেন্দ্রবর্মণ প্রথম** এর রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করার জন্য উত্তর ভারতের বাতাপির চালুক্যরাজদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সূচনা হয়। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করে পল্লব বংশের গৌরব ধুলিসাৎ করে দেন। এরপর মহেন্দ্রবর্মণের প্রথম পুত্র ও তাঁর উত্তরাধিকারী **নরসিংহবর্মণ** প্রথম পুলকেশীকে পরাজিত করে চালুক্যদের রাজধানী বাতাপি ধ্বংস করেন। পল্লব-চালুক্য যুদ্ধ আবার নতুন করে শুরু হয় দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র **বিক্রমাদিত্য প্রথম** এর সময়ে। বিক্রমাদিত্য প্রথম পল্লবরাজ নরসিংহকে পরাজিত করে কাঞ্চি অধিকার করেন। পল্লবদের সমসাময়িক বিবরণী (record) থেকে জানা যায় যে চালুক্যদের আক্রমণ শেষ পর্যন্ত প্রতিহত হয়েছিল। চালুক্যরাজগণ তাঁদের অসাফল্যে নিরুৎসাহ না হয়ে বিক্রমাদিত্য প্রথম এর প্রপৌত্র **বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয়ের** নেতৃত্বে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্লবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পল্লবরাজ '**নন্দীবর্মণ পদ্মমালাকে** পরাজিত করে রজেধানী কাঞ্চি দখল করেন।

পল্লব-চালুক্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম

তাঞ্জোরের চোল রাজবংশঃ দক্ষিণ ভারতের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল তাঞ্জোরের **চোল রাজ্য**। অতি প্রাচীন এই রাজ্যের পুনরুত্থান হয় নবম শতকে। চোল রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোলদেব**। অন্যান্য যে সব রাজবংশ এই যুগে ও পরবর্তী কালে খ্যাতিলাভ করেছিল তাদের মধ্যে কল্যাণীর **চালুক্য বংশ**, মহারাষ্ট্রের **যাদব বংশ**, মহীশূরের **হোয়সল বংশ** ও অন্ধ্রদেশের **কাকতীয় বংশের** নাম উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এই রাজ্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

চোল রাজ্য

অন্যান্য দক্ষিন ভারতীয় রাজা

নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি তাঞ্জোরে স্বাধীন চোল রাজ্য স্থাপিত হয়। ৯০৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রভাবশালী চোল রাজা **পরন্তক প্রথম-এর** অভিষেক হয়। তিনি পাণ্ড্যদের পরাজিত করে মাদুরাই জয় করেন। এরপর কিছুদিন চোলশক্তির অবক্ষয় হয়। রাষ্ট্রকূটদের কাছে চোলরা পরাজিত হন। রাষ্ট্রকূটরা যখন চালুক্যদের হাতে হয়রান হচ্ছিল, সেই সময় চোলদের পুনরভ্যুত্থান হয় এবং চোল শক্তি **রাজরাজ প্রথম**-এর আমলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, (৯৮৫-১০১৪ খ্রীঃ)। চোল শক্তি পরে আরও শক্তিশালী ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী **প্রথম রাজেন্দ্র চোলের** আমলে।

রাজরাজ চোল বংশের প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি চোল রাজ্যকে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি কেরালা, লক্ষাদ্বীপ, সিংহল ও

পাণ্ড্যদের রাজ্য আক্রমণ করে পশ্চিমের সঙ্গে এঁদের একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করেন। চোলরা মালাবার দ্বীপ অধিকার করতে চায়। পরে রাজরাজ মালদ্বীপ আক্রমণ করেন ও সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর আক্রমণ করে ধ্বংস করেন। রাজরাজ দাক্ষিণাত্যে একটি বিরাট শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেন। তিনি রাজ্যে স্থলশক্তিকে সুসংহত করে শক্তিশালী করেন ও একটি বিরাট নৌবহর গড়ে তোলেন। তিনি পূর্ব চালুক্যদের পরাজিত করে বেঙ্গী দখল করেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোল প্রথম তাঁর পিতার সঙ্গে দুচার বছর মিলিতভাবে রাজ্যশাসন করে ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। এই সময়ে চোলরাজ্যের বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে। চালুক্যদের পরাজিত করে তিনি দক্ষিণপ্রদেশ (বর্তমান হায়দ্রাবাদ) চোলরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি সিংহল ও কেরালা আক্রমণ করে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে সিংহলে রাজেন্দ্রের আধিপত্য স্থায়ী হয়নি। ১০২৯ খ্রীস্টাব্দে সিংহল চোল শাসনমুক্ত হয়। রাজেন্দ্র চোল তাঁর পিতার মত আরব বণিকদের সিংহল, কেরালা, পাণ্ড্যরাজ্য ও মালাবার দ্বীপ থেকে অপসারণের নীতি অনুসরণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এই রাজ্যগুলিতে তাঁর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন।

রাজেন্দ্র চোলের উচ্চাশা উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উড়িষ্যা হয়ে চোলবাহিনী গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর হয়। তবে রাজেন্দ্র চোল বেশীদিন উত্তর ভূভাগ নিজের অধিকারে রাখতে পারেন নি।

সমুদ্রপারের অভিযান ঃ রাজেন্দ্র এক শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন। তাঁর সমুদ্রপারের অভিযান ছিল আরও উচ্চাশামূলক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **শ্রীবিজয় রাজ্যের** (মালয়, সুমিত্রা, জাভা) বিরুদ্ধে তিনি স্থল-বাহিনী এবং নৌবাহিনী দুইই কাজে লাগান। শ্রীবিজয় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজেন্দ্র সমুদ্রপারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও দক্ষিণ এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারের উচ্চাশা পোষণ করতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে এই যদি তাঁর বাসনা থাকত, তাহলে তিনি ঐসকল রাজ্য এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জয় করে, সেখানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করতেন। কিন্তু এরকম কিছু না হওয়ায়, মনে হয় দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই ঐসব অঞ্চলে তাঁর সামরিক অভিযান।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে চোল রাজ্যের সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। শ্রীবিজয়, চীন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। রাজেন্দ্র চোল এই বাধা দূর করেন। যুদ্ধের ফলে মালাক্কা প্রণালীর কিছু সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল চোলদের হাতে আসে, এবং কিছুদিনের জন্য শ্রীবিজয়ের অঞ্চল দিয়ে ভারতীয় বাণিজ্যিক নৌবহরের যাতায়াতের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন থাকে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে চোল রাজ্যের অবক্ষয় দেখা দেয়।

যুদ্ধ-বিগ্রহে চোলদের অর্থসঙ্গতি, সংস্থান ও শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। চালুক্য রাজ্যের উপর তাদের অধিকার ক্রমশঃ কমে যায় এবং এই সময়ে সামন্ত-তান্ত্রিক শক্তিগুলি নিজেরা ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ও চোল রাজ্য আক্রমণ করে। এইভাবে যাদব, হোয়সল, কাকতীয় ও গঙ্গ শক্তির আক্রমণ হয়, চোল রাজ্যের উপর। এর ফলে চোল রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে চোল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

রাজা রাজেন্দ্র চোল প্রথম-এর উত্তরাধিকারগণের আমল থেকেই চোল রাজারা দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে তাঁদের দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে আন্তঃরাজ্য বিবাদ ও যুদ্ধের দিকে নিবদ্ধ করেন।

চোলদের পতনের পর পাণ্ড্য বংশের প্রাধান্য আবার স্থাপিত হয়।

সপ্তম অধ্যায় | ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রম-বিবর্তন সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে

আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আলোচনার সুবিধার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

উত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হল গুপ্ত যুগ। রাষ্ট্রশাসন, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই যুগে অভূতপূর্ব উন্নতি ও উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসেও গুপ্ত যুগ এক গৌরবময় অধ্যায়। বিশ্ববিখ্যাত অজন্তার গুহা ও গুহাচিত্রাবলীর (হায়দ্রাবাদ রাজ্যে) অনেকগুলি গুপ্ত রাজাদের আমলে নির্মিত ও অঙ্কিত হয়েছিল। বেশীর ভাগ চিত্রই বোধিসত্ত্ব ও গৌতম বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে অঙ্কিত।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

গুপ্ত যুগে ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। এই সব বিষয়ে গর্গ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ধন্বন্তরীর মত পণ্ডিতদের গ্রন্থ এই সময়েই রচিত হয়।

গুপ্ত সম্রাটদের প্রায় আড়াইশো বছরব্যাপী রাজত্বকালে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনীষার যেরূপ বিকাশ হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যের অবস্থা

গুপ্ত সাম্রাজের পতনের পরবর্তী যুগে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চার প্রসার বন্ধ হয়ে যায়নি। **হর্ষবর্ধনের** (৬০৬-৬৪৭) রাজত্ব সুশাসিত ছিল বটে, কিন্তু মৌর্য ও গুপ্ত যুগের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে মনে হয়, তখন রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার কিছুটা অবনতি হয়েছিল। হিউয়েন-সাঙ নিজেই দুবার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। দণ্ডবিধিও তখন ছিল খুব কঠোর। নতুন রাজধানী কনৌজ তখন জনবহুল ও সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য বড় শহরের মধ্যে প্রয়াগ,

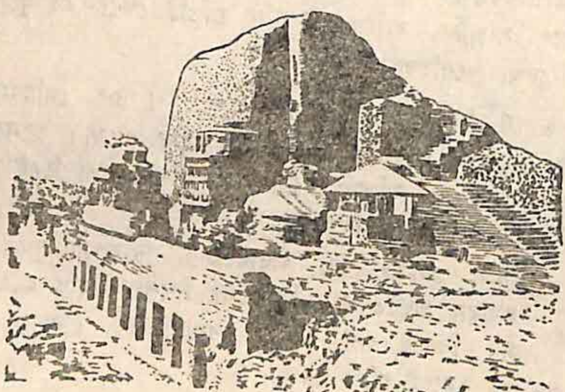
নালন্দা, মথুরা, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশের জনসাধারণের নৈতিক মান উন্নত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের সুদিন আর ছিল না। বৌদ্ধ যুগের কয়েকটি শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়রা তাদের পরধর্ম-সহিষ্ণুতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। ধর্মীয় উৎপীড়ন সমাজে ছিল না। দেশের রাজা প্রজারঞ্জনের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাজ্য শাসন করতেন ও দান-ধ্যান প্রভৃতি জনহিতকর কাজে ব্রতী হতেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে অনুষ্ঠিত দান-মেলায় হর্ষবর্ধনের সর্বস্ব বিতরণের কাহিনী সত্যই চিত্তস্পর্শী।

ধর্মজীবন

হর্ষবর্ধন নিজে সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। 'নাগানন্দ' 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'রত্নাবলী'—এই তিনটি সংস্কৃত নাটক তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর সভাকবি বাণভট্ট লিখেছিলেন 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত'। হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে আছে যে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতদের পুরস্কৃত করার জন্য ব্যয় করা হত।

হর্ষের সাহিত্যানুরাগ

বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান ছিল ভারতবর্ষ। যে সব বিদ্যায়তন হর্ষ ও অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল **নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়।** নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশ



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

হাজার। মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দূরদেশ থেকে ছাত্র আসত নালন্দায় অধ্যয়ন করতে। পড়াশোনা ও থাকা-খাওয়ার জন্য কোন খরচ লাগত না। ছ'জন রাজা ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা সব ব্যয় বহন করতেন। কিন্তু ভর্তি হবার জন্য অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্রদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হত। হিউয়েন-সাঙ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। ছাত্ররা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষালাভ ও শিক্ষকেরা নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করতেন। হর্ষবর্ধনের সময় নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

মহাজ্ঞনী শীলভদ্র। শিক্ষকেরা প্রত্যেকেই ছিলেন মহাপণ্ডিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি গ্রন্থাগার ছিল। বৌদ্ধ মহাবিহার হলেও এই বিদ্যায়তনের পাঠ্যসূচী ছিল ব্যাপক ও বহুবিধ। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়

হর্ষবর্ধন ও সমসাময়িক যুগের অন্য রাজারা তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠ-পোষকতা করলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল আরও হাজার বছরেরও আগে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা প্রাচ্য জগতে। দেশ-দেশান্তরের বহু ছাত্র আসত এখানে বিদ্যালাভ করতে। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যা, রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থাও এখানে ছিল।

পরবর্তী যুগের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মান ও ঐতিহ্য পরবর্তীকালেও ক্ষুণ্ণ হয়নি। গৌড়ের পালবংশীয় রাজারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক সাহায্য দান করেছিলেন। তাছাড়া তাঁদের, বিশেষতঃ পাল সম্রাট ধর্মপালের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিহারের উদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা এবং উত্তর বঙ্গে সোমপুরী মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মহাবিহারগুলি ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। বিক্রমশীলা



দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। এই বৌদ্ধ মহাজ্ঞানীর খ্যাতি দেশ-বিদেশে প্রসারিত ছিল। তিব্বতের মহারাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। ঐ দেশেই তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন।

হর্ষোত্তর যুগ থেকে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মূল ধারাগুলির মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নি। এই যুগে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মমতের প্রাধান্য দেখা দেয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ব গৌরব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পেলেও কোন ধর্মীয় বিদ্বেষ বা বিরোধ দেখা দেয় নি। পরধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ ছিল। **বিভিন্ন ধর্মমত ও বিশ্বাসের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এক বিশ্বজনীনতাবোধের উন্মেষ হতে থাকে।**

হর্ষোত্তর যুগে ধর্মজীবন ও চিন্তা

পাল যুগে মাঘ, রাজশেখর, বামন, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, ভবভূতি প্রভৃতি কবি, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। কহ্লণ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনা ঐতিহাসিক উপাদানের জন্য বিশেষ মূল্যবান। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', জীমূতবাহনের হিন্দু আইনের গ্রন্থ 'দায়ভাগ' ও চক্রপাণি দত্তর 'চিকিৎসা সংগ্রহ' পালযুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। পাল যুগে বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শনের চর্চার প্রসার ও অগ্রগতি হয়।

সাহিত্যকীর্তি

হর্ষবর্ধনের মত পরমাররাজ ভোজ (আঃ ১০১৩-১০৫৫ খ্রীঃ) ও সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) তাঁদের সাহিত্যকীর্তির জন্য প্রসিদ্ধ। সেন যুগের কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বাংলা কাব্যের এক অমূল্য সম্পদ। ধোয়ী, কবি শরণ, উমাপতিধর, গোবর্ধনাচার্য, হলায়ুধ প্রভৃতি মনীষী, কবি ও সাহিত্যিক সেন যুগে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে **গঙ্গাবংশীয়** রাজারা (Greater Ganges) উড়িষ্যায় রাজত্ব করতেন। স্থাপত্যশিল্পে বিশেষতঃ মন্দির নির্মাণে তাঁদের উল্লেযোগ্য অবদান আছে। এই সময় নির্মিত উড়িষ্যার মন্দিরগুলির মধ্যে কোনারকের সূর্যমন্দির এক বিস্ময়কর শিল্পসৃষ্টি। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হল ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ও পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির। উত্তর ভারতের রাজপুত রাজ্যগুলির রাজারাও শিল্পানুরাগী ছিলেন। জেজাকভুক্তির **চন্দেল্ল রাজবংশের** পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত **খাজুরাহোর মন্দির** ও ভাস্কর্যকলা, ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উদন্তপুরী, সোমপুর ও বিক্রমশীলার ধ্বংসাবশেষ **পালযুগের শিল্পকলার উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।** এই যুগেই ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল পাথর ও ধাতব মূর্তি গঠনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

শিল্প ও সাহিত্য

দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে এক উল্লেখযোগ্য নতুন সামাজিক কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন। এই প্রথা অনুসারে আচার-ব্যবহার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে কয়েকটি বংশকে 'কুলীন' আখ্যা দিয়ে বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়। বর্তমান বাঙালী হিন্দু সমাজেও এই প্রথার

বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন

কিছুটা প্রচলন আছে। হিন্দু সমাজের ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেন যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সনাতন হিন্দু ধর্মের পূর্ণজাগরণ দেখা দেয়। আলোচ্য কয়েক শতাব্দীতে সমাজে নারীর মর্যাদা আরও হ্রাস পায়। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রভৃতি কু-প্রথাগুলির প্রচলন হয়। নিচজাতির অধিকার সঙ্কুচিত হয়ে অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য কুসংস্কারের প্রাধান্য দেখা দেয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে হিন্দুসমাজ গতিহীন ও স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল।

মুসলমান যুগের প্রাক্কালে হিন্দু সমাজের গতিহীনতা



স্থাপত্যকলা (খাজুরাহো)

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পাল ও সেন যুগে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। ধান, পাট, আখ, তুলা প্রভৃতি প্রধান উৎপন্নদ্রব্য ছিল। খনিজদ্রব্যের মধ্যে তামা ও লোহা পাওয়া যেত। বস্ত্র শিল্প, রেশম শিল্প, কাঁসা ও পিতলের বাসন শিল্প উন্নত মানের ছিল। এই যুগে সম্ভবতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি হয়। ফলে সমৃদ্ধশালী তাম্রলিপ্ত বন্দরের গুরুত্ব কমে যায়।

পাল ও সেন যুগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

এইযুগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে এক ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে কৃষক ও সাধারণ লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন

দক্ষিণ ভারত এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টিকারী। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তনে দ্রাবিড় সভ্যতার গুরুত্ব ও অবদান সুপরিচিত। আর্য-প্রাধান্য বিস্তারের ফলে আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার মিশ্রণ হয়, তার থেকেই দক্ষিণ ভারতীয় সমাজ গড়ে ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে ধীর গতিতে দক্ষিণ ভারতে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

প্রাচীন তামিল রাজ্যগুলির রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন

প্রাচীন যুগের পাণ্ড্য, চের, চোল প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলিতে রাজতন্ত্র থাকলেও জনসাধারণ, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য ও মন্ত্রীদের **'পঞ্চমহাসভা'** রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করায় তিনি স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। গ্রামবাসীরাই গ্রামের শাসন পরিচালনা করতেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রাম-শাসনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চোল রাজ্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। পঞ্চমহাসভার গঠনপ্রণালী থেকেই সমাজের শ্রেণীবিভাগ অনুমান করা যায়। সমাজে দাসপ্রথা ছিল না। লোকেরা শান্তিতে জীবনযাপন করত। বেতন-ভোগী সৈন্যরা যুদ্ধ করত। কৃষি ও বাণিজ্য উন্নত ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে তামিল দেশগুলির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে অনেক জিনিস রপ্তানী হত। ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য ছিল। প্রাচীন তামিল রাজ্যগুলির বিশেষ করে চোল রাজ্যের শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল। গ্রীস, রোম, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্রপথে যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণী রাজ্যগুলির অধিবাসীরা প্রথমে অসুর-দানব পূজা করতো। পরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে। কয়েক শতাব্দী ধরে মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রাধান্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের শ্রেণীবৈষম্য প্রথমে খুব প্রবল ছিল না। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সুকুমার কলার মান খুব উন্নত ছিল। নানাপ্রকার লৌকিক প্রথা, হস্তরেখা-বিচার ইত্যাদি বহুল-প্রচলিত ছিল।

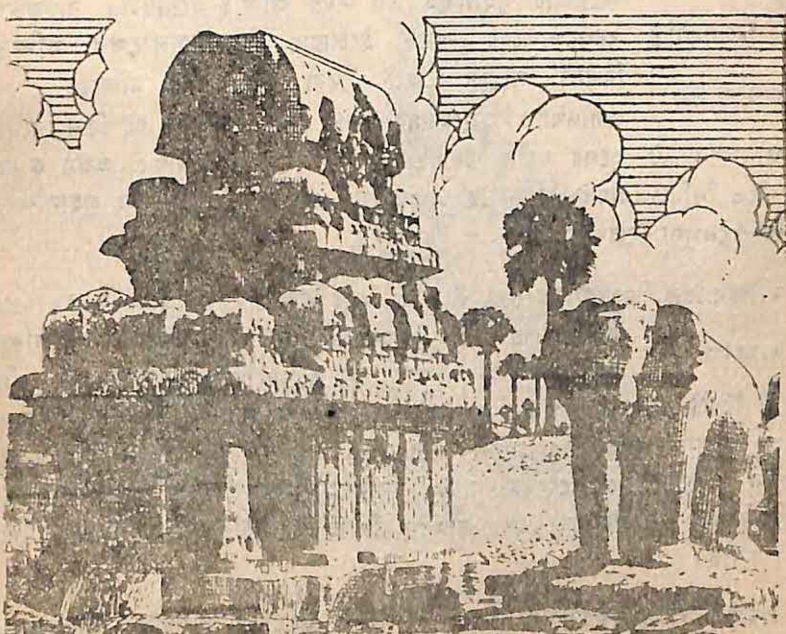
তামিল সাহিত্য যেমন প্রাচীন তেমনি সমৃদ্ধ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই সাহিত্য প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো। কিংবদন্তী অনুসারে মাদুরা শহরে তিনটি বৃহৎ সাহিত্যসভা বা সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন তামিল

সাহিত্যের 'অষ্টসঙ্কলন' তৃতীয় সঙ্গমের কবিরা রচনা করেছিলেন। অনেকে এই কিংবদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রাচীন যুগে তামিল ভূখণ্ডের চারণ কবিরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন। দেশের রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ গ্রামবাসীরা পর্যন্ত তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিছুকাল অন্তর এই সব কবি ও গায়কেরা মাদুরা শহরে মিলিত হয়ে এক মহোৎসবে নিজেদের কবিতা পাঠ করতেন। এইভাবেই প্রাচীন তামিল সাহিত্য সঙ্কলিত হয়। দাক্ষিণাত্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক মূল্যবান উপাদান তামিল সাহিত্য। প্রখ্যাত তামিল কবি তিরুভল্লুভার-রচিত 'কুরল' সম্ভবত প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন তামিল সাহিত্য

'পত্তুপাট্টু' বিখ্যাত তামিল গ্রন্থ 'সঙ্গম' যুগে রচিত হয় বলে মনে করা হয়।

গুপ্তযুগের পরবর্তী কালে উত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণ ভারতীয় সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়। আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সমন্বয়জাত



মহাবলীপুরমের রথ

দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সমগ্র ভারতীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত ও পুষ্ট করেছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

আলোচ্য যুগে ভারতের সার্বিক অগ্রগতির মূল কারণ ছিল শক্তিশালী ও সুশাসিত রাজ্যের উত্থান। চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি বংশের উত্থান দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে গৌরবময় যুগের সূচনা করে। দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখা যায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে। শিল্পোন্নতির পুরোভাগে ছিলেন পল্লব রাজবংশ। পল্লব শিল্পীরা কুষাণ যুগের মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পরীতির পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে এক নতুন শিল্পরীতি সৃষ্টি করেন। পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রয়েছে কাঞ্চী ও মহাবলীপুরমে। মহাবলীপুরমের যুধিষ্ঠিররথ, ভীমরথ ইত্যাদি সপ্তরথ বা মন্দির, মুক্তেশ্বর ও কৈলাস মন্দির, কাঞ্চীর ত্রিপুরান্তকেশ্বর ও ঐরাবতেশ্বর মন্দির ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এক-একটি বড় পাথর কেটে এক-একটি কারুকার্য-শোভিত মন্দির সৃষ্টি করা হয়েছিল। গঙ্গাবতরণ, গিরিগোবর্ধন ধারণ, অর্জুন-তপস্যা প্রভৃতি প্রস্তরচিত্র পল্লব শিল্পের আর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট বংশের রাজারাও শিল্প ও সংস্কৃতির অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চালুক্যদের সময় বাতাপির বিখ্যাত গুহামন্দিরগুলি এবং আইহোলের দুর্গামন্দির নির্মিত হয়েছিল। অজন্তার কয়েকটি গুহাচিত্রও এই সময় অঙ্কিত হয়েছিল। রাষ্ট্রকূটদের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি আওরঙ্গাবাদের কাছে ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির। বিশাল পাহাড় কেটে তৈরী করা এই মন্দিরের ভাস্কর্য জগদ্বিখ্যাত। ইলোরার বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু এই তিন ধর্মেরই শিল্পনিদর্শন ঐ যুগের ধর্মীয় উদারতা ও সহাবস্থানের প্রমাণ। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নির্মিত বোম্বাই-এর কাছে এলিফেন্টা দ্বীপের শিবমূর্তি ও গুহামন্দিরের সৌন্দর্য ও নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য।

পল্লব শিল্প

চালুক্য শিল্প

রাষ্ট্রকূট শিল্প

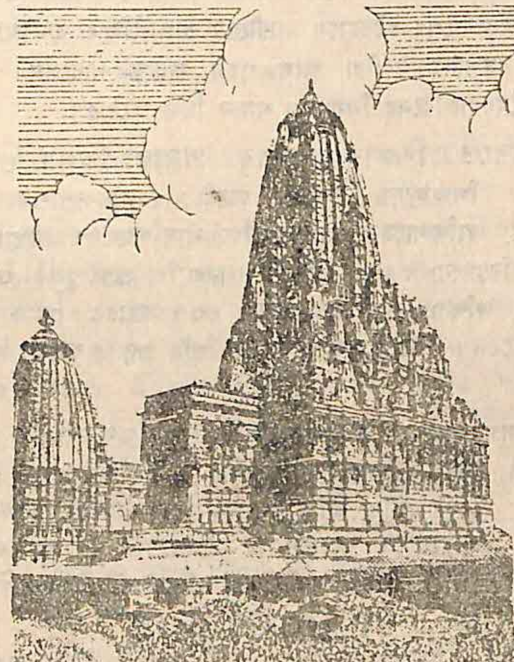
চোল শিল্প

দাক্ষিণাত্যের শিল্পরীতির চরম উৎকর্ষের আর এক প্রকাশ চোল শিল্প। চোল মন্দিরগুলির মধ্যে তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরের শিবমন্দির প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদ্দটি স্তর আছে ও শীর্ষে একটি বিরাট গোলাকার পাথর বসানো আছে। চোলশিল্পীরা ধাতুমূর্তি নির্মাণেও কুশল ছিলেন। তাঞ্জোরের মন্দিরে ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি ধাতুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাজেন্দ্র চোলদেবের সময় নির্মিত গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমের (ত্রিচিনাপল্লী) মন্দির এবং জলসেচব্যবস্থা শিল্প ও পূর্তবিদ্যার অগ্রগতির পরিচয় বহন করছে।

পরবর্তী কালে হোয়সল বংশ ও পাণ্ড্য বংশের রাজারাও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে মহীশূর, মাদুরা ও অন্যান্য স্থানে দর্শনীয় মন্দির ও গোপুরম্ নির্মিত হয়েছিল।

ভারতীয় ধর্মজীবন, চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের প্রচুর অবদান আছে। গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের জন্ম হয়। ভক্তির মূল কথা হল ঈশ্বরের প্রতি সুগভীর অনুরাগ ও প্রেম। ঈশ্বর-ভক্তি প্রকাশের প্রধান লক্ষণ বা উপায় হল ঈশ্বরের নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, পূজা, স্তব, পরিচর্যা, বন্ধুভাবে সম্ভাষণ ও ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভক্তিবাদের দর্শন হল যে জ্ঞান ও কর্ম অপেক্ষা ভক্তি দ্বারা সাধনা করলে সিদ্ধিলাভ করা যায়। কালক্রমে এই মতবাদ ভারতের হিন্দু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনার প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়। সপ্তম শতাব্দী থেকে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে ভক্তিবাদের প্রভাব বিস্তৃত হতে শুরু হয়। কথিত আছে যে শৈব সাধক 'নায়নার'দের দ্বারা সপ্তম শতকে শৈব ধর্মে ভক্তিবাদের প্রচার হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন শৈব সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সাধকরা 'আলবার' নামে পরিচিত। এরকম বারো জন 'আলবার' জন্ম গ্রহন করেছিলেন। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে আচার্য রামানুজ ও তাঁর অনুগামী নিম্বার্ক ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক

ভক্তিবাদের জন্ম ও প্রসার



দক্ষিণ ভারতের একটি মন্দির

ছিলেন। মধ্যযুগে ভক্তি-আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হয়ে প্রসার লাভ করে।

সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে সারা ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের এক নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। এই জাগরণ দক্ষিণ ভারতে সুরু হয়ে উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়েছিল। যুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে বৈদিক ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা প্রচার করে যিনি ধর্মজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর নাম শঙ্করাচার্য (আঃ ৭৮৮-৮২০ খ্রীঃ)। তরুণ তামিল শৈব ব্রাহ্মণ এই যুগপুরুষ ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা' এই অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন। শঙ্করের ভাষ্য হিন্দুদর্শনের প্রামাণিক সংজ্ঞারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

হিন্দুধর্মের জাগরণ ও শংকরাচার্য

আর্য সভ্যতার প্রভাবের ফলে দাক্ষিণাত্যে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। বৃত্তি বা জীবিকার সঙ্গে জাতির সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। জাতিভেদ প্রথা কালক্রমে কঠোর হয়ে পড়ে। অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য কুসংস্কার সমাজজীবনে প্রবেশ করে। দক্ষিণ ভারতে মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রাধান্যের ফলে সমাজে নারীর স্থান ছিল উচ্চে। সাতবাহন, বাকাটক প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাসে নারীদের রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে অংশগ্রহণের উল্লেখ আছে। ধর্মচর্চায় নারীরা অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। বৈধব্যজীবনের নিয়ম ও শাসন ছিল কঠোর।

সমাজজীবন

দক্ষিণ ভারতে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করত। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি শাস্ত্রশিক্ষা ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা পরিচালনা করত। মহাবিদ্যালয়গুলি ব্রহ্মপুরী ও ঘটিকা নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ ভারতীয় রাজারা ও সাধারণ লোক শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাঞ্চী, বেলগাম, দেবাগিরি প্রভৃতি স্থানের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির খ্যাতি ছিল।

বিদ্যাচর্চা

তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়ালম্ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু মূল্যবান গ্রন্থও দক্ষিণ ভারতে লিখিত হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে 'ভাগবত' দক্ষিণ ভারতে রচিত হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও এই দুই মহাকাব্যের গল্পের ভিত্তিতে লেখা নানান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বিহ্লণ, ভারবি মহেন্দ্রবর্মণ, দণ্ডিন, কুলশেখর, হাল ও গুণাঢ্য প্রভৃতি লেখকদের নাম উল্লেখযোগ্য। শৈব ও বৈষ্ণব সাধকদের রচিত কাব্য, তামিল ভাষায় রচিত জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ ও কাব্যগুলি দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল।

সাহিত্যচর্চা

শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, বহির্জগতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা এবং সর্বোপরি শিল্প ও ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বহির্বিশ্বে ভারতীয় বাণিজ্য এবং সংস্কৃতির প্রসার

বিশ্বজগতে ভারতীয় সংস্কৃতির অবদানের ঐতিহ্য

অতি প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্জগতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একসময়ে দূর দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমগ্র এশিয়া তথা বিশ্বের ইতিহাসে ভারতীয় শিক্ষা, দর্শন, ধর্ম ও শিল্পের অসামান্য প্রভাব ও অবদানের কথা স্মরণ করে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ভারতবর্ষকে 'এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র' রূপে বন্দনা করে লিখেছেন ঃ

"দিয়াছ মানবে. জগজ্জননি,
দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা,
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্মভক্তি, ধর্মশিক্ষা।"

ভারত ও পশ্চিম এশিয়া ঃ সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকেই ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। আলেকজাণ্ডারের অভিযান. সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যুদ্ধ, শান্তি এবং দূত প্রেরণের কাহিনী সুপরিচিত। অশোক পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। বহ্লীক-অঞ্চলের গ্রীকরা ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। তারাই ভারতীয় ভেষজ-বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের দশমিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য দেশে নিয়ে গিয়েছিল।

ভারত ও মধ্য এশিয়া ঃ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অরেলস্টাইন মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে ভারতীয় নগর ও কর্মকেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কৃত নিদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠের ভগ্নাবশেষ, বুদ্ধমূর্তি. হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি আছে। নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল গোমতী বিহার। এখানে বহু ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য আসত। মধ্য এশিয়ার খাসগড়. ইয়ারকন্দ, খোটান ও চীনা তুর্কীস্তানের নানান অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এইসব অঞ্চলে বহু বৌদ্ধগুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙ এইসব জায়গায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন।

ভারত ও সিংহল ঃ সিংহল দ্বীপের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সিংহলরাজ মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় একটি সঙ্ঘারাম তৈরীর জন্য গুপ্ত সম্রাটের অনুমতি পেয়েছিলেন। এই সময়েই বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত মগধের দন্তপুর থেকে সিংহলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সিংহলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সিংহলের অনুরাধাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

ভারত ও তিব্বত, চীন এবং দূর প্রাচ্য

সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা স্রোং-সান তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন করেন। তাঁরই সময়ে তিব্বতে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় অক্ষরমালার প্রচলন শুরু হয়। তিব্বতী শিক্ষার্থীরা নালন্দা ও বিক্রমশীলায় অধ্যয়ন করতে আসতেন। তিব্বতী পণ্ডিতেরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁদের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এর ফলে কোন কোন লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষা থেকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গৌড়ের পাল-রাজাদের সঙ্গে তিব্বতের সৌহার্দ্য ছিল। তিব্বত-রাজের অনুরোধে একাদশ শতাব্দীতে **অতীশ দীপঙ্কর** বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিব্বতের অধিবাসীরা আজও তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে।

তিব্বত

বৌদ্ধ ধর্ম চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় দু'হাজার বছরের পুরানো সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূচনা করেছিল। একটি চীনা লোক-কাহিনী অনুসারে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের শুভ প্রবর্তন হয়েছিল। আর একটি কিংবদন্তী আছে যে প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মাচার্য **ধর্মরত্ন ও কাশ্যপমাতঙ্গ** চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে চীনদেশে গিয়েছিলেন। পঞ্চম শতাব্দী থেকে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের দ্রুত বিস্তার হতে থাকে। বহু চৈনিক পণ্ডিত, ধর্মোৎসাহী ও শিক্ষার্থী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙের নাম সুবিখ্যাত। বহু ভারতীয় পণ্ডিত এবং ধর্মপ্রচারকও চীনদেশে গিয়েছিলেন। তাঁদের সহায়তায় অনেক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। **জ্ঞানভদ্র, যশোগুপ্ত** প্রভৃতি পণ্ডিত বাংলাদেশ থেকে চীনে গিয়েছিলেন। ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও সঙ্গীতকলা চীনে সমাদৃত হয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল।

চীন

চৈনিক শিল্প, চিত্রাঙ্কন ও মূর্তিগঠনের ওপর ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ শিল্পরীতি চীনে প্রসার লাভ করেছিল। চীনে অনেক বৌদ্ধ গুহামন্দির আছে। তার মধ্যে তুন্-হোয়াঙের পাহাড়ের গায়ে **'সহস্র বুদ্ধগুহা'** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীন-দেশীয় প্রাচীর-চিত্রে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ছাপ সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

চীনদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান ও ব্রহ্মদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণ ভারত থেকে মহাপণ্ডিত বোধিসেন জাপানে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা প্রচার করেছিলেন। তিনি-জাপানের বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মদেশের উপকূলে ও অভ্যন্তরে অতি প্রাচীন যুগে হিন্দু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। মোন্ বা 'তেলৈং'রা ব্রহ্মদেশের নিম্ন অঞ্চলে বাস করে। এরা অনেকে হিন্দুভাবাপন্ন। মোন্দের ধর্ম ও বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে ভারতীয় ধর্ম ও বর্ণমালা থেকে। এই এলাকার উত্তরে পিউ জাতি একটি রাজ্য স্থাপন করেছিল। এর রাজধানী ছিল শ্রীক্ষেত্র (বর্তমান প্রোমের কাছে হ্মওয়াজা শহর)। পিউরা হিন্দু ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আরাকান অঞ্চলে কয়েকটি ভারতীয় রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে সম্রাট অশোক চীন ও ব্রহ্মদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এর সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও মৌর্যোত্তর যুগে যে ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নবম শতকে প্রতিষ্ঠিত মধ্যব্রহ্মের 'পাগান' রাজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পাগানের রাজধানী ছিল অরিমর্দনপুর। পাগান রাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ব্রহ্মদেশ থেকে লুপ্ত হয় এবং 'থেরবাদ' বৌদ্ধ ধর্মমত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। পাগান রাজ্যের একটি মন্দির দেখে অনুমান করা যায় যে ভারতীয় শিল্পীরা এটি নির্মাণ করেছিলেন। ব্রহ্মদেশের সাহিত্য, শিল্প, আইন ও বিচারপদ্ধতিতে ভারতীয় আদর্শ ও রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

জাপান

ব্রহ্মদেশ

এক সময় শ্যামদেশে (থাইল্যাণ্ড) কয়েকটি হিন্দু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল পরবর্তী কালে থাই জাতি শ্যামদেশ জয় করার পর ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সুখোদয়, অযোধ্যা প্রভৃতি থাইরাজ্যের নামেই ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। শ্যামের শাস্ত্রগ্রন্থ পালি ভাষায় লেখা। মন্দিরগুলিতেও হিন্দু রীতি ও আঙ্গিকের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

শ্যামদেশ

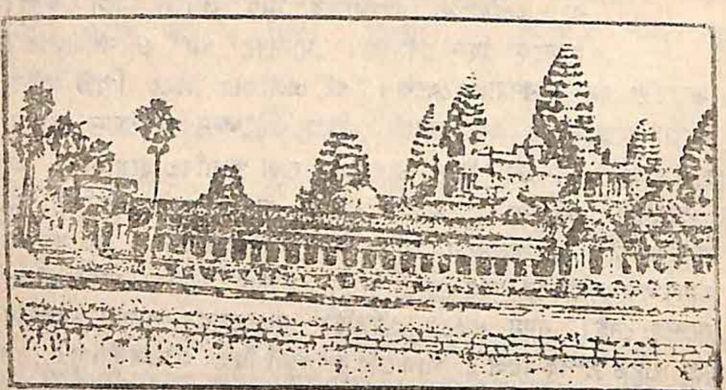
ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

জাতক, কথাসরিৎসাগরের বহু গল্পে ভারতীয় সওদাগরদের সুদূর সাগরপারের সুবর্ণভূমি-যাত্রার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আন্নাম প্রভৃতি রাজ্য ও সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের সম্মিলিত অঞ্চলটির নাম ছিল সুবর্ণভূমি। সুমাত্রা দ্বীপের আর এক নাম ছিল সুবর্ণদ্বীপ। এই দেশগুলি ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টি এমনভাবে গ্রহণ করেছিল যে সুবর্ণভূমি অঞ্চলটি 'বৃহত্তম ভারত' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বৃহত্তর ভারতের গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রায় দু'হাজার বছর আগে। গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষ এশিয়ার মুখ্য বাণিজ্যিক

সুবর্ণভূমি

ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। পরবর্তী কালেও দীর্ঘদিন ভারতের এই প্রভাব ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল।

পেরিপ্লাস এবং টলেমি থেকে এই সব অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ এবং বাণিজ্যের কথা জানা যায়।



আঙ্কোরভাটের মন্দির

খ্রীস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে কম্বুজে (বর্তমান কাম্বোডিয়া) একটি হিন্দু রাজ্য গড়ে উঠেছিল। কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ কম্বুজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই রাজ্যের হিন্দু রাজারা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেছিলেন। চীনা ভাষায় এই রাজ্যের নাম ছিল ফু-নান। কম্বুজের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্রবর্মণ, সপ্তম জয়বর্মণ, যশোবর্মণ, দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ ইত্যাদি। কম্বুজের রাজধানীর নাম **যশোধরপুর**। এই নগরীর পরে নামকরণ হয় **আঙ্কোরথোম**। এই শহরের বিন্যাস, আড়ম্বরপূর্ণ বিশালতা ও সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব। আঙ্কোরথোমের **আঙ্কোরভাট** বিষ্ণুমন্দিরটির স্থাপত্যশিল্প জগদ্বিখ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বুজের বৈষ্ণব রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের পাথরের গায়ে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের নানান কাহিনীর চিত্র খোদাই করা আছে। আঙ্কোরথোমের মন্দির-শিল্পের আর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বায়নের শিবমন্দির। বৌদ্ধ ধর্ম মাঝে মাঝে কম্বুরাজদের আনুকূল্য লাভ করলেও বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। এই রাজ্যের শিলালিপিগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। দেশের রাজাদের ও সাধারণ লোকের পৃষ্ঠপোষকতায় কম্বুজে অনেক 'আশ্রম' নির্মিত হয়েছিল। এই আশ্রমগুলি ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি।

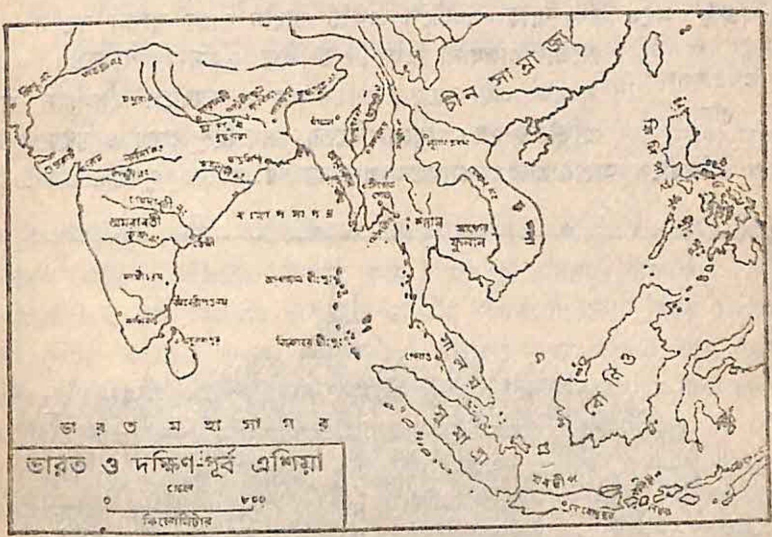
কম্বুজ রাজ্য

আঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দির

কম্বুজের পূর্ব দিকে **চম্পা** (আধুনিক ভিয়েৎনামের আন্নাম অঞ্চল) নামে

আর একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। কথিত আছে, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে শ্রীমার নামে এক ভারতীয় হিন্দু এই রাজ্যটি স্থাপন করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে এই রাজ্যটির অস্তিত্ব ছিল। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে চম্পারাজ্য পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। এই যুগের শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে জয়পরমেশ্বরদেব, ঈশ্বরমূর্তি, রুদ্রবর্মণ, হরিবর্মণ, জয়সিংহবর্মণ প্রভৃতির শৌর্যবীর্যের খ্যাতি ছিল। চম্পাতে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন চম্পায় বিস্তার লাভ করেছিল। চম্পার সামাজিক ব্যবস্থা হিন্দু সমাজরীতির দ্বারা প্রভাবিত

চম্পা রাজ্য



ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

ছিল। সরকারী ভাষা ছিল সংস্কৃত। চম্পার ইঁটের তৈরী মন্দিরগুলির শিল্পরীতিতে পল্লব ও চালুক্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চম্পার এক প্রখ্যাত ধর্মকেন্দ্র ছিল ভদ্রেশ্বর স্বামী শিবমন্দির।

অষ্টম শতকে মালয় উপদ্বীপে এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি সমগ্র পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শৈলেন্দ্র বংশ। আরব বণিকদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে এই বংশের রাজারা যেমন শক্তিশালী তেমনি বিত্তশালী ছিলেন। তাঁদের বৃহৎ নৌবাহিনী ছিল ও দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজাদের দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলেছিল। শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্র দেব নালন্দাতে একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। কুমার ঘোষ নামে এক বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে

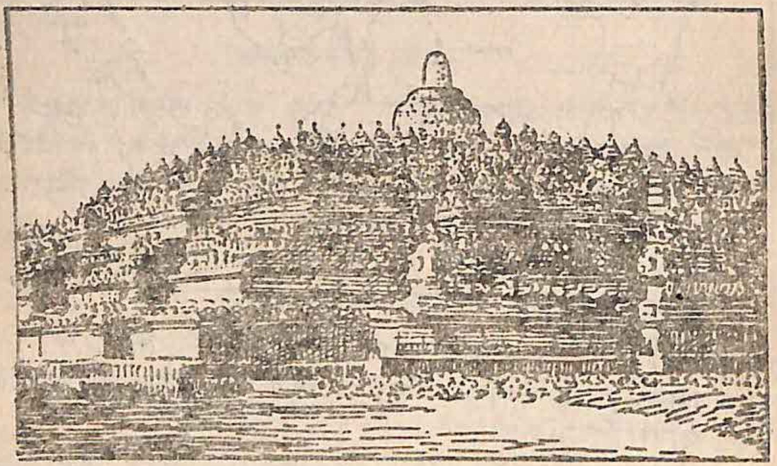
শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

তারাদেবীর একটি মন্দির ঐ রাজ্যে নির্মিত হয়েছিল। শৈলেন্দ্রবংশের স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন **বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপ**। যবদ্বীপের একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই মন্দিরটির পরিকল্পনা ও নির্মাণ-কৌশলের বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য দর্শকদের অভিভূত করে। মন্দিরের অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্তি ও জাতকের গল্পের চিত্ররূপগুলি অপূর্ব সুন্দর। বরবুদুরের মন্দিরকে অনেকে বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন।

যবদ্বীপের হিন্দুরাজ্য

চতুর্থ শতকে যবদ্বীপে একটি হিন্দুরাজ্য গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুকাল পর এই রাজ্যটি শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা জয় করে নিয়েছিলেন। একাদশ শতক পর্যন্ত শৈলেন্দ্র বংশ সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। তারপর এই বংশের পতন শুরু হয় এবং সেই সুযোগে **শ্রীবিজয়** নামে এক ব্যক্তি যবদ্বীপে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল **তিক্তবিল্ব বা মাজাপহিত**। পঞ্চদশ শতকে এই রাজ্যের পতন হয় ও যবদ্বীপে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মাজাপহিতের শেষ হিন্দু রাজা ও রাজ্যের কিছু লোক বলিদ্বীপে আশ্রয় নেয়। সেখানে প্রায় হাজার বছরের পুরানো একটি হিন্দু

যবদ্বীপের মুসলমান রাজ্য



বরবুদুরের বৌদ্ধস্তূপ

রাজ্য ছিল। এই দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলনও ছিল। বলিদ্বীপে এখনও হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য আছে।

যবদ্বীপে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব

যবদ্বীপে ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ছিল। শত শত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পুঁথি এখানে রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং আজও এই দুই মহাকাব্যের গল্প নিয়ে যবদ্বীপে নাটক, ছায়ানাট্য ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

উপসংহার

প্রায় দেড় হাজার বছরের বেশী সময় ধরে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প ও রাষ্ট্রব্যবস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জাতিসমূহের জীবন ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ ও প্রভাবের ফলে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেক অনুন্নত জাতি উচ্চতর সভ্যতার মানে পৌঁছতে পেরেছিল। যতদিন ভারতবর্ষের হিন্দু রাজ্যগুলি শক্তিশালী ছিল; ততদিন বহির্ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন প্রাণবন্ত ছিল। ভারতে হিন্দুযুগের অবসান বৃহত্তর ভারতেও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাধান্য লোপের সূচনা করেছিল। শুধুমাত্র দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, দূর প্রাচ্য এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি একসময়ে যেরূপ প্রসার লাভ করেছিল তা প্রাচীন ভারতের গৌরব ও মহত্ত্বের পরিচয় বহন করে।

মধ্য এশিয়া এবং চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কুষাণ যুগ থেকে বিস্তৃত হয়। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য গিয়েছিলেন।

বহির্জগতের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্জগতের বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় বণিকদের পণ্য বিক্রয় ও মশলা ক্রয়কে কেন্দ্র করেই ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভারতীয় বণিকরা যে মশলা ক্রয় করে নিয়ে আসত তা মধ্য-এশিয়ার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে তারা প্রচুর অর্থ রোজগার করত। এই ভারতীয় বণিকদের মধ্যে কিছু কিছু বণিক মনে করে যে তারা যদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দর এলাকায় বসবাস করতে পারে, তাহলে আরও বেশী ব্যবসা ও মুনাফা অর্জন করতে পারবে। এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বণিকদের বসবাস শুরু হয়।

ভারতীয় বণিকরা এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও যাতায়াত ও ব্যবসা শুরু করে। এর ফলে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক সম্পর্কই নয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কেরও সূচনা হয়। চীনে সিল্কের (রেশম) বিশেষ সমাদর ও চাহিদা ছিল। পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও চীনের মধ্যে যে সিল্কের ব্যবসা গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে ভারতীয় বণিকরাও জড়িত ছিল। একদিকে সুদূর পারস্য ও আরবদেশগুলির সঙ্গে এবং অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে ভারতীয় বণিকরা বিভিন্ন পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ে জড়িত ছিল। তারা পূর্ব আফ্রিকার বন্দরগুলিতে ব্যবসা বাণিজ্য করত।

মধ্য এশিয়া, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, মালয়, শ্যাম, কম্বোডিয়া, চম্পা, জাভা, সুমাত্রা, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে এবং সিংহলের (শ্রীলঙ্কা) সঙ্গে প্রাচীন যুগ থেকেই সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বহু উল্লেখ সাহিত্য, শিলালিপি, তাম্রলিপি, পুরাতত্ত্ব ও বৈদেশিক বিবরণীতে রয়েছে। বহির্বিশ্বের এইসব দেশগুলিকে **দ্বীপান্তর ভারত** বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে

নতুন (অভূতপূর্বম) এবং পুরাতন (ভূতপূর্বম) উপনিবেশ গড়ে ওঠার উল্লেখ আছে। জনৈক গ্রীক নাবিকের লেখা গ্রন্থ 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান্'-এ পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের উপকূলে বন্দরের উল্লেখ আছে। টলেমির ভৌগোলিক বৃত্তান্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলির সঙ্গে গঞ্জাম উপকূলের পালুয়া (গোপালপুর) বন্দরের বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথা রয়েছে। দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতেও বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাহিনী রয়েছে। 'মণিমেকলাই' ও 'শিলপ্পডিকারম' নামে দুটি প্রাচীন তামিল গ্রন্থেও সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কাহিনী বর্ণিত আছে। লোকগাথাতেও এই রকম প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে বহু শতাব্দী ধরে বহু কাহিনী রয়েছে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের সামুদ্রিক যোগাযোগ এবং স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাজ্য ও রাজন্যবর্গের (যেমন গুপ্ত বা চোল) সাফল্য ও বৈভবের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। আর এই সমৃদ্ধির পিছনে ছিল অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সাফল্য। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন জাহাজে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন দুশো ব্রাহ্মণ বণিক। এর থেকে বোঝা যায় যে গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণরাও শুধু পৌরোহিত্যের কাজ না করে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছিলেন।

চোল আমলে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মশলা, চন্দন কাঠ, মুক্তা, সূতীবস্ত্র, হাতীর দাঁতের জিনিস, কর্পূর প্রভৃতি রপ্তানি হত। আরবদেশ থেকে উচ্চমানের ঘোড়া আমদানি করা হত।

দশম শতাব্দীর আরব ভৌগোলিক 'মাসুদি' তাঁর গ্রন্থে সুদূর সাগরপারের দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা লিখেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত, উড়িষ্যার পালুয়া এবং মসুলিপত্তন ও পশ্চিম ভারতের ব্রোচের কাছাকাছি কয়েকটি বন্দর।

মধ্যকালীন ভারত (১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত)

প্রথম অধ্যায় | ভারতে ইসলামের অভ্যুদয়

মধ্যকালীন ভারত—তাৎপর্য ও বিশ্লেষণঃ

বিভিন্ন সময়ে শাসক শক্তির বংশপরম্পরার উত্থান, পতন ও অবক্ষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে ভারতের ইতিহাসকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা :—(১) প্রাচীন যুগ (প্রচীন ভারত) (২) মধ্য যুগ (মধ্যকালীন ভারত) (৩) আধুনিক যুগ। (আধুনিক ভারত)

প্রাচীন যুগ, আর্যশক্তির অনুপ্রবেশ বা সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ থেকে উত্তর ভারতে তুর্কী আক্রমণের সময় পর্যন্ত (১০০০ খ্রীঃ)। এরপর মধ্যকালীন যুগের সূচনা হয় এবং এই যুগের শেষ ধরা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বৃটিশ শক্তির অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন শাসক শক্তির উত্থান ও পতনকে যুগ বিভাগের একমাত্র কারণ হিসাবে ধরা যায় না। এর সঙ্গে আভ্যন্তরীণ কারণগুলিও বিবেচনা করা উচিত। সেজন্য তাঁরা মধ্যকালীন যুগের আরম্ভ ১০০০ খ্রীঃ থেকে না করে ৮০০ খ্রীঃ থেকে করার পক্ষপাতী।

এখন মধ্যকালীন ভারতকে কেন মুসলিম ভারত বলা হবে না এর বিশ্লেষণ করতে গেলে নিম্নোক্ত কারণগুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

ইতিহাস শুধু রাজা মহারাজার কাহিনী নয়। সভ্যতার বিকাশে মানুষের নিরন্তর অগ্রগতির প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ইতিবৃত্তই হল ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু। ইতিহাসের এই ধারা বা গতি নিরবিচ্ছিন্ন। কখনই তা থেমে থাকেনি বা থাকে না। সেই বিচারে ইতিহাসকে 'হিন্দু' বা 'মুসলমান' তো নয়ই এমন কি 'প্রাচীন' ও 'মধ্য' বলেও ভাগ করা সম্পুর্ণ যুক্তি সংগত নয়। ইতিহাসের গতি ও চরিত্র নিয়ন্ত্রণে ধর্ম অবশ্যই অন্যতম শক্তিরূপে কাজ করে। কিন্তু একমাত্র শক্তিরূপে নয়। অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ও বিবর্তনের উপর ইতিহাসের গতি প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেজন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলি যুগ পরিবর্তনের মূলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং শাসক শক্তির উত্থান ও পতনের সঙ্গে ধর্মকে যোগ করে ভারতীয় ইতিহাসের যুগ বিভাগ করা অসমীচীন হবে।

মধ্যকালীন ভারতে মুসলমানরাই ছিলেন অন্যতম শাসক বা রাজনৈতিক শক্তি। এই মুসলমান শাসক কর্তৃত্বের সঙ্গে আঞ্চলিক সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির বিবাদ মূলতঃ ধর্মভিত্তিক ছিল না। শুধু স্থানে স্থানে ধর্ম অন্যান্য কারণগুলিকে সহায়তা করেছে। রাজপুত, শিখ, মারাঠা, বিজয় নগর রাজা, এই শক্তিগুলির গুরুত্ব মধ্যকালীন ভারতে

কম ছিল না। মুসলমান শাসকদের সব নীতি ও কার্যকলাপ একমাত্র ধর্মীয় চিন্তা বা স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা ও স্বার্থ রক্ষার চিন্তা বহু সময়ই ধর্মীয় চিন্তার থেকেও প্রাধান্য পেয়েছিল।

বৃটিশ শাসনের সামগ্রিক বৈদেশিক রূপটি মুসলমান শাসনে পরিলক্ষিত হয় না। ইংরাজরা কখনও ভারতকে স্বদেশভূমি মনে করেনি। মুসলমান শাসকেরা কিন্তু ভারতবর্ষকেই তাঁদের স্বদেশ করে নিয়েছিলেন। এদেশের অর্থ তাঁরা নিজেদের দেশে পাঠাতেন না। শেষ পর্যন্ত এদেশের জনগণের সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে মুসলমানরা ভারতীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

ভারতীয় ইতিহাসে হিন্দু, মুসলিম, বৃটিশ এই তিনটি যুগ-বিভাগ কঠোর ভাবে মেনে নিলে ভারতীয় সংস্কৃতির বহমান চিরন্তন রূপটি, যা সিন্ধু সভ্যতা থেকে চলে আসছে তাকে উপেক্ষা করা হয়। ভারতের নানা জাতি, নানা মত, নানা সম্প্রদায় ও নানা ধর্মের বিবিধের মধ্যে যে মিলন তাকেও অস্বীকার করা হয়। ভারতীয় জন জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিবৃত্ত এই সাম্প্রদায়িক যুগ-বিভাগে প্রতিফলিত হয় না।

ধর্ম ভিত্তিক যুগ বিভাগ বিচ্ছিন্নতাবাদকে গুরুত্ব দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার পটভূমিকা প্রস্তুত করে। সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার পথ সুগম করে দেয়।

সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের যুগ বিবর্তনকে ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধীভূত করে মধ্যকালীন ভারতকে মুসলিম ভারত বলা অপেক্ষা **মধ্যকালীন ভারত বলাই যুক্তিগ্রাহ্য।**

সুলতানী আমলের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা বেশী ইতিহাস-চেতনার প্রমাণ রেখে গেছেন। সুলতানী আমলে ফার্সী ভাষায় প্রচুর ইতিবৃত্ত লেখা হয়েছিল। মিনহাজ-উস্-সিরাজ তাঁর 'তবকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে এবং হাসান নিজামী তাঁর 'তাজ-উল-মাসীর' গ্রন্থে দাস রাজবংশের ইতিহাস লিখেছেন। 'তবকৎ ই-নাসিরি' সুলতানী আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। জিয়াউদ্দীন বরনী মহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ শাহের রাজত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী' গ্রন্থে। তুঘলক আমল সম্বন্ধে জানবার আর একটি উৎস হল ইবন বতুতার 'সফরনামা।' ফিরোজ শাহ নিজে তাঁর রাজত্বকাল ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইসামি রচিত ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ 'ফুতুহা-উস্-সুলতানী' থেকে সুলতানী আমলের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কিছু আভাষ পাওয়া যায়। ইয়াহিয়া-বিন-আহমদ শিরহিন্দির 'তারিখ-ই মুবারকশাহী' (১৪০৪-৩৪ খ্রীঃ) সুলতানী আমলের একটি নির্ভর যোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস

সুলতানী আমলের বিখ্যাত কবি আমির খুসরভ গিয়াসুদ্দিন বলবনের সমসাময়িক

ছিলেন এবং গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সভাকবি ছিলেন। তাঁর রচনা 'তুঘলক নামা' থেকে সুলতানী আমলের অবস্থা, বিশেষ করে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্ব কাল সম্বন্ধে জানা যায়।

সুলতানী আমলে পাশ্চাত্যদেশের বহু পর্যটক, বণিক ও ধর্মযাজক এসেছিলেন। তাঁদের লেখা বিবরণগুলি সে যুগের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। এই গ্রন্থগুলিতে তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চিত্রের পরিচয় আছে। প্রাক্-মুঘল যুগের বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে আল-বেরুণী নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর রচিত 'তহকক্-ই-হিন্দ' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো, মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবন্ বতুতা, ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কণ্টি, পারস্য দেশীয় আবদুর রজ্জাক এবং রুশ দেশীয় পর্যটক আথেনুসিয়াস নিকিতিনের বিবরণ থেকে সুলতানী যুগের দেশ, সমাজ ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানা যায়। মহুয়ান নামে এক চৈনিক পরিব্রাজক পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে সমসাময়িক বাংলাদেশের অবস্থা জানা যায়।

বৈদেশিক বিবরণ

ভারতে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ, আরবদের সিন্ধু বিজয় ও তার প্রতিক্রিয়া

এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে আরবের মক্কা নগরীতে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের জন্ম হয় ৫৭০ খ্রীস্টাব্দের কোনো এক সময়ে। তিনিই ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা। ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে খলিফারা ইসলামের নেতৃত্ব দেন।

হজরত মহম্মদের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা আরব জাতির মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় ভাব সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীস্টাব্দ) একশো বছরের মধ্যে খলিফাদের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত আরবরা পরাক্রান্ত সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম থেকেই আরবরা পশ্চিম ভারতে বিক্ষিপ্ত উপদ্রব করলেও ভারতে আরব বা মুসলমান বিজয়ের প্রকৃত সূচনা করেন ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজের সেনাপতি মহম্মদ-বিন কাশিম। তিনি ৭১২ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে দাহির নিহত হন। দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর বীর পত্নী অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও রাত্তর দুর্গ রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় নিজের সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য জহর ব্রত পালন করে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। অবশ্য সিন্ধুদেশে আরব শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চালুক্য, প্রতিহার, কার্কট রাজারা আরবদের রাজ্য বিস্তারের অগ্রগতি রোধ করেন।

মহম্মদ-বিন কাশিম

ভারতে আরব অধিকারের কোনো সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়

নি। কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচার করলে আরব অধিকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আরবরা হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিবেশী সুলভ মনোভাব নিয়ে শান্তি ও মৈত্রীর সহিত বসবাস করত। তারা হিন্দুদের নিকট হতে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেছিল। এইসব বিদ্যা ও জ্ঞান তারা শুধু নিজের দেশেই নয় ইউরোপীয় দেশেও প্রচার করেছিল। আমীর খুসরুভের লেখা থেকে জানা যায় যে আরব জ্যোতির্বিদ আবু মাসার বারাণসীতে থেকে দশবৎসর জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের উত্থান

ভারতে মুসলমান বিজয়ের সূচনা

মহম্মদ-বিন কাশিমের নেতৃত্বে দাহিরের পরাজয় ও মৃত্যুর পর অবশ্য সিন্ধুদেশে আরব শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

সবুক্তগীন

ভারতে মুসলমান বিজয়ের পরের অধ্যায়ের নায়ক আফগানিস্তানের গজনী রাজ্যের অধিপতি সবুক্তগীন। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (৯৬২ খ্রীস্টাব্দ) তুর্কী ক্রীতদাস আলপ্তিগীন। তাঁর জামাতা ও ক্রীতদাস সবুক্তগীন ছিলেন সাহসী সমরনায়ক। তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের হিন্দু শাহীবংশীয় রাজা জয়পালকে পরাজিত করে তিনি ভারতবর্ষে তুকী সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ দেখিয়েছিলেন।

মুসলমান অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

তুকী আক্রমণের ঠিক পূর্বে দশম শতকের শেষে, একাদশ শতকের প্রথম দিকে উত্তর ভারতে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। স্বভাবতঃ বিচ্ছিন্ন ভাবে কোনো বড় আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা এদের ছিল না।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পাঞ্জাবে হিন্দু শাহীবংশ রাজত্ব করত। শাহী বংশের রাজা ছিলেন জয়পাল। এই শাহী বংশের পতন ঘটিয়ে গজনীর সবুক্তগীন ও মামুদ ভারতে তুকী রাজনৈতিক শক্তির অনুপ্রবেশের পথ সুগম করে। এই সময়ের উত্তর ভারতের প্রধান রাজপুত রাজ্যগুলি হল : কনৌজের গহদভল রাজ্য, গুজরাটের চালুক্য রাজ্য, মালবের পরমার রাজ্য, দিল্লী-আজমীরের চহমন বা চৌহান রাজ্য। এদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। মধ্য ভারতে বুন্দেলখণ্ড এলাকায় চন্দেল্লরা, জব্বলপুর এলাকায় কালচুরিরা, দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে ছিল যাদবেরা, দ্বারসমুদ্রে হয়সলরা, ওয়ারাঙ্গালএ কাকাতিয়রা আর মাদুরায় ছিল পাণ্ড্যরা। বাংলাদেশে তখন ছিল সেনেরা। ঐক্যের অভাবে মামুদের আক্রমণে রাজপুত রাজ্যগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মামুদ (৯৯৮-১০৩০ খ্রীঃ) ভারতের হিন্দু রাজাদের ঐশ্বর্য লুণ্ঠন ও পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ এই দুটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে সতের বার ভারত

অভিযান করেন। কিন্তু এদেশের কোন অংশ তিনি গজনী রাজ্যভুক্ত করেননি। প্রথমে জয়পাল ও পরে তাঁর পুত্র আনন্দপাল তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ

আনন্দপালের পরাজয়ের পর শাহীবংশের বিলোপ ঘটে, কিন্তু তাঁদের শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থান লাভ করে। সুলতান মামুদ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুলতান, থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা প্রভৃতি নগর অধিকার ও লুণ্ঠন করেন এবং তাঁর আক্রমণের ফলে বহু নর-নারী নিহত হয়। ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম ভারতের কাথিয়াবাড়ের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির তিনি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। চালুক্য রাজ্যের গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের সমুদ্রতীরে সোমনাথ মন্দির অবস্থিত ছিল। বহু বৎসর ধরে এই মন্দিরে প্রচুর সম্পদ জমা হয়েছিল। সুলতান মামুদ সমস্ত বাধা জয় করে সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করে প্রচুর মহামূল্য ধনসম্পদ নিয়ে যান।

উত্তর পশ্চিম ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জাবের হিন্দু শাহী রাজবংশ ও মুলতানের পতন ঘটিয়ে গজনীর সুলতান মামুদ আফগানিস্থান থেকে ভারতে তুর্কী রাজনৈতিক শক্তির অনুপ্রবেশের পথ পরিষ্কার করে দেন। মামুদের ইসলাম ধর্ম প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতের ইতিহাসে নির্মম, লোভী লুণ্ঠনকারীরূপেই মামুদ পরিচিত হয়েছেন। তিনি বারংবার সামরিক অভিযান চালিয়ে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলি থেকে প্রভূত পরিমাণে ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। সেজন্য ঐসব অঞ্চলের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়। এর ফলে পরবর্তি মুসলমান আক্রমণের পথ সুগম হয়। সমসাময়িক ইতিহাসে মামুদ একজন কুশলী সমরবিশারদ সেনানায়ক রূপে প্রখ্যাত হন। মামুদের অভিযানের কোনো স্থায়ী ফল হয়নি।

মামুদের ভারত অভিযানের ফল

১১৮৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ পর্যন্ত মামুদের বংশধরেরা পাঞ্জাবে রাজত্ব করেন। মামুদের আক্রমণে রাজপুত শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, যদিও তারা ঘোরীর আক্রমণ পর্যন্ত নিজেদের রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করে।

মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকরা সুলতান মামুদকে ইসলাম ধর্মের রক্ষক এবং পারসিক সংস্কৃতির উজ্জীবনের বিশিষ্ট নায়করূপে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 'শাহনামা'র রচয়িতা ফরদৌসী ছিলেন তাঁর সভা-কবি। ফারুক্কীও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন।

আলবেরুণী

আলবেরুণী নামে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সুলতান মামুদের রাজসভায় ছিলেন। তিনি অবশ্য মামুদের সভায় যথাযোগ্য সম্মান পাননি। তবে সুলতানের পুত্র মাসুদের নিকট হতে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। আলবেরুণী ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর 'তহকিক্-ই-হিন্দ' গ্রন্থে সমসাময়িক কালের ভারতীয় দর্শন, জ্যোতিবিদ্যা, গণিত, রসায়ন ও হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

আলবেরুণীর মতে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য ছিল ও উত্তর পশ্চিম ভারতে বিদেশীদের অপবিত্র মনে করা হত।

সামরিক অভিযান ও সাম্রাজ্য ও প্রতিষ্ঠা

ঘুর বংশ (ঘোর রাজ্যের তুর্কী শাসক শক্তি)ঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গজনী ও হিরাটের মাঝখানে অবস্থিত ঘোর নামে একটি ছোট পার্বত্য দেশের তুর্কী শাসকরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত গজনী রাজ্য ঘোর রাজ্যভুক্ত হয়। এই ঘোর রাজ্যের এক শাসক মহম্মদ ঘোরী (সাহাবুদ্দীন মহম্মদ বা মুউজুদ্দীন মহম্মদ বিন্ সাম নামেও পরিচিত) কিছুকাল পরে উত্তর ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মহম্মদ ঘোরী (১১৭৩-১২০৬)

তুর্ক-আফগান বা সুলতানী সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

দাসবংশের শাসনঃ মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর (১২০৬) তাঁর বিশাল সম্রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দিল্লীকে কেন্দ্র করে ভারতে মুসলমান-বিজিত প্রদেশগুলির 'সুলতান' রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন **কুতবউদ্দীন**। গজনী রাজ্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং এর ফলে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য স্বতন্ত্র পথে চালিত হতে থাকে। কুতবউদ্দীন ছিলেন মহদম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস। তাঁর পরবর্তী দুই সুলতান **ইলতুৎমিস** এবং **গিয়াসউদ্দীন বলবন** ক্রীতদাস ছিলেন। সেইজন্য কুতবউদ্দীন-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ভারতের ইতিহাসে **দাসবংশ** (Slave Dynasty) নামে পরিচিত হয়। 'দাসবংশ' নামকরণ বহুল প্রচলিত হলেও সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। এই বংশের (১২০৬-১২৯০) মোট এগারজন শাসকের মধ্যে মাত্র তিনজন ক্রীতদাসরূপে তঁদের জীবন সুরু করেন। এঁদের মধ্যে আবার ইলতুৎমিস ও বলবন সুলতান হবার পূর্বেই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাছাড়া এই এগারজনের সকলেই একই বংশজাত ছিলেন না। সুতরাং 'দাসবংশ' কথাটির প্রয়োগ সঠিক নয়।

কুতবউদ্দীন আইবক কর্তৃক দাসবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা

কুতবউদ্দীন আইবক (১২০৬-১২১০) মাত্র চার বছর রাজত্ব করেছিলেন। বিহারের শাসনকর্তা ইলতুৎমিসের সঙ্গে তিনি তাঁর কন্যার বিবাহ দেন। কুতবউদ্দীন তাঁর উদারতা ও দানশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। দিল্লী ও আজমীরের দুই মসজিদ এবং বিখ্যাত মুসলিম সাধক খাজা কুতবউদ্দীনের নামে নির্মিত দিল্লীর বিখ্যাত কুতব মিনারের নির্মাণকার্য তাঁর সময়েই শুরু হয়েছিল।

কুতবউদ্দীন (১২০৬-১২১০)

কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে রাজ্যে সঙ্কট দেখা

দেয়। শেষ পর্যন্ত দিল্লীর ওমরাহদের আহ্বানে কুতবউদ্দীনের জামাতা ইলতুৎমিস সিংহাসনে বসেন। এর ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভের নীতি বর্জিত হয়। ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬) বুদ্ধি ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ ও অরাজকতা দূর করতে সক্ষম হন। গজনীর অধিপতি তাজউদ্দীনের আক্রমণ ব্যর্থ করে তিনি তাঁকে পরাজিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বা মুঘল জাতির নেতা চিঙ্গীজ খাঁ তাঁর বাহিনী নিয়ে সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হন ও পাঞ্জাব লুঠ করেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে ফিরে যান। ইলতুৎমিস সিন্ধু, রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র, মালব ও বাংলাদেশে মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে মুসলমান জগতের প্রধান বোগদাদের খলিফা তাঁকে আশীর্বাদ ও স্বীকৃতি জানালে ইলতুৎমিসের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি সিংহাসনে না বসলে খুব সম্ভবতঃ সুসংবদ্ধ ও সুবিস্তৃত সুলতানী সাম্রাজ্য গড়ে উঠত না। তিনি সুসংহত অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। ইলতুৎমিসের বুদ্ধি ও বাহুবলে সুলতানী সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত মুসলমান সাধক, খাজা কুতবউদ্দীন বখতিয়ার কাকীর সম্মানে নির্মিত কুতব মিনারের নির্মাণকার্য শেষ করেছিলেন। তাঁর আমল থেকেই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় ও হরফে মুদ্রাঙ্কন সুরু হয়। ইলতুৎমিস দিল্লীর রাজদরবারকে মুসলমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।

ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬)

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইলততুৎমিস তাঁর অযোগ্য পুত্রদের পরিবর্তে গুণবতী কন্যা রাজিয়াকে নিজের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, মনোবল ও যোগ্যতা সত্ত্বেও রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০) শান্তিতে রাজ্য শাসন করতে পারেননি। যদিও পূর্ববর্তীকালে পারস্য এবং মিশরে নারী শাসনের দৃষ্টান্ত ছিল, তবুও একজন মুসলমান রমণীর দরবারে উপস্থিতি, সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বদান ও রাজ্যশাসন এক শ্রেণীর ওমরাহদের এবং উলেমাদের পক্ষে অসহনীয় ছিল। এরই পরিণতিরূপে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অন্যতম বিদ্রোহী নেতা আলতুনিয়াকে বিবাহ করেও রাজিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন। তিনি ও তাঁর স্বামী দুজনেই শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এই একবারই মাত্র দিল্লীর সিংহাসনে কোন নারী বসেছিলেন। তাঁর স্বল্পকাল শাসনে রাজিয়া নির্ভিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং প্রজা-হিতৈষণার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর রাজত্বকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে এই সময় থেকেই সুলতান এবং শক্তিশালী তুর্কী ওমরাহদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ক্ষমতা মদমত্ত ওমরাহদের হাতে ক্রীড়নক হতে অস্বীকার করার জন্যই রাজিয়াকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

সুলতানা রাজিয় (১২৩৬-১২৪০)

রাজিয়ার মৃত্যুর পর রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। মুইজউদ্দীন বহরাম (১২৪০-১২৪২) ও আলাউদ্দীন মাসুদের (১২৪২-১২৪৬) অযোগ্য শাসনের পর ইলতুৎমিসের এক পুত্র **নাসিরউদ্দীন মামুদ** সুলতান হন। তাঁর শাসনকালে (১২৪৬-১২৬৬) সীমান্ত অঞ্চলে বারবার মোঙ্গল আক্রমণ ও রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে থাকে। ধর্মানুরাগী, শান্তিপ্রিয় নাসিরউদ্দীনের রাজ্যশাসনের কোন যোগ্যতা ছিল না।

নাসিরউদ্দীন (১২৪৬-১২৬৬)

অপুত্রক নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর ও প্রধানমন্ত্রী উলুঘ খাঁ **গিয়াসউদ্দীন বলবন** (১২৬৬-১২৮৭) নাম নিয়ে দিল্লীর সুলতান হন। ওমরাহদের ক্ষমতা হ্রাস করে রাজশক্তির নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ও কঠোরভাবে ওমরাহদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করেন। অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে প্রায়ই মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হত। বলবনের কঠোর নীতির ফলে রাজশক্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। তিনি নিজেকে "ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও ছায়া" রূপে প্রতীয়মান করেন এবং সকলকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করান যে তাঁর সমতুল্য কেউ সাম্রাজ্যের মধ্যে নেই। আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের রীতি পালিত হয়। তিনি ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। মদ্যপান ও জুয়াখেলা নিষিদ্ধ হয়।

গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

ওমরাহদের ক্ষমতা হ্রাসের ব্যবস্থা

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন: বলবন দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর মেওয়াটি ও কচ্ছী দস্যুদের এবং দোয়াব ও রোহিলাখণ্ডের বিদ্রোহী হিন্দুদের দমন করেছিলেন। তিনি জুদ পার্বত্য উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন। রাজ্যে চোর-ডাকাতের উপদ্রবও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গুপ্তচর ও সংবাদ প্রেরকরা নিয়মিত ভাবে তাঁকে রাজ্যের খবরাখবর প্রেরণ করত। সৈন্যবাহিনীর সংস্কার করে তিনি তাঁর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং বিশ্বস্ত সেনানায়কদের অধীনে পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন।

সামরিক সংস্কার ও রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

তিনি দিল্লীর নিকট কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। ভবিষ্যতে অরাজকতা ও বিদ্রোহের আশঙ্কা দূর করার জন্য তিনি 'গোপাল গির', 'কাম্পিল', 'পাতিয়ালি' ও ভোজপুরে দুর্গ নির্মাণ করেন ও 'জালালি'র দুর্গটির সংস্কার করেন।

বলবনের রাজত্বকালের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলার শাসনকর্তা **তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ** (১২৭৫-১২৭৯)। তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর বলবন নিজে সসৈন্যে বাংলায় গিয়ে তুঘ্রিলকে পরাজিত ও নিহত করেন। বিদ্রোহীদের নির্মম শাস্তি দিয়ে তিনি বিদ্রোহের পরিণাম সম্বন্ধে সকলের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন।

বঙ্গদেশে তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন

বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধঃ মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করে বলবন দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। চিঙ্গীজ খাঁর মৃত্যুর (১২২৬) প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা দূর হয়নি। নাসিরউদ্দীনের শাসনকালেই সেনাপতিরূপে বলবনকে সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে তৎপর হতে হয়েছিল। কিন্তু রাজধানী দিল্লীতে মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সুলতান হওয়ার পর বলবন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কূটনীতি ও সীমান্ত সুরক্ষা এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি—উভয়েরই আশ্রয় নেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভাতিন্দা, সুনাম এবং সমনা প্রভৃতি দুর্গগুলি তিনি আরও সুরক্ষিত করে তোলেন। তিনি নিজে রাজধানী দিল্লী থেকে দূরাঞ্চলে কোনও অভিযানে যেতেন না। রাজধানীতে বসে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন ও প্রয়োজন বোধে নিজে সেনাদল নিয়ে এগিয়ে যেতেন।

মোঙ্গলনীতি

১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গলরা আক্রমণ করে শতদ্রু পার হয়ে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে, বলবনের পুত্র মুলতানের শাহাজাদা মহম্মদ ও সমনার বুগরা খাঁন মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের পর্যুদস্ত করে।

মোঙ্গলরা পুনরায় ১২৮৫ খ্রীস্টব্দে পাঞ্জাব আক্রমণ করে। এই সময়ে সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহাজাদা মহম্মদ মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে প্রাণ হারান। অশীতি পর বৃদ্ধ সুলতান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে দারুণ শোকাহত হন। বলবন তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খানকে সিংহাসনে বসাতে চান। কিন্তু বুগরা খান অনিচ্ছা প্রকাশ করলে, বলবন তাঁর পৌত্র কাইখুসরভকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ

অন্যদিকে পারস্য ও প্রতিবেশী অঞ্চলের মোঙ্গল শাসকদের সঙ্গে তিনি কূটনৈতিক সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকেন। সীমান্ত অঞ্চলে মোঙ্গল সমস্যার পূর্ণ সমাধান না হলেও বলবনের নীতি সামগ্রিক ভাবে সফল হয়েছিল ও মোঙ্গলরা দিল্লী আক্রমণ থেকে বিরত ছিল। বলবন উপলব্ধি করেছিলেন যে অকারণ রাজ্যজয়ের জন্য শক্তির অপচয় করার থেকেও সাম্রাজ্যের সংহতি, স্থিতি ও নিরাপত্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া ঢের বেশী প্রয়োজন। কিন্তু এত ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও মোঙ্গল আক্রমণ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি।

বলবন ছিলেন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম। পূর্ববর্তী সুলতান নাসিরউদ্দীনের রাজত্বের সূচনা (১২৪৬) থেকেই তিনি প্রকৃতপক্ষে সুলতানী সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। বলবন সাম্রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা সুসংগঠিত করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর শাসন অত্যন্ত কঠোর ও কোন কোন ক্ষেত্রে নৃশংস মনে হলেও সমসাময়িক যুগ ও পরিস্থিতির বিচারে বলবনের নীতি ও কার্যাবলীর যৌক্তিকতা ছিল। অন্য কোন সহজ উপায়ে ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করে রাজ-শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। সামরিক সংস্কার,

বলবনের কৃতিত্ব

সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তিনি অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। কবি আমীর খুসরভ ও ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন সিরাজ তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। ইলতুৎমিস ও বলবনের কৃতিত্বের তুলনামূলক বিচার করা যুক্তিসংগত নয়। উভয়েই ভিন্ন পরিবেশে ও ভিন্ন ক্ষেত্রে দাস বংশের নিরাপত্তা, ক্ষমতা ও মর্যাদাবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিলেন। ইলতুৎমিস ও বলবন সুলতানী সাম্রাজ্যকে আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। উভয়েই রাজ্যবিস্তার, সংগঠন ও শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু ইলতুৎমিসের কৃতিত্ব বিচারের সময় বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তাঁর মতো অসাধারণ যোগ্য ব্যক্তি সিংহাসনে না বসলে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য আদৌ গড়ে উঠত কিনা সন্দেহ আছে।

দাস বংশের পতন

বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর অযোগ্য পৌত্র কায়কোবাদ তিন বছর (১২৮৭-১২৯০) রাজত্ব করেন। রাজ্যে আবার অরাজকতা, ষড়যন্ত্র ও ওমরাহদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এই সুযোগে কায়কোবাদের সেনাপতি জালালউদ্দীন খলজী কায়কোবাদ ও তাঁর শিশুপুত্রকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে দাসবংশের শাসনের অবসান হয়।

খলজী সাম্রাজ্যবাদ

জালালউদ্দীন খলজী (১২৯০-১২৯৬)

খলজী বংশের শাসনঃ জালালউদ্দীন খলজী (১২৯০-১২৯৬) খলজী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। খলজীরা তুর্কীজাতীয় ছিল। কিন্তু তারা দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বাস করেছিল বলে দিল্লীর তুর্কীরা তাদের খাঁটি তুর্কী বলে মানত না। আফগান বা পাঠান বলে মনে করত। জালালউদ্দীনের রাজত্বকালে মোঙ্গলরা আবার ভারত আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। বিজিত মোঙ্গলদের জালালউদ্দীন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দিল্লীর কাছে বসবাস করার অনুমতি দেন। তারা 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত হয়। জালালউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন খলজী মালব ও ভিলসা আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। দাক্ষিণাত্য অভিযান করেও তিনি বিপুল সম্পদ লাভ করেন। এরপর কোমলপ্রাণ স্নেহান্ধ জালালউদ্দীনকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬)

আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬) নির্মমভাবে শত্রুহত্যা ও অকাতরে অর্থব্যয় করে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের মত দিগ্বিজয়ী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু তিনি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় ভারতবর্ষের মধ্যেই তাঁর রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্য-বিস্তার সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। ১২৯৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সৈন্যবাহিনী

গুজরাটের রাজা কর্ণকে পরাজিত করে ঐ অঞ্চলে সমৃদ্ধ বন্দরগুলি লুঠ করে। খলজী বাহিনীর হাতে বন্দীদের মধ্যে ছিলেন রাণী কমলাদেবী ও মালিক কাফুর। কমলাদেবী পরে আলাউদ্দীনের মহিষী এবং কাফুর সুলতানের প্রিয় সেনাপতি হয়েছিলেন। উত্তর ভারতে আলাউদ্দীনের অন্যান্য সাফল্যের মধ্যে ছিল রাজপুতানার রণথম্ভোর দুর্গ জয় (১৩০১) এবং চিতোর আক্রমণ ও অধিকার (১৩০৩)। টডের রাজস্থান সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে চিতোরের রাণা ভীম সিংহের পত্নী পদ্মিনীর অসামান্য রূপে আকৃষ্ট হয়েই আলাউদ্দীন চিতোর জয় করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু চিতোর অধিকার করলেও পদ্মিনী ও অন্যান্য রাজপুত নারীরা জহরব্রত করে আত্মাহুতি দেওয়ায় আলাউদ্দীনের মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। এই জনপ্রিয় কাহিনীর মধ্যে অসংগতি আছে এবং এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা সে বিষয়ে আধুনিক গবেষকরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। এরপর ক্রমে ক্রমে মালবের মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধার, চন্দেরী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি খলজী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার

উত্তর ভারত জয় প্রায় সমাপ্ত হলে আলাউদ্দীন দক্ষিণ ভারত জয়ে উদ্যোগী হন। দাক্ষিণাত্য অভিযানের নায়ক ছিলেন মালিক কাফুর। মোট চারবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করে এবং সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে খলজী বাহিনী দেবগিরির যাদব রাজ্য, বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য, দ্বারসমুদ্রের (মহীশূর অঞ্চল) হোয়সল রাজ্য এবং মাদুরার পাণ্ড্য রাজ্য জয় করে। আলাউদ্দীন খলজীর উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জয়ের ফলে বহু শতাব্দীর পর ভারতবর্ষে আবার রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য দিকে দাক্ষিণাত্যে খলজী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের ফলে বহু রাজ্য, নগর ও মন্দির লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারত অভিযান

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আলাউদ্দীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পুরাতন দুর্গ সংস্কার করেন ও একাধিক নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সৈন্য-বাহীনী মোতায়ন করেন। একবার 'নব মুসলমান'দের ষড়যন্ত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে আলাউদ্দীন একদিনে তিরিশ হাজার লোককে হত্যা করেছিলেন।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ

আলাউদ্দীনের আমলে কেন্দ্রীয় শক্তির সমন্বয় ও সংহতি: কুতবুদ্দিন আইবেক থেকে বলবন পর্যন্ত সুলতানী সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রসার হয়নি। পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর এক বিরাট অংশ মোঙ্গলদের অধীনে ছিল। খলজীদের রাজনৈতিক শাসনাধিকার পশ্চিমে পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল এবং সিন্ধুর কিছু অংশে এবং পূর্বে বিহারে সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশ প্রায় সব সময়েই দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করত।

তখন দিল্লীর সুলতানী শাসনের কোন কেন্দ্রীভূত শক্তি ছিল না, যদিও অভিজাত রাজকর্মচারীরা ও আমীররা 'ইক্তা' (রাজস্বের অংশ মাহিনা হিসাবে পাওয়া) পেতেন এবং তাঁদের ওপর সুলতানী শাসনকর্তারা অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিলেন। সে সময় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলি স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। আলাউদ্দীন সাহসী এবং দক্ষ শাসক রূপে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সুলতানী সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে দমন করে এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করে সকল শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন।

আলাউদ্দীন ছিলেন শক্তিশালী, সাহসী, ধৈর্যশীল দক্ষ শাসক। সিংহাসনে আরোহণ করার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে পরপর কয়েকটি বিদ্রোহ দমদ করতে হয়।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন

প্রথম ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নব মুসলমানদের বিদ্রোহ, এরপর আলাউদ্দীনের ভাইপো 'আকাৎখানের' বিদ্রোহ। তারপর আলাউদ্দীনের দুই আত্মীয় মালিক উমর ও মঙ্গু খান বিদ্রোহ করেন। এরপর হাজিমৌলা নামে এক সেনাপতি দিল্লীর সিংহাসনের জন্য সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইতিমধ্যে সামন্তশক্তিগুলি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আলাউদ্দীন এই সকল বিদ্রোহ দমন করে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ দমনের পর আলাউদ্দীন তাঁর ঘনিষ্ঠ ওমরাহদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিদ্রোহের চারটি কারণ নির্ণয় করেন।

১। গুপ্তচর ব্যবস্থার সুষ্ঠু সুযোগ না থাকায় সুলতানের পক্ষে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের ঘটনাবলীর ওপর নজর রাখা সম্ভব হয়নি।

২। অত্যধিক মদ্যপান।

৩। আমীর ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা চক্রান্তের সুবিধা করে দিয়েছিল।

৪। প্রচুর অর্থের সচ্ছলতার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও শাসন ক্ষমতার লোভ চক্রান্তের জন্য দায়ী।

আলাউদ্দীন খলজীর চেষ্টায় সুলতানী সাম্রাজ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে এবং সর্বভারতীয় রূপ গ্রহণ করে। তাঁর প্রচেষ্টায় দিল্লীর সুলতানী একটি সার্বভৌম শক্তিশালী সুসংহত কেন্দ্রীয় শাসনাধীন সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

বার বার আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও গোলযোগে বিব্রত আলাউদ্দীন স্থায়ী প্রতিকারের

জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে রাজকার্যে প্রখর নজর রাখতেন ও গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। মদ্যপান এবং ওমরাহদের মধ্যে সামাজিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন। সুলতান নিজে একটি উদাহরণ স্থাপন করার জন্য মদ্যপান ত্যাগ করেন ও তাঁর পান-পাত্রগুলি ভেঙে ফেলা হয়। জনসাধারণের হাতে যাতে বেশী অর্থ না থাকে তার জন্য তিনি করের বোঝা বৃদ্ধি করেন। প্রজাদের আর্থিক সচ্ছলতা খর্ব করার জন্য তিনি যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, তার ফলে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। আলাউদ্দীনের বিশাল সামরিক বাহিনীর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হত। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্রের দাম যাতে কম থাকে তার জন্য তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন সুলতান নিজে এবং তিনি যা ভাল মনে করতেন তাই করতেন। অন্য কারোর প্রভাব বা পরামর্শ তিনি পছন্দ করতেন না। এর ফলে তাঁর রাজত্বকালে মুসলমান ধর্মযাজক বা উলেমাদের ক্ষমতা অনেকখানি কমে গিয়েছিল।

রাজ্যশাসন

খাদ্যদ্রব্য ও জিনিস-পত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব

অর্থনৈতিক সংস্কার ও তার ফলঃ আলাউদ্দীন তাঁর রাজত্বকালে কতকগুলি অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন।

১। মোঙ্গল আক্রমণ রাজ্যবিস্তার এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য আলাউদ্দীনকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করতে হয়েছিল। এই সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই সময় দাক্ষিণাত্য থেকে প্রচুর সম্পদ আহরণ করায় এবং যুদ্ধের জন্য সীমান্তের পথঘাট বন্ধ থাকায় মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার ফলে মুদ্রামূল্য কমে যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আলাউদ্দিন মুদ্রাস্ফীতির জন্য সৈন্যদের বেতন না বাড়িয়ে আবশ্যকীয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন, যাতে ঐ বেতনে (২৩৪ তঙ্খা হারে সৈন্যরা বেতন পেত) সেনাদল তাদের জীবনযাত্রা সচ্ছলভাবে নির্বাহ করতে পারে। এই ধরনের প্রয়াস আলাউদ্দীন প্রথম প্রবর্তন করেন।

২। আলাউদ্দীনের সময় নিয়ন্ত্রিত বাজার চার ভাগে বিভক্ত ছিল, যথাঃ (ক) খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার, (খ) সারাই-অদল (Sarai Adl)—বুদাউন গেটের ভিতর একটি খোলা জায়গা। এখানে বণিক ও ব্যবসায়ীরা শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করত এবং এখানে বিক্রয়ের জন্য অনেক দ্রব্য বাইরে থেকে আসত। সুলতান এইসব দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। এখানে আগত বণিক ও ব্যবসায়ীদের নাম নথিভুক্ত করা হত। (গ) অশ্ব, গবাদি পশু ও ক্রীতদাসদের বাজার নিয়ন্ত্রিত ছিল। (ঘ) সাধারণ বাজারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হত।

৩। তিনি কিছুটা বর্তমান কালের রেশনিং এর মতো খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের বরাদ্দের পরিমান প্রথা চালু করেন।

৪। আমীর, ওমরাহ ও উচ্চ রাজকর্মচারীদের ধন সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে আলাউদ্দীন কতকগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি হিন্দু, মুসলমান ভেদাভেদ করেননি। গ্রামের জমিদার, মোড়ল, রাজস্ব আদায়কারী—যারা কৃষকদের কাছ থেকে গুরুভার কর আদায় করত ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অমান্য করত, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হত। সুলতান সমস্ত রকমের ভাতা বন্ধ করে দেন এবং জায়গীরদারী ইত্যাদি নাকচ করেন।

৫। আলাউদ্দীন সরকারের অধীনে অনেক জমি খাস (খালিসা) করে নিয়েছিলেন। তিনি জমির উৎপন্ন ফসলের ওপর শতকরা ৫০ ভাগ খাজনা ধার্য করেন। জমি ছাড়া গবাদি পশুর চারণভূমির ওপর রাজস্ব আদায় করা হত। এর জন্য কৃষকরা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে।

৬। সুলতান দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের অর্থের বদলে শস্যের দ্বারা জমির রাজস্ব দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের প্রবর্তিত সরকারী সাহায্যগুলি আলাউদ্দীন উঠিয়ে দিয়ে প্রচার করেন যে 'ইক্তা' কোন চিরস্থায়ী অধিকার নয়।

৭। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সুলতান অর্থের বিনিময়ে উৎপন্ন শস্য রাজস্ব হিসাবে আদায় করতেন। দিল্লীতে সরকারী গুদামে এইসব খাদ্যশস্য মজুত রাখা হত, যাতে অভাবের সময়ে বা দুর্ভিক্ষের সময়ে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহ করা যায়। সরকার ছাড়া কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের খাদ্য মজুত করার অধিকার ছিল না।

৮। সুলতানের আদেশ অমান্য করে নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা কোন দ্রব্যের বেশী দাম নিলে বা ওজনে কম দিলে, কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।

অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে কৃষকরা নিপীড়িত হয়। তবে তাঁর আমলে ধনী মুলতানী বণিকদের অবস্থা খুব রমরমা ছিল।

তাঁর জীবদ্দশায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু থাকে। এর দ্বারা সৈন্যদের, ও সামরিক কর্মচারীদের ও গুপ্তচরদের সাহায্য হয়। অবশ্য সাধারণ মানুষেরও উপকার হয়েছিল। তবে তাঁর আমলে ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে উৎসাহ অনেক কমে যায়। কৃষকরাও খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও দুরবস্থায় পড়ে। এর জন্য চোরা কারবার দেখা দেয়। সেজন্য সুলতানকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর অবশ্য তাঁর প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি ভেঙে পড়ে। কারণ তাঁর অর্থনৈতিক নীতিগুলি বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক দিক

থেকে অর্থনীতির নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। উৎপাদনের হার ও উৎপাদনের ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল্য নিয়ন্ত্রিত হত না। অর্থনীতির নিয়মের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির সঙ্গতি না থাকায় আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে এগুলি অবলুপ্ত হয়।

সাহিত্য ও শিল্পানুরাগ

তিনি শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। আমীর খুসরু তাঁর সভাসদ্ ছিলেন। মুসলিম সাধক শেখ নিজামউদ্দীন আউলীয়া ও ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। দিল্লীর কাছে 'সিরি' নামে এক নতুন শহর আলাউদ্দীন নির্মাণ করেছিলেন।

সমালোচনা

আলাউদ্দীনের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ' সম্রাট বলে বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে তাঁর কঠোর শাসন ও প্রজা উৎপীড়নের মধ্যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রজারঞ্জক ও জনপ্রিয় সুলতান না হলেও রাজ্যবিস্তার ও শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য আলাউদ্দীন দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন।

মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসন

খলজী বংশের শাসনের অবসান

আলাউদ্দীদের মৃত্যুর পর মালিক কাফুর রাজ্যের প্রকৃত শাসক হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে আলাউদ্দীনের আর এক পুত্র কুতবউদ্দীন মোবারক (১৩১৬-১৩২০) মালিক কাফুরকে নিহত করে সিংহাসন দখল করেন। চার বছর পর তাঁকে হত্যা করে খসরু দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে পাঞ্জাবের অন্তর্গত দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক, খুসরুকে নিহত করে গিয়াসুদ্দীন তুঘলক নাম গ্রহণ করে তুঘলক বংশের শাসনের সূচনা করেন।

তুঘলক বংশের শাসন : গিয়াসুদ্দীন তুঘলক তুর্কীজাতির করৌণ শাখাজাত ছিলেন বলে তুঘলকরা করৌণ তুর্কীবংশীয় বলেও পরিচিত হয়। গিয়াসউদ্দীন

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫)

তুঘলক (১৩২০-১৩২৫) মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বরঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রের বিদ্রোহ দমন এবং বাংলাদেশে গৃহবিবাদের মীমাংসা করা ছিল তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে এক দুর্ঘটনায় গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জুনা খাঁ মহম্মদ বিন্ তুঘলক নাম ধারণ করে দিল্লীর সুলতান হন। ঐতিহাসিক ইবন বতুতার মতে জুনা খাঁই ষড়যন্ত্র করে পিতার মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন।

মহম্মদ বিন্ তুঘলক-এর (১৩২৫-১৩৫১) মত অদ্ভুত চরিত্রের সম্রাট ইতিহাসে বিরল। গণিত বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। শিল্প সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি ধার্মিক ছিলেন এবং কখনও মদ্যপান করতেন না। তাঁর কর্মক্ষমতা ও রণকুশলতা কিছু কম ছিল না। একটি মানুষের মধ্যে এতগুলি গুণের সমাবেশ হলেও শাসকরূপে মহম্মদ বিন্ তুঘলক ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বে প্রজারা কখনও সুখে বাস করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ তাঁর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের অভাব। তিনি ছিলেন অস্থিরমতি ও অসহিষ্ণু। কোন কিছু করা একবার মনস্থ করলে আর তিনি ধৈর্য ধরে ভালমন্দ সম্ভব-অসম্ভব বিচার করতেন না। কোন সমালোচনা বা প্রতিবাদ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আদেশ অমান্য করলে বা কোন রকম প্রতিরোধের চেষ্টা করলেই শাস্তি ছিল মৃত্যু। অথচ এই সুলতান অন্য দিকে ছিলেন কোমলহৃদয় ও দয়ালু। তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে এসে কেউ শূন্য হাতে ফিরে যেত না। ইবন বতুতা লিখেছেন, মহম্মদ বিন্ তুঘলক দুটি জিনিস ভালবাসতেন—'দান করতে ও রক্তপাত করতে।' আফ্রিকান পর্যটক ইবন বতুতা মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালে দীর্ঘ সময় দিল্লীতে ছিলেন এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মহম্মদ বিন্ তুঘলকের দূতরূপে তিনি চীনদেশে গিয়ে ছিলেন (১৩৪১)। তাঁর গ্রন্থ "সফরনামা" ঐ যুগের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। জিয়াউদ্দীন বরনীর গ্রন্থ থেকেও মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালের এবং তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। মহম্মদ বিন্ তুঘলককে তিনি 'সৃষ্টির অন্যতম আশ্চর্য' বলে বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসে তিনি 'খেয়ালী রাজা' এমন কি 'পাগলা রাজা' নামেও অভিহিত হয়েছেন।

মহম্মদ বিন্ তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)

চরিত্র : পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ

অস্থিরমতিত্ব ও অসহিষ্ণুতা

সুলতান হবার পরই তিনি গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলে রাজকর বাড়িয়ে দেন। এই করভার প্রজারা বহন করতে না পারায় জোরজুলুম করে কর আদায় করা হতে থাকে। তখন কৃষকরা প্রাণভয়ে জমিজমা চাষবাস ছেড়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে থাকে। ফলে ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুলতান কৃষিঋণ দান, জলসেচ, রাজস্ব হ্রাস ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

দোয়াবে করবৃদ্ধি

যখন দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে সেই সময় তিনি সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত করেন। শুধু সরকারী দপ্তর ও কর্মচারী নয়, তিনি প্রতিটি নাগরিককে পর্যন্ত রাজধানীতে যেতে বাধ্য করেন। কিন্তু আট বছর পর ব্যাপক অসন্তোষ ও অন্যান্য অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সকলকে আবার

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। অসহনীয় দুঃখকষ্ট, অত্যাচার ও অর্থব্যয় ছাড়া রাজধানী পরিবর্তনে আর কোন লাভ হয়নি। অথচ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চলে রাজধানী স্থানান্তরের পিছনে যুক্তি ছিল। কিন্তু তাড়াহুড়া ও অপরিণামদর্শিতার জন্য মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল।

দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর

দুর্ভিক্ষ ও রাজধানী পরিবর্তনের ফলে যখন আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে সেই সময় মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করে দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হলে (১৩২৩-১৩২৯) মহম্মদ বিন্ তুঘলক প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের বিদায় করেন। **সীমান্ত সুরক্ষিত করার পরিবর্তে এইভাবে অর্থের দ্বারা মোঙ্গলদের বশীভূত করার চেষ্টা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবই প্রমাণ করে।**

মোঙ্গল আক্রমণ

আর্থিক সঙ্কট দূর করার জন্য মহম্মদ বিন্ তুঘলক তামার নোটের প্রচলন করেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক চিন্তা ও ভাল উদ্দেশ্য থাকলেও নোট জালের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করায় সারা দেশ জাল নোটে ভরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়ে। বিদেশী বণিকরা এই নোট গ্রহণে অস্বীকার করে। তখন সুলতান রাজকোষ থেকে সমস্ত তামার নোটের বিনিময়ে মূল্যদানের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে যারা নোট জাল করেছিল তারাও প্রচুর অর্থ পেয়েছিল। সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠেছিল।

তামার নোট প্রচলন

এই রকম যখন অবস্থা সেই সময় মহম্মদ বিন্ তুঘলকের দিগ্বিজয়ের বাসনা হওয়ায় তিনি প্রায় চার লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেন। লক্ষ্য ছিল ইরাক ও খোরসান জয় করা। কিন্তু এক বছর ধরে এই বিশালবাহিনী পোষণ করার পর তিনি তাঁর পরিকল্পনার অবাস্তবতা উপলব্ধি করে সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যে বিপুল অপব্যয় হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। তা সত্ত্বেও তিনি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত কারাচলের হিন্দুরাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন। কিন্তু এই অভিযানের ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। তিনি নাকি চীন ও তিব্বত জয়েরও পরিকল্পনা করেছিলেন।

দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা

এত অত্যাচার, অর্থব্যয় ও অস্থিরমতি কার্যকলাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে তুঘলক সাম্রাজ্যের চারদিকে বিদ্রোহ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্যে **বিজয়নগরে** হরিহর ও বুক্ক এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। দেবগিরিতে **বাহমনী** নামে এক মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছোটাছুটি করেও তিনি শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৩৫১ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুদেশে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে মন্তব্য করে ঐতিহাসিক বদায়ুনী

সাম্রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহ ও অসন্তোষ

লিখেছেন, 'এইভাবে রাজা তাঁর প্রজাদের কাছে ও প্রজারা রাজার কাছে মুক্তি পেলেন'। রাজধানী পরিবর্তন, তামার নোট প্রচলন, প্রজাদের করভার লাঘব করার জন্য রাজস্ব হ্রাস, কৃষি ঋণ দান, সেচের ব্যবস্থা, উদার শাসন ব্যবস্থা ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই সব পরিকল্পনার পিছনে মহম্মদ বিন্ তুঘলকের **মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।** কিন্তু খামখেয়ালী ও অপরিণামদর্শিতার জন্য তাঁর সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক

ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮)

অপুত্রক মহম্মদ বিন্ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্যপুত্র **ফিরোজ শাহ** তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮) সিংহাসন লাভ করেন। ফিরোজের প্রথম সমস্যা ছিল বাংলাদেশে **শামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ**-এর বিদ্রোহ দমন। কিন্তু ফিরোজ বঙ্গদেশ আক্রমণ করে সফল হননি এবং শেষ পর্যন্ত ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইলিয়াসের পুত্র সিকন্দরকে বাংলার স্বাধীন অধিপতিরূপে স্বীকার করে নেন। উড়িষ্যার জাজনগর আক্রমণ করে করদানের প্রতিশ্রুতিলাভ, পাঞ্জাবের নগরকোট দুর্গ অধিকার এবং সিন্ধুপ্রদেশে বিদ্রোহ দমনে আংশিক সাফল্য লাভ ছাড়া ফিরোজ বিশেষ সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দেননি।

তুঘলক সাম্রাজ্যের পতনরোধে অক্ষমতা

ধর্মানুরাগী, দুর্বলচিত্ত ফিরোজ সামরিক সাফল্য অর্জন না করলেও শাসন-সংস্কারে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। যারা মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালে অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয়েছিল, তাদের তিনি সাধ্যমত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করেন। করভার লাঘব করে, প্রজা-নির্যাতন বন্ধের আদেশ দেন ও কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য জলসেচের সুব্যবস্থা করেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য শাসন-সংস্কার ছিল জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন। আলাউদ্দীন এই প্রথা লোপ করছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের সময় ক্রীতদাস প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। ক্রীতদাসদের যথাযথ পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়।

নানাবিধ শাসন--সংস্কার

ফিরোজের জনহিতকর কার্যঃ পান্থশালা, চিকিৎসাকেন্দ্র, শিক্ষালয় স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কাজও তিনি করেছিলেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলক শিল্পোন্নতির সহায়তা করেছিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে ফিরোজাবাদ শহর ছাড়া জৌনপুর, ফতেহাবাদ, ফিরোজপুর ও হিসার প্রভৃতি শহরগুলি তাঁর সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শহরে জল সরবরাহ এবং কৃষিকার্যের সেচ ব্যবস্থার জন্য তিনি যে খালগুলি খনন করেছিলেন তা আজও পাঞ্জাবের কিছু অংশে কার্যকর আছে।

নতুন নগর নির্মাণ

ফিরোজ সেচের জন্য পাঁচটি খাল খনন করেন। একটি ১৫০ মাইল দীর্ঘ এবং যমুনার জল হিসারে নিয়ে যেত। দ্বিতীয়টি হল শতদ্রু নদী থেকে ঘাগর পর্যন্ত, তৃতীয়টি মাণ্ডবী ও সিরমুর পাহাড় থেকে হান্‌সী পর্যন্ত এবং সেখান থেকে আরসানী হয়ে হিসার পর্যন্ত, চতুর্থটি হল যমুনা থেকে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত ও পঞ্চমটি হল

ঘর্ঘরা খাল। এছাড়া ফিরিস্তার মতে তিনি ৫০টি বাঁধ ও ৩০টি জলাধার বা হ্রদ নির্মাণ করেন। সেচের উন্নতির জন্য কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এবং কৃষি উৎপাদন অনেকাংশে বর্ধিত হয়। ফিরিস্তার মতে ফিরোজ ৪০টি মসজিদ, ৩০টি মসজিদ সংযুক্ত বিদ্যালয়, ২০টি প্রাসাদ, ১০০টি সরাইখানা, ২০০টি নগর, ১০০টি হাসপাতাল, ১০০টি স্নানাগার, ১০টি সাধারণ প্রেক্ষাগৃহ ও ১৫০টি সেতু নির্মাণ করেন জনসাধারণের হিতার্থে। তিনি ৫টি সমাধি, ১০টি স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

ফিরোজের শাসন নীতির ফলে রাজ্যের আয় বাড়ে ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। জিনিষপত্রের মূল্য হ্রাস হয় এবং দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দূর হয়। ফিরোজ তাঁর আত্মজীবনী 'ফতোয়া-ই-ফিরোজসাহীতে' দাবী করেছেন যে তিনি বহু পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভ সংস্কার করেন এবং সে সব রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করে বেকার সমস্যার সুরাহা করার চেষ্টা করেন। ফিরোজ বহু ফুলের ও ফলের বাগান করেন এবং পুরাতন উদ্যানগুলির সংস্কার সাধন করেন। ফিরোজ সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি খিজরাবাদ ও মিরাট থেকে দুটি অশোক স্তম্ভ দিল্লীতে আনেন।

মুসলিম অনাথ এবং বিধবা ও দুর্দশাগ্রস্থ গরীব মুসলমানদের জন্য 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। তিনি আলাউদ্দিনের আমলের অনেক বাড়তি কর বন্ধ করে দিয়ে এবং সেচের দ্বারা কৃষির উন্নতি করে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করেছিলেন।

ধর্মান্ধতা

ফিরোজ শাহ শিক্ষানুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁর চরিত্রের এক মস্ত বড় দোষ ছিল ধর্মান্ধতা। তিনিই প্রথম ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন ও বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। এমন কি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও তাঁর রাজত্বকালে উৎপীড়িত হয়েছিল।

তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণ, সুলতানী সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা এবং সৈয়দ ও লোদী বংশ

তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ-এর (১৩৯৪-১৪১৩) রাজত্বকালে তুর্কীজাতির চাঘতাই শাখার নায়ক তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮)। কিন্তু ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনা না থাকায় তিনি প্রচুর অর্থ, সম্পদ, মণিমাণিক্য নিয়ে সমরখন্দে ফিরে যান। শ্মশানভূমি স্বরূপ দিল্লীতে দুর্বল সুলতান মামুদ শাহ ফিরে এলেও আর বেশীদিন তুঘলক বংশের শাসন টিকে থাকতে পারেনি।

ফিরোজের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। ফিরোজের পরবর্তী সুলতানগণ দুর্বল এবং রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন। তাঁরা কতকগুলি অসৎ আমীর ওমরাহ

এবং অভিজাত রাজকর্মচারীদের হাতের পুতুল ছিলেন। এইসব আমীর ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলি দিল্লীর সুলতানীর জন্য নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধায়। এই সুযোগে বিচ্ছিন্নতাবাদী সামন্ত শক্তিগুলি স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে এবং সাম্রাজ্যে সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সময়ে মালিক সারভার, মালিক-উসসার্ক (Malik-ush-Sharq নাম নিয়ে জৌনপুরে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। উত্তরে খোকাররা (Khokars) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গুজরাট, মালোয়া এবং খান্দেশ স্বাধীন রাজ্য গঠন করে। মুসলমান প্রাধান্য বিয়ানা এবং কালপিতে, এবং হিন্দু প্রাধান্য গোয়ালিয়রে প্রতিষ্ঠিত হয়। দোয়াবের হিন্দু রাজারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এইভাবে দিল্লীর সুলতানী বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেঙে পড়ে।

সুলতানী সাম্রাজ্যে বিচ্ছিন্নতার ফল

সৈয়দ বংশ: তুঘলক রাজত্বের পর স্বল্পকালের জন্য (১৪১৪-১৪৫১) দিল্লীতে যে রাজবংশের শাসন শুরু হয় তার নাম **সৈয়দ বংশ**। নিজেদের হজরত মহম্মদের দৌহিত্র বংশ বলে পরিচয় দিতেন বলে এঁদের 'সৈয়দ' নাম হয়। এই বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ। দুর্বল সৈয়দ শাসকরা সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারেননি।

সৈয়দ বংশের দুর্বল শাসন (১৪১৪-১৪৫১)

লোদী বংশ: ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ বংশের উচ্ছেদ করে দিল্লীতে নতুন রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন পাঞ্জাবের আফগান শাসনকর্তা **বহলুল লোদী** (১৪৫১-১৪৮৯)। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম আফগান বা পাঠান সুলতান। বহলুলের পুত্র **সিকন্দর লোদী** (১৪৮৯-১৫১৭) রাজ্যশাসনে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলা, বিহার ও মধ্য ভারতে তিনি সামরিক সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী হলেও তিনি ধর্মান্ধতামুক্ত ছিলেন না।

লোদীবংশের শাসন (১৪৫১-১৫২৬)

সিকন্দর লোদীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **ইব্রাহিম লোদী** (১৫১৭-১৫২৬) সুলতান হন। উদ্ধত ও ক্ষমতাপ্রিয় ইব্রাহিমের শাসনকালে রাজ্যের মধ্যে বিরোধ ও চক্রান্ত দেখা দেয়। তারই চরম পরিণতিরূপে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা **দৌলত খাঁ লোদী** কাবুলের অধিপতি বাবরকে দিল্লী আক্রমণ করতে আহ্বান জানান। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে **পানিপথের প্রথম যুদ্ধে** ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে বাবর ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ (১৫২৬): মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

তিনশো বছরেরও বেশী পুরানো (১২০৬-১৫২৬) তুর্ক-আফগান বা সুলতানী

সাম্রাজ্যের পতনের মূলে কতকগুলি কারণ ছিল। সুলতানরা প্রায় সকলেই সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন।

জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব

জনসাধারণের সমর্থন বা সহযোগিতা সাম্রাজ্যের ভিতকে শক্ত করেনি। আলাউদ্দীন বা মহম্মদ বিন্ তুঘলকের মত শাসকেরাও জনসাধারণের মন জয় করতে পারেননি। আমীর-ওমরাহরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং প্রায় সব সময়ই ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতাদখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থাকতেন।

ওমরাহদের শক্তি ও ষড়যন্ত্র

রাষ্ট্রের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উচ্চাভিলাষ এঁদের কাছে বড় ছিল। সুলতানী যুগের শাসনব্যবস্থা একান্তভাবে সম্রাটের ওপর নির্ভরশীল ছিল। দুর্বল বা অযোগ্য কোন ব্যক্তি সিংহাসনে বসলেই সেই সুযোগে ওমরাহরা এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তারা শক্তিশালী হয়ে উঠতেন এবং রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিত।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা

বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা দুরূহ ছিল। রাজধানী থেকে দূরাঞ্চলে অবস্থিত ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা সুযোগ-সুবিধা পেলেই নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হত।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ ঃ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের অস্থিরমতিত্ব, অসহিষ্ণুতা ও অদূরদর্শিতা সুলতানী সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছিল। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর দায়িত্ব লঘু করে দেখবার চেষ্টা করেছেন, তবু তাঁর অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ যে সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের অদূরদর্শীনীতি

জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন, ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন এবং ধর্মান্ধনীতি অনুসরণ করে ফিরোজ তুঘলকও সুলতানী সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের ক্ষতি করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণভাবে দিল্লীর সুলতানরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের আনুগত্য লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

ফিরোজ তুঘলকের দায়িত্ব

অনুদার ধর্মনীতি সুলতানী শাসন ব্যবস্থার এক বড় দুর্বলতা ছিল। বার বার মোঙ্গল আক্রমণ সুলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। কোন কোন সুলতান সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করেও মোঙ্গল আক্রমণ রোধ করতে পারেননি।

অনুদার ধর্মনীতি

মোঙ্গল আক্রমণ

তৈমুরলঙ্গের ভয়াবহ আক্রমণের ফলে সুলতানী সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তিম লগ্ন যখন আসন্ন সেই সময়ে লোদী-বংশের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে বাবর দিল্লী আক্রমণ করে এই সাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায় | আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুদয়

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহম্মদ বিন্ তুঘলকের শাসনের শেষ দিকে সুলতানী সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শাসন ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। এর জন্য মহম্মদ বিন্-তুঘলকের খামখেয়ালী রাজ্যশাসন নীতিই অনেকাংশে দায়ী। এরপর প্রায় ২০০ বছর আঞ্চলিক রাজ্যগুলির প্রাধান্য চোখে পড়ে। এদের মধ্যে **বাংলাদেশ, বাহমনী** ও **বিজয়নগর** রাজ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

বাংলাদেশ

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭) ঃ

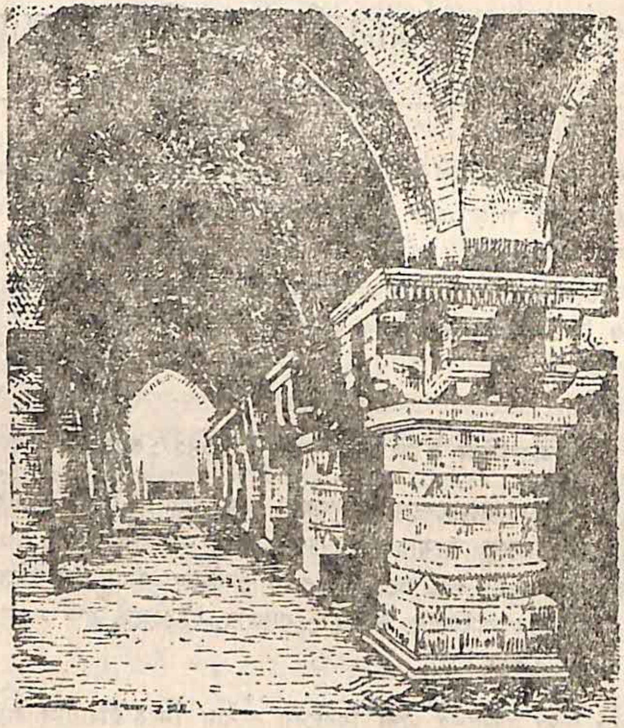
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। দিল্লী অনেক কষ্টেও এই দূরবর্তী প্রদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করলেও ১৩৩৯-৪০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা দিল্লীর অধিকার মুক্ত হয়ে পড়ে। ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ লক্ষণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় (১৩৪২-১৩৫৭)।

তিরহুতের হিন্দু রাজাদের মধ্যে বিবাদের সুযোগ নিয়ে ইলিয়াস শাহ তিরহুত জয় করেন। তিনি নেপাল আক্রমণ করে কাঠমুণ্ড পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু অল্পকাল পরে যোগাযোগের অসুবিধার জন্য সৈন্য সরিয়ে নেন। পরে তিনি উড়িষ্যা জয় করেন। আসামে কামরূপের হিন্দু রাজাকেও পরাজিত করেন। তিনি সোনারগাঁওয়ের গাজী শাহকে পরাজিত করে পূর্ববাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেন।

তদানীন্তন দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ-তুঘলক দুবার বাংলা আক্রমণ করেন। একবার ইলিয়াস শাহের আমলে (১৩৫৪) আর একবার তার পুত্র সিকন্দর শাহের আমলে (১৩৫৭-৮৯)। ইলিয়াস শাহ এবং সিকন্দর শাহ দুজনেই সুরক্ষিত একডালা (Ikdala) দুর্গে আশ্রয় নেন। দুবারই দিল্লীর সৈন্যবাহিনী একডালা দুর্গ জয় করতে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ফিরোজের সঙ্গে যে সন্ধি হয়, তাতে বাংলার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ইলিয়াস শাহ ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

সিকন্দর শাহ (১৩৫৭-৮৯) ঃ ইলিয়াস শাহের পর তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। সিকন্দর একজন দক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর

আমলেই বিখ্যাত আদিনা মসজিদটি নির্মিত হয়। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর সাফল্যের সঙ্গে রাজত্ব করার পর সিকন্দর শাহ তাঁর নিজের পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।



আদিনা মসজিদ

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯):

গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ তাঁর পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসলেও, তিনি একজন দক্ষ, ন্যায়পরায়ণ ও ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা ছিলেন। মুসলমান দরবেশ ও আইনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি চীন দেশে দূত পাঠান এবং ফার্সী কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিল।

রাজা গণেশ: আজম শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দক্ষ শাসকের অভাবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। এই সময়ে দিনাজপুরের ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা গণেশ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে পরাজিত করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোঁড়া মুসলমান এবং সুফী দরবেশরা হিন্দু রাজত্বের অবসান করার জন্য জৌনপুরের ইব্রাহিম শার্কি সুলতানকে আমন্ত্রণ জানান। এর ফলে

গণেশ তাঁর নাবালক পুত্র যদু সেনকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে সিংহাসনে বসাতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা নিজে ভোগ করতে থাকেন। পরে যদু সেন সুলতান জালালুদ্দিন (১৪১৮-১৪৩১) নামে রাজত্ব করেন।

১৪৪২ খ্রীস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান হয়। এই বংশের রুকুনুদ্দিন বারবাক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯):

রুকুনুদ্দিন বারবাক শাহের অনেক আবিসীনিয় ক্রীতদাস ছিল। এদের মধ্যে অনেকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিছুদিন এই সব আবিসীনিয়দের আধিপত্য চলে। এই অপশাসনের অবসান করেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। হুসেন শাহ জৌনপুরের সুলতানকে আশ্রয় দেন এবং সিকন্দর লোদীর সঙ্গে সন্ধি করে উত্তর বিহার করায়ত্ত করেন। তিনি কামরূপ ও তিরহুত জয় করেন।

নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২): হুসেন শাহের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন নসরৎ শাহ। এঁর আমলে বাবরের আক্রমণ হয়। নসরৎ শক্তিশালী ও বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। তিনি বাবরের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন। তবে তিনি অহোমদের দমন করতে পারেন নি। এই সময়ে পোর্তুগীজরা বাংলাদেশে আসে।

সাংস্কৃতিক বিকাশ: সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের জন্য পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ বলা যায়। হুসেন শাহের আমলে বঙ্গ সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা বিকাশ ঘটেছিল। তবে এর সূচনা হয় ইলিয়াস শাহী আমলে। সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রধান কারণ ছিল স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়, রাজনৈতিক স্থিরতা, সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা।

বাংলার সুলতানদের মধ্যে ইউসুফ শাহ, হুসেন শাহ এবং নসরৎ শাহ বঙ্গ সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সুলতানরা হিন্দু, মুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এজন্য বিভিন্ন রাজকার্যে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন গোপীনাথ বসু (পুরন্দর খাঁ), রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মুকুন্দ দাস প্রভৃতি। এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমসাময়িক সংস্কৃতির আদান প্রদান হয়। এরই নিদর্শন স্বরূপ সত্যপীর এবং সত্যনারায়নের আরাধনা ও পূজার প্রচলন হয়। হিন্দু এবং মুসলমানরা আত্মীয়ের মত পাশাপাশি বাস করে। এর প্রতিফলন দেখা যায় শ্রীচৈতন্যের প্রতি কাজীর উক্তিতে:

"নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় মোর নানা
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।"

বাংলার সুলতানী আমলে ফার্সী সম্ভবতঃ রাজভাষা ছিল। তবে ফার্সী বা আরবী

সাহিত্যের বিকাশের সামাজিক পরিবেশ ছিল না। এই সময়কার সাহিত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

অনুবাদ সাহিত্য—কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত মহাভারতের অনুবাদ, পরে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ উল্লেখযোগ্য।

মঙ্গলকাব্য—বিজয় গুপ্ত রচিত 'মনসা মঙ্গল', মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'চণ্ডিমঙ্গল' এবং ময়ূর ভট্ট, খেলারাম ও মাণিক গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির বিভিন্ন সময়ে রচিত মঙ্গল কাব্য।

পৌরাণিক সাহিত্য—মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' একটি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক সাহিত্য।

বৈষ্ণব পদাবলী ও জীবনী—বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশের একটি বড় অনুপ্রেরণা শ্রীচৈতন্যের নব বৈষ্ণব ধর্ম। বৈষ্ণব ধর্মকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব পদ ও পদাবলী কাব্যের সৃষ্টি হয়। কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনা। এই সময়ে জীবনী বিষয়ক ও বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক রচনা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীচৈতন্যদেবের সবচেয়ে পুরানো জীবনী মুরারী গুপ্ত রচিত চৈতন্য চরিতামৃত বা মুরারী গুপ্তর কড়চা। সমসাময়িক যুগে অনেক মুসলমান কবি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পদাবলী রচনা করেন। সম্ভবতঃ সবচেয়ে পুরাতন বিদ্যাসুন্দর কাব্য মুসলমান কবির লেখা। আবার সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞানপ্রদীপ' 'নবীবংশ', সৈয়দ মুরতজার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম ও ভক্তিভাব ও নগর সংকীর্তন অগণিত মানুষের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের মনে উৎসাহ জাগায় ও মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া রোধ করে। অবশ্য হিন্দু সমাজে বর্ণবৈষম্য একেবারে দূর হয়নি এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব থেকে যায়।

এই সময়ে স্থাপত্য শিল্পেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল। বাংলা দেশের আদিনা মসজিদ, একলাখী সমাধি মন্দির, গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ, লোটন মসজিদ, কদম রসুল উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

তবে মধ্যযুগের বাংলার সুলতানরা সম্পূর্ণভাবে অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন না, এই সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে। গৌড়-পাণ্ডুয়ার ধ্বংসস্তূপ থেকে জানা যায়, অনেক হিন্দু মন্দির মসজিদে পরিণত করা হয়। অবশ্য এর ফলে হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্য রীতির মিশ্রণ ঘটেছিল।

বাহমনী রাজ্য

মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে দাক্ষিণাত্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুজরাট, মালব, দেবগিরি বা দৌলতাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলগুলি মহম্মদ বিন তুঘলক যে সব

আমীর ওমরাহদের অধীনে রাখেন তাদের বলা হত 'সাদাহ্' আমীর (Sadah)। মহম্মদ বিন তুঘলক উত্তর ভারতে তাঁর শাসন ক্ষমতা দৃঢ়তর করবার চেষ্টা করলে দক্ষিণে এই 'সাদাহ আমীর'রা বিদ্রোহ করেন। বিদ্রোহী আমীররা দৌলতাবাদ দুর্গ অধিকার করে **ইসমাইল মুখ** নামে তাদের এক নেতাকে সুলতান করে স্বাধীন দৌলতাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বৃদ্ধ ইসমাইল মুখ আরামপ্রিয় এবং রাজ্য শাসনে অক্ষম ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় **হাসান-জাফর-খান** নামে এক নেতার অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এবং হাসান ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দে **আবুলমুজাফ্ফর আলাউদ্দীন বাহমন শাহ** উপাধি গ্রহণ করে দৌলতাবাদের সিংহাসনে আরোহন করেন। উত্তরে ওয়েনগঙ্গা থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে দৌলতাবাদ থেকে পূর্বে ভোঙ্গির (Bhongir) পর্যন্ত আলাউদ্দীন বাহমন শাহের (১৩৪৭-১৩৫৮) রাজ্য বিস্তৃত হয়। বাহমন শাহের নাম অনুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম হয় **বাহমনী রাজ্য**। এই ভাবে দক্ষিণে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বাহমনী রাজ্য মুসলমান সংস্কৃতির পীঠস্থান রূপে পরিগণিত হয়।

হাসান সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর রাজধানী গুলবর্গায় স্থানান্তরিত করেন। এই সময় হিন্দু প্রতিবেশী তেলিঙ্গনা ও বিজয় নগর রাজ্যের সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের বিরোধ দেখা দেয়।

১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দে হাসানের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র **প্রথম মহম্মদ শাহ** (১৩৫৮-৭৭) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় থেকে বাহমনী রাজ্য বিজয় নগরের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

১৪৬৩ খ্রীস্টাব্দে নিজাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক ভাই তৃতীয় মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে রাণী বেগম মকদুমা জাহান **মামুদ গাওয়ানের** উপর রাজ্যের নেতৃত্ব ভার দেন। বাহমনী রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি হয় প্রধানতঃ মামুদ গাওয়ানের নেতৃত্বে। এই সময় মামুদ গাওয়ান **খাজা জাহান** নাম নিয়ে মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণ করেন। গাওয়ান অনুগত ও বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও দক্ষ শাসন পরিচালনার ফলে বাহমনী রাজ্য ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে ও প্রভূত উন্নতি হয়। কিন্তু কিছু-ঈর্ষান্বিত আমীর ওমরাহের চক্রান্তে গাওয়ানের প্রাণদণ্ড হয়।

গাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহমনী রাজ্যের দুর্দিন শুরু হয়। অবশেষে ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে **কলিমুল্লাশাহের** মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের শেষ হয়। বাহমনী রাজ্যের ধ্বংসের ওপর পাঁচটি স্বাধীন সুলতানী রাজ্য গড়ে ওঠে। এই পাঁচটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নামে এই সব রাজ্যের নামকরণ হয়। এগুলি হলঃ ১। **বেরারের ইমাদ শাহী রাজ্য** ২। **আহমদ নগরের নিজামশাহী রাজ্য** ৩। **বিজাপুরের আদিল শাহী রাজ্য** ৪। **গোলকুণ্ডার কুতবশাহী রাজ্য** এবং ৫। **বিদরের বারিদশাহী রাজ্য**।

বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের দ্বন্দ্বের প্রকৃতিঃ দাক্ষিণাত্যে তুর্কী রাজনৈতিক শক্তি ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিরোধ হিসাবে বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান সাধারণতঃ চিহ্নিত হয়ে থাকে। বিজয়নগরের জন্মের যে একটা আদর্শগত বৈশিষ্ট্য আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মধ্য দিয়ে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাধব বিদ্যারণ্য ও তাঁর ভাই বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন; বিশেষ করে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষা করা ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান। প্রায় ৩০০ বছর ধরে বিজয়নগর মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করে ও শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে। তবে বিজয়নগরের উৎপত্তি ও বিস্তারের পিছনে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কারণও ছিল।

বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক গুরুত্বের কেন্দ্রস্থল, তামিল দেশ থেকে কানাড়া ও তেলেগু দেশে পরিবর্তিত হয়। উত্তরে মুসলমান বাহমনী রাজ্য থাকায় দক্ষিণে বিজয়নগর হিন্দু রাজ্যগুলি জয় করে এই রাজ্যের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত করে এবং একটি বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এই সব কারণগুলি বিবেচনা করলে মনে হয় দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শক্তি বিজয়নগরের তামিল রাজ্যগুলির উপর হিন্দু আধিপত্য ও রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাকে সীমিত করার চেষ্টা করেছিল। অপর দিকে দাক্ষিণাত্যে দিল্লী সুলতানীর প্রাধান্য খর্ব হওয়ায়, সেই জায়গায় মুসলমান বাহমনী রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তারের চেষ্টাকে বিজয়নগর বার বার প্রতিহত করেছিল।

শাসনকর্তা এবং দুর্গাধিপতি হিসাবে ব্রাহ্মণদের নিয়োগ—রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা করে। তবে ধর্মের পুনরুত্থান হলেও স্থানীয় পুরাতন ধর্মীয় সংস্থাগুলি বাঁচিয়ে রাখতে বিজয়নগর বিশেষ আগ্রহী ছিল না। বিজয়নগরে সামরিক এবং নাগরিক সংস্কৃতি প্রাধান্য পায়।

বারটন স্টেইনের (Burton Stein)-এর মতে বিজয়নগর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। সুতরাং বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে বিজয়নগরের দ্বন্দ্বে ধর্মের রঙ বা প্রভাব থাকলেও এটি মূলতঃ রাজনৈতিক বিবাদ।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দিল্লীর সুলতানীর পতনের পর বাহমনী রাজ্যের সুলতানরা দাক্ষিণাত্যে মহম্মদ তুঘলকের উত্তরাধিকারী হিসাবে দাবী করে তাঁদের রাজ্যের সীমা দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে মাদুরা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। বিজয়নগর কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা উপত্যকার দিকে বাহমনী রাজ্যের এই বিস্তার প্রতিহত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা সমস্ত শক্তি সুসংহত করেছিল রায়চুর দোয়াবের অর্থাৎ কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার উর্বর উপত্যকায়, কৃষ্ণা-গোদাবরীর উপত্যকায় ও কোঙ্কণ এবং গোয়ায় বিজয়নগরের আধিপত্য বজায় রাখতে। এটা ছিল একটা রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের দখল ও অর্থনৈতিকসম্পদ সুসংহত করার

জন্য সংগ্রাম। আসলে পুরাতন হিন্দুরাজাদের দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রার উর্বর অঞ্চলে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক যুদ্ধের পুনরাবৃত্তিই হল বাহমনী বিজয়নগরের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রাম। বাহমনী সুলতানেরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেছিলেন বিজয়নগরের উর্বর ভূমি ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত মন্দির ও শহরগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে। অপরদিকে বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেন নি, মুসলমান অভিযানের হাত থেকে দাক্ষিণাত্য ও হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব। শেষ পর্যন্ত বিজয়নগর বা বাহমনী কোন রাজ্যই এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারে নি।

এই সকল কারণ বিবেচনা করে বলা যায় যে বাহমনী ও বিজয়নগরেরর দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের জন্য, যদিও এই বিবাদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব কিছুটা পরিলক্ষিত হয়।

বিজয়নগর রাজ্য

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে সুলতানী সাম্রাজ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সময় আঞ্চলিক শক্তিগুলি স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে বিজয়নগরের উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

সিওয়েলের (Sewell)-এর মতে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী সঙ্গম নামে এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র ছিল। এদের মধ্যে হরিহর এবং বুক্ক ছিলেন প্রধান। এই হরিহর ও বুক্ক তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে বিজয়নগর শহর ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, উত্তর তীরে অবস্থিত আনেগুণ্ডি (Anegundi) দুর্গের সামনা সামনি। হরিহর ও বুক্ক বিজয় নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মাধব বিদ্যারণ্য ও বেদের ভাষ্যকার তাঁর ভাই সায়ন বা সায়নাচার্যের কাছ থেকে। মাধব বিদ্যারণ্য ও সায়নাচার্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থান।

অনেকের মতে হোয়সল রাজ তৃতীয় বীর বল্লাল বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা। কারোর মতে হরিহর ও বুক্ক হোয়সল রাজের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী ছিলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আমলে এই দুই ভাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং মাধব বিদ্যারণ্যের সাহায্যে আবার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন।

ভারতের ইতিহাসে বিজয়নগরের বৈশিষ্ট্য হল, প্রায় ৩০০ বছর ধরে বিজয়নগর দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে ও পরোক্ষভাবে বাহমনীকে দক্ষিণে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত করে, উত্তর ভারতে বাহমনী প্রভাব বিস্তারের অগ্রগতি রোধ করে।

পর পর চারটি রাজবংশ বিজয়নগরে রাজত্ব করে।

সঙ্গম বংশ (Sangam Dynasty)ঃ সঙ্গম বংশের হরিহর ও বুক্ক বিজয়-নগর রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন। হরিহরের পর **প্রথম বুক্ক** বিজনগরের সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলে বাহমনীদের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। প্রথম বুক্কর পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় হরিহর** (১৩৭৭-১৪০৪) রাজা হন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ', 'রাজাপরমেশ্বর' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হরিহর কর্ণাটক, মহীশূর, ত্রিচিনোপল্লী ও কাঞ্চী জয় করেন। তিনি চাওল, (Chaul), দাভল (Dabhal) ও গোয়া (Goa) বন্দর অধিকার করে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। এর ফলে বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে।

দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবে এই নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দেয়। অবশেষে **দেবরায় প্রথম** সিংহাসনে বসেন ১৪০৬ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম দেবরায় ১৪২২ খ্রীস্টাব্দে মারা যান এবং প্রথম দেবরায়ের পরে বিজয়নগরের উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন এই বংশের **দ্বিতীয় দেবরায়**। তিনি সিংহাসনে বসেন ১৪২২ খ্রীস্টাব্দে। এই সময়ে বাহমনীদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে এবং সুলতান আহমদ শাহ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এই যুদ্ধে দ্বিতীয় দেবরায় পরাজিত হন এবং বিজয়নগরের প্রভূত ক্ষয় ক্ষতি হয়। দ্বিতীয় দেবরায় বাহমনীদের সঙ্গে জয়ের আশায় বিজয় নগরের সৈন্যদল পুনর্গঠন করেন ও তাঁর সেনানীতে অনেক মুসলমান ও পোর্তুগীজ সৈন্য নিয়োগ করেন। দ্বিতীয় দেবরায়ের শাসনকালে বিজয়নগর রাজ্য দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দেবরায় দ্বিতীয় ১৪৪৬ খ্রীস্টাব্দে মারা যান এবং তাঁর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র **মল্লিকার্জুন** বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন। মল্লিকার্জুনের ১৪৬৫ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু হয় এবং তাঁর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় বিরূপাক্ষ বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন। তিনি শাসনকার্যে অক্ষম ছিলেন। এই সময়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অবশেষে সলুভা বংশের চন্দ্রগিরির সামন্ত রাজা নরসিংহ সলুভা দ্বিতীয় বিরূপাক্ষকে সিংহাসন-চ্যুত করে ১৪৮৬ খ্রীস্টব্দে বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন।

সলুভা বংশঃ ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে **নরসিংহ** সলুভা বংশের পত্তন করেন। এই সময় বাহমনীদের সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং রায়চুর দোয়াব বাহমনীদের হাতে থেকে যায়। তবে নরসিংহ আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ প্রশমিত করেন। নরসিংহ সলুভার মৃত্যুর পর তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি তুলুভ বংশীয় **নরস নায়ক** নরসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র **ইম্মাদি নরসিংহকে** সিংহাসনে বসিয়ে নিজে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে নরস নায়কের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **বীর নরসিংহ** ইম্মাদি নরসিংহকে সিংহাসনচ্যুত করে ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার করেন।

৩। **তুলুভ বংশঃ** ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরের সিংহাসনে তুলুভ বংশের পত্তন হয়। বীর নরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা **কৃষ্ণদেব রায়** সিংহাসনে

বসেন। এই বংশের কৃষ্ণদেব রায় সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি মহীশূর, বিদর জয় করেন। তিনি উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করে উদয়গিরি ও কোণ্ডবিড়ু অধিকার করেন। বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহকে পরাজিত করে রায়চুর, দোয়াব অঞ্চল অধিকার করেন ও গুলবর্গার দুর্গ ভূমিস্যাৎ করে দেন। ভারত মহাসাগরের কিছু দ্বীপেও তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগীজ শাসনকর্তা (Portuguese governor Albuquerque) আলবুকর্ককে ভাটকালে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন। কৃষ্ণদেব রায় সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যদিও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল, তথাপি তিনি হিন্দু ধর্মের অন্যান্য ধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি সদালাপী, ধার্মিক ও প্রজাদের মঙ্গল কামনা করতেন। তাঁর আমলে বিজয়নগর ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয় ও যশ ও খ্যাতির উচ্চ শিখরে ওঠে। তিনি দক্ষ শাসনকর্তা ও সমর কুশলী ছিলেন। এজন্য কৃষ্ণদেব রায় দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলে পরিগণিত হতেন। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে কৃষ্ণদেব রায়কে ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা বলেছেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই অচ্যুত রায় সিংহাসনে বসেন। পরে অচ্যুত রায়ের ভাইপো সদাশিবকে সিংহাসনে বসিয়ে মন্ত্রী রামরায় শাসন ক্ষমতা গ্রাস করেন। রামরায়ের আগ্রাসী নীতির ফলে দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি সুলতানী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে বিজয়নগরকে পঙ্গু করে ফেলে।

আরবিড়ু বংশ ঃ তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্য অবশ্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় নি। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে নামে মাত্র রাজা সদাশিবকে সিংহাসনচ্যুত করে রামরায়ের ভাই তিরুমল বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার করে আরবিড়ু বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজা দ্বিতীয় ভেঙ্কটের সময়ে আঞ্চলিক শক্তিগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করে এবং বিজয়নগর রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। আরবিড়ু বংশের শেষ রাজা তৃতীয় রঙ্গের আমলে মহীশূর, বেদনুর, মাদুরা ও তাঞ্জোরে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় ও বিজয়নগর রাজ্য ভেঙে পড়ে।

বিজয়নগরের রাজ্য শাসন ব্যবস্থা, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবন

শাসন ব্যবস্থা ঃ মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার মত বিজয়নগরের রাজা ছিলেন রাজ্যের সর্বময় শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন সামরিক, অসামরিক ও বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। অনেক সময় রাজারা সামাজিক সমস্যারও সমাধান করতেন। কিন্তু রাজারা দায়িত্ব-জ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁরা রাজ্যের স্বার্থ, জনগণের ইচ্ছা ও অধিকার

শাসন ক্ষমতা

এবং প্রজাদের মঙ্গল কখনও উপেক্ষা করতেন না। তাঁদের উদার নীতির জন্য রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত।

মন্ত্রী পরিষদ

রাজাকে শাসন কার্যে সাহায্য করার জন্য **মন্ত্রী পরিষদ** ছিল। যদিও শাসন বিভাগে ব্রাহ্মণরা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতেন, তথাপি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায় থেকে রাজা মন্ত্রীদের নিয়োগ করতেন। মন্ত্রী পরিষদ ছাড়া, প্রধান কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্য সচিব, রক্ষী বিভাগের প্রধান, সামরিক নায়ক, মণি মাণিক্যের তত্ত্বাবধায়ক, কারুশিল্পী, ভাট বা রাজার প্রশস্তি গায়ক, রাজার ব্যক্তিগত পারিষদ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল। বিজয়নগরের রাজসভা খুব আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। রাজপুরোহিত, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, অভিজাত সম্প্রদায়, কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, জ্যোতিষী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই রাজসভা অলংকৃত করতেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

বিজয়নগর রাজ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে, রাজ্য, মণ্ডল বা চাবাদি (Rajya, mandala, chavadi) নামে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হত। এই সকল প্রদেশকে আবার পুনর্বিভাগ করা হত—কর্ণাটক অঞ্চলে ভেংটি, নাড়ু, সীমা, গ্রাম এবং স্থল (Venthe, Nadu, Sima, Village and Sthala) নামে এবং তামিল অঞ্চলে কোট্টাম, পারু ও নাড়ু (Kottam, Parru, Nadu) এবং গ্রাম নামে। প্রত্যেক প্রদেশ নায়ক বা নায়েক (Nayaka বা Naik) নামে একজন শাসন কর্তার অধীনে থাকত। এঁরা নিজেদের প্রদেশের সামরিক, অসামরিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হত। প্রয়োজনে সামরিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হত।

গ্রাম পরিষদ

গ্রামগুলির শাসন কার্য পরিচালনার জন্য গ্রাম-পরিষদ বা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর শাসন, বিচার ও পুলিশ বিভাগের যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। 'মহানায়কাচার্য' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর দ্বারা রাজা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ও গ্রাম শাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

রাজস্ব

সিস্ট (Sist) নামে ভূমি রাজস্বই ছিল বিজয়নগর রাজের আয়ের প্রধান উৎস। জমির উর্বরা শক্তির উপর ভিত্তি করে কর নির্ধারণ করা হত। যেমন জলসম্পৃক্ত জমি (Wet land), শুষ্ক জমি (Dry land) বনাকীর্ণ ও উদ্যান সমন্বিত জমি (Orchards and woods)। ভূমি রাজস্ব, অর্থ বা শস্যের বিনিময়ে দেওয়া যেত। কিন্তু কৃষকদের উপর অত্যন্ত গুরুভার কর চাপানো হত। এর ফলে কৃষকরা উৎপীড়িত ও দরিদ্র হয় ও তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। জমির কর ছাড়া, পথ কর, গোচারণ ভূমির উপর কর, বিবাহ কর, আয় কর ও সামরিক কর দিতে হত।

রাজা ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক অধিকর্তা। কিন্তু বিচার ব্যবস্থার জন্য বিচারক ও নিয়মিত আদালত ছিল। দোষীদের কঠোর সাজা দেওয়া হত। জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড দ্বারা অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হত। কখনও কখনও অপরাধীদের হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট করে মেরে ফেলা হত।

বিচার ব্যবস্থা

বিজয়নগরের এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠিত ছিল পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ, হস্তী ও উষ্ট্রবাহিনী নিয়ে সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন 'দণ্ডনায়ক' বা 'ধন্নায়ক'।

সামরিক ব্যবস্থা

বিজয়নগরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন ঃ ইটালিয়ান পর্যটক নিকোলো কণ্টি, পোর্তুগীজ পর্যটক ডোমিনগোজ পোয়েজ ও পারস্যের দূত আব্দুর রজ্জাকের বিবরণ থেকে বিজয়নগরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

সমাজে মেয়েদের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। মেয়েরা শুধু বিদ্যাচর্চাই করত না, তারা মল্লযুদ্ধ, অসিচালনা, সঙ্গীত, নৃত্যকলায় পারদর্শী ছিল। মেয়েরা সে সময়ে অলঙ্কার ব্যবহার করত। তারা হিসাব নিকাশেও দক্ষ ছিল। কিন্তু সেই আমলে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা ও সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল।

সমাজে নারীর স্থান

ব্রাহ্মণরা সমাজে উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা দেবদান সাহায্য পেতেন রাজার কাছ থেকে। বিজয়নগরের মন্দিরগুলির অধীনে ভূসম্পত্তি থাকত। এই সম্পত্তির আয় মন্দিরের সেবায় ব্যয় হত। ব্রাহ্মণরা মন্দিরে পুরোহিতের কার্য ও মন্দিরের তত্ত্বাবধান করতেন। ব্রাহ্মণরা ছিলেন মেধাবী, সৎ ও হিসাব নিকাশে পারদর্শী। তবে তাঁরা বেশী দৈহিক পরিশ্রম করতে পারতেন না। তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বেশী ছিল এবং এর ফলে বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথার প্রচলন ছিল।

ব্রাহ্মণদের অবস্থা

বিজয়নগরের রাজাদের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল। তথাপি তাঁরা অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। রাজারা বিষ্ণু এবং শিবের উপাসক ছিলেন।

ধর্ম

ব্রাহ্মণরা নিরামিষাসী ছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা মাংস খেত। তবে সমাজে গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। কারণ বলদ এবং গাভীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত।

খাদ্য

রাজারা সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু ও কন্নড় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ চর্চা করা হত। সায়নাচার্য বেদের বিখ্যাত ভাষ্য বা টীকা লিখেছিলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায় নিজে একজন বিদ্যোৎসাহী, পণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি 'অমুক্তা মাল্যদা' নামে তেলেগু ভাষায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া আর পাঁচটি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন 'পেদ্দানা' (Peddana)। কৃষ্ণপদ রায়ের রাজসভায় কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী ও ধার্মিক জনের সমাগম হত এবং তিনি তাঁদের অর্থ ও জমি মূল্যবান উপঢৌকন হিসাবে দান করতেন। তাঁর সভায় 'অষ্ট দিগ্‌গজ' বা আটজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। আরাবিদু বংশের রাজারাও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রামরায় বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য ও গীত

এছাড়া সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যের প্রতিও রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যের সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও রচিত হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নগরে শিল্প, চিত্রকলা ও স্থাপত্যের বিকাশ হয়েছিল। বিখ্যাত 'হামারা' মন্দির, 'বিঠ্‌ঠল স্বামী' মন্দির স্থাপত্য শিল্পের এক অমূল্য নিদর্শন। বিজয়নগরের বিশাল হর্ম্যরাজি, প্রাসাদ, মন্দির, মঠ, স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ তার স্বাক্ষর বহন করে।

শিল্প-স্থাপত্য

বিদেশী পর্যটকরা বিজয়নগরের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। তখন শুধু মেয়েরা নয়, সাধারণ লোকও অলঙ্কার পরত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

রাজারা কৃষি, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন। বিজয়নগরের রাজস্বের মূল উৎস ছিল কৃষি। সেজন্য অর্থনৈতিক ভিত্তি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে জমিদার শ্রেণীই জমির মালিক হিসাবে কৃষি উৎপাদনের বেশীর ভাগ ভোগ করত ও কৃষকরা করভারে নিপীড়িত হত। সমাজে ধন বৈষম্য ছিল।

ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে বিজয়নগর প্রভূত উন্নতি করেছিল। মালয়, ব্রহ্মদেশ, ইরাণ, মিশর, আবিসিনিয়া ও পোর্তুগালের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল। প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলি হল : সুতীবস্ত্র, চাল, লোহা, চিনি, লবণ, মশলা ও সুগন্ধি দ্রব্য। আমদানি হত ঘোড়া, মুক্তা, তামা, পারদ, রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র এবং ভেলভেট।

বিজয়নগরে সুতীবস্ত্র, ধাতু, সুগন্ধি দ্রব্য তৈজসপত্র নির্মাণের শিল্প ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়াও ব্যবসায়ী সংঘ (Trade guild) ছিল। বিজয়নগর রাজ্যে বন্দর ছিল ও জাহাজ নির্মাণের শিল্প ছিল এবং বিজয়নগর রাজ্যের ছোট নৌবাহিনী ছিল।

তখন তামার মুদ্রার বেশী প্রচলন ছিল, তবে রূপার মুদ্রাও ব্যবহার হত। বিজয়নগরের অর্থনৈতিক জীবনে ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি থাকলেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল।

চতুর্থ অধ্যায় | সুলতানী যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব

সুলতানী যুগ ঃ মুসলমান বিজয়ের বহু পূর্বেই একের পর এক বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা অন্যান্য বিদেশী জাতির মত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হিন্দু সমাজে মিশে যায়নি। এর এক প্রধান কারণ ছিল ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। প্রচণ্ড একেশ্বরবাদী ইসলামধর্মাবলম্বী মুসলমান এবং প্রতীক ও প্রতিমাপূজায় বিশ্বাসী হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ উভয়ের মিলনের পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রমের আদর্শের বিরাট পার্থক্য ছিল। অন্য দিকে শাসকশ্রেণীভুক্ত মুসলমানরা হিন্দুদের চেয়ে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা লাভ করায় দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।

সুলতানী যুগ

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিলনের অন্তরায়

সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচারে জর্জরিত নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু, ইসলাম ধর্মের সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে এই সঙ্কটকালে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দুশাস্ত্রকাররা আরও কঠোর ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। মধ্যযুগের রক্ষণশীল শাস্ত্রকারদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের **মাধবাচার্য** ও বাংলার **রঘুনন্দন** বিশেষ প্রসিদ্ধ।

হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা ও বিধিনিষেধের কঠোরতা বৃদ্ধি

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্য থাকলেও দুই ধর্মের কিছু কিছু মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগসূত্র এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। দীর্ঘকাল হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করার ফলে দুই সভ্যতার মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় ও দুই সম্প্রদায় পরস্পরের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে। এর ফলে সামাজিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ এই মিলন প্রচেষ্টাকে আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী করে তোলে। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং এক মিলনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা হয়। যে

মধ্যযুগের ধর্মসংস্কারকগণের ভূমিকা

মহাপুরুষেরা মিলন ও সাম্যের বাণী প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, নামদেব, শ্রীচৈতন্য, একনাথ, নানক প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। এঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এক ও অভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেম এবং সর্বজীবে প্রেমই হল প্রকৃত ধর্ম। গুপ্তোত্তর যুগেই ভক্তিবাদের জন্ম ও প্রসার হয়েছিল।

ভক্তিবাদ ঃ মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলন বা ভক্তিবাদ এক বিরাট সামাজিক বিবর্তনের সূচনা করে। বস্তুতঃ পক্ষে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের পর এত বিরাট ও বিস্তৃত ধর্ম আন্দোলন ভারতবর্ষে কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ভক্তিবাদের মূল কথা হল ঈশ্বর এক এবং সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। প্রেমই মহৎ ধর্ম। সুতরাং ভক্তিবাদে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার কোনো স্থান নেই।

মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন **রামানন্দ**। তাঁকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভক্তি-আন্দোলনের সেতুরূপে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন রাম ও সীতার উপাসক। তিনি জাতিভেদ প্রথা মানতেন না ও বিভেদ সৃষ্টিকারী সামাজিক অনুশাসনের বিরোধী ছিলেন। রামানন্দ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে একেশ্বরের আরাধনা এবং মানব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করেছিলেন।

রামানন্দ

রামানন্দের বিখ্যাত শিষ্য **কবীর** পঞ্চদশ শতকে জন্মেছিলেন। মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে তিনিই প্রথম জ্ঞাতসারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন। এই দুই ধর্মের কোনটিরই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান তিনি মানতেন না। তিনি প্রচার করেছিলেন যে সব ধর্মই এক। হিন্দুদের রামই মুসলমানদের রহিম। মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। কবীরের দোঁহাগুলি হিন্দী সাহিত্যের সম্পদ। এই দোঁহাগুলির মাধ্যমে তিনি ধর্মের বহু জটিল তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

কবীর

মধ্যযুগের সন্ন্যাসী ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে চিরস্মণীয় হয়ে রয়েছেন **শ্রীচৈতন্যদেব**। ১৪৮৫ (?) খ্রীস্টাব্দে বাংলার নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের মধ্যে তিনি কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন। বৈরাগ্য, ঈশ্বরপ্রেম ও জীবে দয়া—এই ছিল তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা। তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন একজন মুসলমান—'**যবন হরিদাস**'। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম অগণিত মানুষের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। শুধুমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, পূর্ব ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও শ্রীচৈন্তন্যদেবের আবির্ভাব এক নব যুগের সূচনা করেছিল।

শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক আর এক বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক ছিলেন দক্ষিণ ভারতের **বল্লভাচার্য**। শ্রীকৃষ্ণের উপাসক এই পরম বৈষ্ণব জাতিভেদ মানতেন না। তিনি প্রচার করেছিলেন যে জীবসেবা ও ঈশ্বরভক্তিই মুক্তিলাভের একামাত্র উপায় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া ভক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই যুগে মহারাষ্ট্রে যে সব ভক্তিবাদী ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন নামদেব এবং একনাথ। জাতিভেদপ্রথা এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠানবহুল উপাসনার বিরোধী নামদেব হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। একনাথ সর্বপ্রকার অস্পৃশ্যতার বিরোধী



নানক

ছিলেন। তিনি গার্হস্থ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মধ্যযুগের আর এক মহাপুরুষ ছিলেন শিখধর্মের প্রবর্তক **গুরু নানক** (১৪৬৯-১৫৩৮)। তিনি ঘোষণা করেন, 'হিন্দু বলে কেউ নেই, মুসলমান বলে কেউ নেই।' 'রাম ও রহিম এক ও অভিন্ন—এই পরম সত্য।' 'প্রেম ও মৈত্রী সবার ঊর্ধ্বে। মানুষের একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বর। জাতিভেদ মিথ্যা।'

বল্লভাচার্য, নামদেব, একনাথ, গুরু নানক

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ও তীর্থভ্রমণের বাহুল্যের বদলে তিনি সমদৃষ্টি, পবিত্র মন ও বিশুদ্ধ ভক্তিকে প্রকৃত ধর্মের উপাদান বলে মনে করতেন। শিখধর্মের প্রবর্তক ও সংগঠকরূপে পরিচিতি লাভ করলেও নানক নিজেকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে যুক্ত করেননি। তিনি ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই পথপ্রদর্শক। তাই বলা হয়ঃ

'গুরু নানক শাহ ফকির
হিন্দুকা গুরু মুসলমানকা পীর।'

ভক্তিবাদী হিন্দুধর্ম-প্রচারকদের মত মুসলমান সূফী ও ফকিররাও দুই সম্প্রদায়ের

মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। হিন্দু ভক্তিবাদীরা যেমন ইসলামের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সুফী সাধকেরাও তেমনি ভারতীয় চিন্তাধারা, বিশেষ করে হিন্দু বেদান্ত দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে খাজা মুইনউদ্দীন চিশ্‌তি, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, শাহ জালাল প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। এই সব মুসলমান সাধু-ফকির, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আজও ফকিরদের দরগায় হিন্দু ও মুসলমানেরা 'সিন্নী' দেয় ও মানত করে। সত্যপীর পূজা এবং পীরের গান, গ্রাম্যগীতি, ছড়া প্রভৃতি লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম ভাবধারার মিলনের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

সুফী সাধকবৃন্দ

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমন্বয়ের পরিচয়

ভক্তিবাদ বা ভক্তি আন্দোলনের ফল: ভক্তি আন্দোলনের ফলে হিন্দুধর্মে বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথার সঙ্কীর্ণতা কিছুটা হ্রাস পায়। হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের পথ সহজ হয়। উগ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে সে সময়ে হিন্দু ধর্মের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তা রোধ হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।

মধ্যযুগের ধর্মপ্রচারকরা লৌকিক ভাষায় সর্বসাধারণের মধ্যে উপদেশ দিতেন। এর ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল। রামানন্দ ও কবীর হিন্দীতে তাঁদের বাণী প্রচার করায় হিন্দী ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল। অনুরূপভাবে একনাথ মারাঠী ভাষা, নানক ও তাঁর শিষ্যেরা পাঞ্জাবী ও গুরুমুখী ভাষা এবং শ্রীচৈতন্যদেব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও মর্যাদাবৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। এই যুগের বাংলার গীতিসাহিত্যের অপূর্ব উৎকর্ষসাধন করেছিলেন বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। এই সময়ই রাজস্থানে ভক্তিপ্রাণা মীরাবাঈ-এর ভজনাবলী রচিত হয়েছিল।

আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি

সুলতানী যুগের মুসলমান শাসকদের অনেকেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে ইউসুফ শাহ, হুসেন শাহ এবং নসরৎ শাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা বিজয় গুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ), কবি বিদ্যাপতি, মহাভারতের অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কবি শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকরা মুসলমান শাসকদের উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। সুলতানী যুগে রচিত হিন্দী সাহিত্যকীর্তির মধ্যে চাঁদ কবির 'পৃথ্বীরাজরাসো', শরঙ্গধরের 'হামীররাসো' এবং 'হামীর কাব্য', জয়নাকের 'পৃথ্বীরাজ বিজয় মহাকাব্য' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলার মুসলমান শাসকদের সাহিত্যানুরাগ

সুলতানী যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ হয়েছিল। ভারতে এসে আল্-বেরুনী দীর্ঘকাল সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে কাশ্মীরে কহ্লন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী' রচনা করেন। সায়নাচার্য বেদের ভাষ্য লিখে বিখ্যাত হন। রামানুজের ব্রহ্মসূত্রের টীকা এবং বিজ্ঞানেশ্বরের "মিতাক্ষরা" নামে হিন্দু-আইনের বিখ্যাত গ্রন্থ সংস্কৃতে সমসাময়িক কালের উল্লেখযোগ্য রচনা।

সংস্কৃত সাহিত্য

মুসলমান আক্রমণের পর প্রায় ২০০ বছর ধরে সেনা শিবিরে এবং বাজারে লোকের মুখে মুখে একটি চলতি আঞ্চলিক ভাষার জন্ম হয়। এর নাম 'জাভন-ই-হিন্দওয়াই' (Javan-i-Hindawi)। এদেশীয় ভাষা এবং ফার্সী ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষা গড়ে ওঠে এবং পরে উর্দু ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করে। তুর্ক-আফগান আমলে উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। হিন্দুস্থানীরই বিভাষা উর্দু। আরবী ও ফার্সী শব্দবহুল এই ভাষা লেখা হয় ফার্সী অক্ষরে। কবি আমীর খসরুকে এই ভাষার অন্যতম আদি লেখক মনে করা হয়। উর্দু উত্তর ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত মিলনের সূত্রপাত করেছিল।

উর্দু ভাষার উদ্ভব

দিল্লীর সুলতানরা ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই ভাষায় বহু সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ সুলতানী যুগে রচিত হয়েছিল। আমীর খসরু, হাসান, দেহলবী প্রমুখ কবিরা ফার্সী কাব্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রন্থও পারসীক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ফার্সী সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানরূপে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির মূল্য অসীম।

ফার্সী সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সুলতানী আমলের শাসকেরা শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। এই যুগের শিল্পরীতি হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই জন্য এই শিল্পরীতিকে ইন্দো-ইসলামী (Indo-Islamic) শিল্প বা স্থাপত্য রীতিরূপে বর্ণনা করা হয়। মুসলমানরা প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণকার্যে বহু হিন্দু-শিল্পী নিয়োগ করতেন। অনেক সময় হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপকরণ ব্যবহার করে কিংবা কোন প্রাচীন মন্দিরের পরিবর্তন করে মসজিদ নির্মাণ করা হত। এর ফলেও হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির মিশ্রণ ঘটেছিল।

শিল্পের উন্নতি ও ইন্দো-ইসলামী শিল্প-রীতির জন্ম

ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান শাসকেরাও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহ ও আনুকুল্যে জৌনপুর, গুজরাট, মালব, বাংলাদেশ, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পরীতির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাদেশিক স্থাপত্যরীতির প্রয়োগ-কৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে জৌনপুরের 'অতালা মসজিদ', আহমদাবাদের 'জাম-ই-মসজিদ' ও 'সিদি-সৈয়দ মসজিদ', মালবের মাণ্ডুদুর্গ, 'কামালমৌলা মসজিদ', বাংলাদেশে পাণ্ডুয়ার

প্রাদেশিক শিল্পরীতি

'আদিনা মসজিদ' ও একলাখী সমাধিমন্দির, গৌড়ের 'বড় সোনা' ও 'ছোট সোনা' মসজিদ, 'লোটন মসজিদ', 'কদম রসুল', দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদের 'চাঁদমিনার', গুলবর্গার 'জাম-ই-মসজিদ', বিজাপুরের গোলগম্বুজ, বিদরের মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন-গুলির বেশীর ভাগই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মেবারের রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ ও কুম্ভলগড় দুর্গ, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের বিঠ্ঠল স্বামীর মন্দির ইত্যাদি হিন্দুরাজাদের শিল্পপ্রীতির স্বাক্ষর বহন করছে।

উল্লেখযোগ্য নিদর্শন

হিন্দুরাজাদের শিল্পপ্রীতি

সুলতানী যুগের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের অভাব থাকলেও সাম্রাজ্য যে অতুল সম্পদশালী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি বা ধনসম্পত্তির সুষম বণ্টন সম্বন্ধে কোন সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা করা হয়নি। আমীর-ওমরাহদের হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত ছিল। সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। অবশ্য জিনিসপত্রের দাম খুব সস্তা থাকায় সাধারণভাবে তাদের অভাব-অনটন কম ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোন কারণে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব দেখা দিলে প্রজাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠত। স্বৈরাচারী সুলতানী শাসন-ব্যবস্থায় জনকল্যাণ-মূলক নীতি গ্রহণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্দশার সীমা থাকত না। কৃষিকার্য ছিল অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা। শহরে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রচলন ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দু বণিকদের প্রাধান্য ছিল। বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে স্থলপথেও ব্যবসা-বাণিজ্য হত। সামগ্রিকভাবে প্রাচুর্য ও অভাব, ধনী ও দরিদ্রের পাশাপাশি অবস্থান ছিল সুলতানী যুগের অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ অর্থনীতি স্বনির্ভর হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনে নাগরিক জীবনের জটিলতা ছিল না। রাজনৈতিক আবর্তের সঙ্গেও তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

অর্থনৈতিক জীবন

বৈদেশিক বাণিজ্য

মুসলমান আক্রমণের প্রতিক্রিয়ারূপে হিন্দু ধর্ম ও সমাজে যে রক্ষণশীলতা দেখা দিয়েছিল ইতিপূর্বেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই যুগে হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই পুরুষের প্রাধান্য ছিল। সম্মান ও মর্যাদার পাত্রী হলেও নারীরা পর্দানশীন হয়ে উঠেছিল। অবরোধপ্রথা কঠোরতর হওয়ার মূলে ছিল বৈদেশিক, বিশেষ করে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে সৃষ্ট আশঙ্কার মনোভাব। ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের রীতিনীতি এবং আচার-ব্যবহার কিছুটা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

সামাজিক অবস্থা

ধনবণ্টনের কোনো সুষম ব্যবস্থা না থাকায়, ধন বৈষম্য ছিল। আমীর ওমরাহ, অভিজাত শ্রেণী ও সামন্ত বা জমিদার শ্রেণীর হাতে অর্থের প্রাচুর্য ছিল। তারাই বেশীর ভাগ জমির ভূস্বামী ছিল এবং কৃষকরা ভূমিদাস রূপে ব্যবহৃত হত।

মুঘল যুগ (১৫২৬–১৭০৭)

(The Mughal Age 1526-1707)

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. T. Road

প্রথম অধ্যায় | মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান

মুঘল যুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

মুঘল যুগ সম্বন্ধে সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনা, বিবরণ, স্মৃতিকথা ইত্যাদি প্রচুর রয়েছে। এই উপাদানগুলির বেশীরভাগই ফার্সী ভাষায় রচিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আনুকূল্যে রচিত হওয়ায় এই ধরনের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ তথ্যমূলক, সত্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নয়। তাছাড়া ঐ গ্রন্থগুলি রচনার সময়ে সম্রাটের জীবনযাত্রা, তাঁর গৌরবগাথা ও প্রশস্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় সমসাময়িক কালের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য কম পাওয়া যায়।

ফার্সী ভাষায় লেখা গ্রন্থ

প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের স্মৃতিকথা 'তুজুখ-ই-বাবুরি' (Tuzuk-i-Baburi), জাহাঙ্গীরের লেখা 'তুজুখ-ই-জাহাঙ্গীরি', গুলবদনের 'হুমায়ুন-নামা', আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা', আব্বাস সারওয়ানির 'তারিখ-ই-শেরশাহী' (Abbas Sarwani : Tarikh-i-Sher-shabai) ইত্যাদি গ্রন্থের বিশেষ মূল্য আছে। বদায়ুনী, ফিরিস্তা, কাফ খাঁ প্রমুখ ইতিহাস লেখকদের গ্রন্থগুলিতে মূল্যবান উপাদান আছে। শাহজাহান সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনায় উৎসাহ দিতেন। ঔরংজীবের রাজত্বের প্রথম দশ বছরের তথ্য নির্ভর গ্রন্থ হল মির্জা মহম্মদ কাজিমের 'আলমগির নামা'।

ভারতীয় ভাষায় লেখা গ্রন্থ

রাজস্থানী, মারাঠী ভাষায় লেখা গ্রন্থ থেকেও মুঘলযুগের ইতিহাসের তথ্য পাওয়া যায়। এই ধরনের রচনাগুলির মধ্যে শিবাজীর সময়ে লেখা 'সভাসদ বখর' নামে একটি মারাঠী গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। রাজপুতদের সম্বন্ধে টডের বিখ্যাত বই Annals and Antiquities of Rajasthan রাজপুত চরণগাথা ও কাব্যের ওপর নির্ভর করে লেখা হয়েছিল। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য এই কারণে অনেকখানি কম।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ

মুঘল আমল সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে যাঁরা বিবরণ ও ইতিবৃত্ত লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন পেছ, বারবোসা, রলফ ফিচ্, টেরী, স্যার টমাস রো, টেভার্নিয়ে, বার্ণিয়ে, মানুচি, কারেরি ইত্যাদি।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও বৈদেশিক বিবরণ মুঘল যুগের ইতিহাসের

প্রধান উপাদান হলেও অন্যান্য উপাদানও আছে। যেমন ঔরংজীব ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালের অনেক সংবাদ-লিপি (আকবরাত্) পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রাচীন ইতিহাসের মত মুঘল যুগের ইতিহাস লেখার জন্য মুদ্রা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, শিল্পকলা, চিত্রকলা, স্মৃতিস্তম্ভ ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য উপাদান

মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণভাবে দিল্লীর সুলতানরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের আনুগত্য লাভে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অনুদার ধর্মনীতি সুলতানী শাসন ব্যবস্থার এক বড় দুর্বলতা ছিল। বার বার মোঙ্গল আক্রমণ সুলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। কোন কোন সুলতান সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করেও মোঙ্গল আক্রমণ রোধ করতে পারেননি। তৈমুরলঙ্গের ভয়াবহ আক্রমণের ফলে সুলতানী সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তিম লগ্ন যখন আসন্ন সেই সময়ে লোদী বংশের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে বাবর দিল্লী আক্রমণ করে এই সাম্রাজ্যের পতন সম্পূর্ণ করেন।

ফিরোজ তুঘলকের দায়িত্ব

অনুদার ধর্মনীতি

মোঙ্গল আক্রমণ

বাবর (১৫২৬-১৫৩০)ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা **জহিরউদ্দীন মহম্মদ বাবর** জাতিতে চাঘতাই তুর্কী ছিলেন। তাঁর পিতৃকুল তৈমুরলঙ্গের এবং মাতৃকুল চিঙ্গীজ খাঁর বংশধর। বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্জা ছিলেন মধ্য এশিয়ার ক্ষুদ্র ফরগনা রাজ্যের অধিপতি। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর শত্রুর চক্রান্তে কিশোর বাবর সিংহাসনচ্যুত ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। জীবনের পরবর্তী কয়েক বছর অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে প্রতিকূল পরিবেশ ও ভাগ্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি আফগানিস্থানের **'পাদশা'** বা সম্রাট উপাধি নেন এবং আফগানিস্থানে তাঁর পাদশাহী শাসনক্ষমতা দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।



বাবর

পাদশাহী শাসন

প্রথম পানিপথের যুদ্ধের পূর্বে বাবর তিনবার ভারত সীমান্ত আক্রমন

করলেও স্থায়ী সাফল্যলাভ করতে পারেননি। কিন্তু লোদী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধ, মুঘলবাহিনীর উন্নততর রণকৌশল, কামান-বন্দুকের ব্যবহার ও নিজের

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬

সাহস ও সুযোগ্য নেতৃত্বে **পানিপথের প্রথম যুদ্ধে** (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর বিজয়ী হয়েছিলেন।

ভারতে মুঘল অধিকার বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ছিলেন মেবারের রাণা **সংগ্রাম সিংহ বা সঙ্গ**। তাঁর বাসনা ছিল সমগ্র উত্তর ভারতে এক রাজপুত সাম্রাজ্যের

খানুয়ার যুদ্ধ ১৫২৭)

প্রতিষ্ঠা। আফগান নেতা মামুদ লোদী ও রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাঁর সঙ্গে বাবরের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীর কাছে **খানুয়ার যুদ্ধে** বাবর জয়লাভ করেন। সুনিপুণ রণকৌশল ও গোলাবারুদের কাছে সাহস ও বীরত্বের পরাভব হয়। এরপর বাবর মধ্যভারতের চন্দেরী দুর্গ

গোগরার যুদ্ধ (১৫২৯)

জয় করেন এবং ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে পাটনার কাছে **গোগরা** নদীর তীরে বাংলা ও বিহারের আফগান নেতাদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। পরের বছর (১৫৩০) তাঁর মৃত্যু হয়।

বাবরের চরিত্রে বহু রাজকীয় ও মানবিক গুণের প্রকাশ হয়েছিল। তিনি একদিকে

চরিত্র

যেমন অসীম সাহস, বীরত্ব, আত্মবিশ্বাস ও রণকৌশলের অধিকারী ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি ছিলেন উদার, দানশীল, বন্ধু-বৎসল, শিল্পরসিক ও সাহিত্যানুরাগী।

তিনি নিজে সুকবি ছিলেন ও তাঁর আত্মজীবনী **'বাবর-নামা'** মধ্যযুগের ইতিহাস ও সাহিত্যের এক সম্পদ। আকবরের সময়ে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'বাবর-নামা'

আত্মজীবনী

ফার্সী ভাষায় আব্দুল রহিম খান-ই-খানান (**Abdul Rahim Khan-i-Khanan**) অনুবাদ করেন। পরে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লেইডেন (**Leyden**) ইংরাজীতে ও এরস্কিন (**Erskin**) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

হুমায়ুন (১৫৩০-৩৯ ; ১৫৫৫-৫৬) : বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র **হুমায়ুন** দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। মুঘল সাম্রাজ্য তখনও সুদৃঢ় হয়নি।

হুমায়ুনের সংকট

গুজরাটের **সুলতান বাহাদুর শাহ** ও আফগান নেতা **শের খাঁ** ছিলেন হুমায়ুনের প্রধান শত্রু। তিনি নিজেও পিতার মত দৃঢ়চিত্ত বা রণকুশল ছিলেন না। এর ফলে হুমায়ুনকে ভীষণ সংকট ও দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

মুঘল-আফগান যুদ্ধ : প্রথমে হুমায়ুন মধ্যভারতের কালঞ্জর দুর্গের

প্রাথমিক সাফল্য

হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে সফল অভিযান করেন। এই রাজা আফগানদের মিত্র ছিলেন। তারপর আফগান নেতা শের খাঁর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করে হুমায়ুন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর

হন ও মালব এবং গুজরাট জয় করেন। কিন্তু গুজরাট অভিযান সম্পূর্ণ হবার আগেই পূর্ব ভারতে শের খাঁ আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠায় হুমায়ুন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সুযোগে বাহাদুর শাহ তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

গুজরাট অভিযান

১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন আফগানবাহিনীর কাছে পরাজিত হন। বিজয়ী শের খাঁ 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। পরের বছর কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহের কাছে আবার পরাজিত হয়ে হুমায়ুন বহু দুঃখকষ্ট ও বিড়ম্বনার পর পারস্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শের শাহ আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করেন। শের শাহের মৃত্যুর পর আফগান শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই সুযোগে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরায় অধিকার করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই (১৫৫৬) আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

হুমায়ুন ও শের খাঁর বিরোধ

চৌসার (১৫৩৯) ও বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০) হুমায়ুনের পরাজয় ও পলায়ন

প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু

শের শাহ (১৫৩৯-১৫৪৫)ঃ বিহারের অন্তর্গত সাসারামের শূরবংশীয় বা পাঠান জায়গীরদারের পুত্র ফরিদ খাঁ বা শের খাঁর অদ্ভুত জীবন-কাহিনী সুপরিচিত। দুঃখকষ্ট ও ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও বাহুবলে গৌড় এবং বিহারের সুরক্ষিত রোটাসগড় দুর্গটি অধিকার করে পূর্ব ভারতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। প্রথমে যখন হুমায়ুন আফগানদের দমন করতে পূর্ব ভারতে আসেন তখন সুচতুর শের খাঁ আনুগত্য স্বীকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। পরে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করে ও উপযুক্ত সময় বুঝে তিনি হুমায়ুনের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করে শের শাহ উত্তর ভারতে আফগান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। চৌসার যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি "শের শাহ" উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তিনি আর মাত্র কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব, মালব, সিন্ধু এবং রাজপুতানার বিভিন্ন

শের শাহ (১৫৩৯-১৫৪৫)

আফগান অধিকার প্রতিষ্ঠা



শের শাহ

রাজ্য ও দুর্গ জয় করেছিলেন। সম্ভাব্য মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য পাঞ্জাবে রোটাস দুর্গ নির্মাণ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলায় প্রাদেশিক শাসনকর্তা খিজির খাঁর বিদ্রোহ দমন করে এবং ভবিষ্যতে যাতে বিদ্রোহ না হয় তার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ লোপ করে, সমগ্র বাংলাকে উনিশটি 'সরকারে' বিভক্ত করেছিলেন। বাংলার বিদ্রোহ দমনের পর তিনি মধ্যভারতের গোয়ালিয়র এবং মালব রাজ্য জয় করেছিলেন। অল্পকালের মধ্যে রণথম্বোর, চান্দেরী এবং চিতোর প্রভৃতি রাজপুতানার খ্যাতনামা দুর্গগুলি অধিকার করেন। প্রয়োজন বোধে সামরিক শক্তি ছাড়া তিনি চাতুরীর আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে কালঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় এক বিস্ফোরণের ফলে শের শাহের মৃত্যু হয়।

রাজ্যবিস্তার

শাসন ব্যবস্থা ঃ সামরিক সাফল্যের থেকেও **রাজ্য শাসন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে শের শাহের সাফল্য ছিল চমকপ্রদ**। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তিনি তাঁর সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে সাতচল্লিশটি সরকারে এবং প্রত্যেকটি সরকারকে কয়েকটি পরগনায় ভাগ করেছিলেন। কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে পরগণা গঠিত হয়েছিল। সরকারের শাসনভার ছিল, 'শিকদার-ই-শিকদারান' ও 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' নামে দু'জন রাজকর্মচারীর ওপর। 'শিকদার' দেশরক্ষা ও প্রজা-শাসনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। মুনসিফ রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় দেখা-শোনা করতেন। প্রত্যেক পরগনায় 'আমিন', 'শিকদার', 'খাজাঞ্চী' ও দু'জন 'কারকুন' নামে রাজকর্মচারী নিযুক্ত হতেন।

শাসনতান্ত্রিক বিভাগ ঃ সরকার, পরগণা এবং গ্রাম

রাজকর্মচারীবৃন্দ

কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষেত্রে কোন রকম বড় পরিবর্তন হয়নি। সামরিক ও অসামরিক সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট নিজে। কুতবউদ্দিন মুবারক খলজির উদাহরণ অনুসরণ করে শেরশাহ 'খালিফাতুজ্জামান' (Khalifatuzzaman) উপাধি গ্রহণ করেন। এর অর্থ হল মুসলমান ধর্মযাজক খলিফাদের ধর্মীয় অধিকারের উপরে মহিমান্বিত রাজকীয় শক্তির মর্যাদা দান। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ও কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করা তাঁর কৃতিত্ব।

রাজস্ব নীতি ঃ শের শাহই দিল্লীর একমাত্র শাসনকর্তা যিনি সিংহাসনে বসবার পূর্বেই ভূমি রাজস্ব নিরূপণ করা ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তিনি আলাউদ্দিনের রাজস্ব নীতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হন।

ভূমি ও রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রতি শের শাহ বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল। যোগ্য কর্মচারীদের সহায়তায় এই বিভাগের সর্বস্তরে তিনি আমূল ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার করেছিলেন। সম্ভাব্য

কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ অনুমানভিত্তিক না-করে তিনি **জমি জরিপ ও জমির সীমানা নির্দেশ** করে হিসাব করার প্রথা প্রবর্তন করেন। রাজস্বের হার সুনির্দিষ্ট করা হয়। ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা সমপরিমাণ অর্থ খাজনারূপে নির্ধারিত হয়।

ভূমি-রাজস্ব সংস্কার: পাট্টা ও কবুলিয়ত

সকল আবাদী জমি উর্বরতার বিচারে উৎকৃষ্ট, মন্দ এবং মাঝারি—এই তিন শ্রেণীতে চিহ্নিত হয়। সকল শ্রেণীর জমির বার্ষিক গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হত। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে কৃষকদের আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা দূর হয়। আবাদী জমির পরিমাণ, কি ধরনের ফসল উৎপাদিত হয় এবং কতটা খাজনা দিতে হবে তা একটি দলিলে লেখা হত। এই দলিল বা পাট্টাতে কৃষকের অধিকার এবং খাজনার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হয়। সকল কৃষককে তাদের দেয় খাজনা দেবার সম্মতি জানিয়ে একটি **কবুলিয়ত** স্বাক্ষর করতে হত। **পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথার** প্রবর্তন করে শের শাহ জমিদার ও প্রজার পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্যের নির্দেশের ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুসংহত করেছিলেন।

শের শাহের ভূমি-রাজস্ব নীতির বৈশিষ্ট্য

দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সতর্কতা এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা-হিসাবে বিঘা প্রতি ২½ সের হারে উপকর (cess) ধার্য করা হয়েছিল। দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে কৃষকদের বিশেষ গুরুত্বের ওপর শের শাহ জোর দিয়েছিলেন। কৃষকদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন দেশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর বলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণে তিনি যথাসাধ্য কৃষক নির্যাতন ও তাদের প্রতি অবিচার বন্ধ করতে সচেতন হয়েছিলেন। এই বিষয়ে তিনি অনেকখানি সফল হলেও তাঁর রাজত্বকাল অত্যন্ত স্বল্প হওয়ায় তাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সাফল্যের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সরকার এবং কৃষকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন এবং মধ্যস্বত্ব ভোগীদের ভূমিকা যথাসম্ভব গৌণ করার চেষ্টা করে শের শাহ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ও অন্যান্য সংস্কার

মুদ্রানীতির সংস্কার ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন, বাণিজ্যশুল্ক হ্রাস, যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ, ডাক ব্যবস্থার উন্নতি, বিচার-বিভাগ ও সামরিক বিভাগের সংস্কার এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন নীতি ও কার্যাবলীর জন্য শের শাহ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ন্যায় বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনে শের শাহ বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

বিচার-ব্যবস্থা

তিনি বলতেন যে "ন্যায় বিচারই হল শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় আচরণ।" নিজের আত্মীয়, স্বধর্মীয় লোক বা যত উচ্চপদস্থই হোক না কেন, কোন অপরাধীই শাস্তিলাভ থেকে অব্যাহতি পেত না। বিভিন্ন পদমর্যাদার কাজীরা বিচার করতেন। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় জমিদাররা ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করত।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির ওপর ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। গুরুত্বপূর্ণ রাজপথগুলির ধারে ধারে তিনি সরাই নির্মাণ করেন। সরাইগুলিতে পথচারী ও ভ্রমণকারীদের থাকা, খাওয়া ও সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। সরাইগুলির আশেপাশে গ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। অনেক সরাই বাজার-শহরে (market towns) পরিণত হয়েছিল। সরাইগুলি 'ডাক-চৌকী' রূপেও ব্যবহৃত হত। রাজপথ ও সরাইগুলিকে শের শাহের সাম্রাজ্যের ধমনী (arteries) রূপে বর্ণনা করা হয়। শের শাহের আর এক বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তিনিই মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দেশ ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতার স্থান নেই ; উদার শাসনব্যবস্থা ও সকল শ্রেণীর প্রজার প্রতি সমদৃষ্টি রাষ্ট্রকে সুসংহত করতে পারে। এই বিষয়ে শের শাহ আকবরের পূর্বগামী ছিলেন। অবশ্য আকবরের মতো তিনি ধর্মনীতিতে কোনও মৌলিক পরিবর্তন করেননি। তিনি উলেমাদের দ্বারা পরিচালিত হতেন না। কিন্তু রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্যজয়ের প্রয়োজনে তিনি ধর্মযুদ্ধ বা 'জেহাদ'-এর ডাক কখনও কখনও দিয়েছিলেন। হিন্দুদের কাছ থেকে 'জিজিয়া' আদায় করা হতে থাকে। যদিও ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামে একজন হিন্দু তাঁর বিশ্বস্ত ও উচ্চপদস্থ সেনাপতি ছিলেন তবুও অভিজাত ওমরাহ ও রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন পাঠান।

সরাই নির্মাণ ও তার গুরুত্ব

ধর্মনীতি

শের শাহ আলাউদ্দিনের মত সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক কর বা খাজনা দেওয়ার প্রথা তখনও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। দুর্নীতি রোধ করার জন্য সৈন্যবাহিনীর ঘোড়াগুলিকে চিহ্নিত করে নথিভুক্ত করার প্রথা তিনি পুনঃপ্রবর্তন করেন। শের শাহের সৈন্যবাহিনীর সংগঠন, আকবরের মনসবদারী প্রথার প্রবর্তনে সাহায্য করেছিল।

শের শাহের সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি হল যে তিনি নিজের চেষ্টায় অতি অল্প সময়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আফগানরা তাঁর মৃত্যুর পর সে সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেনি।

মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : শের শাহের পর তাঁর পুত্র **ইসলাম শাহ** (১৫৪৫-১৫৫৪) কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং এই সুযোগে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার করেন (১৫৫৫)। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর নাবালক জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর দিল্লীর বাদশাহ হন (১৫৫৬)।

শের শাহের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের ও আফগান সাম্রাজ্যের পতন

দ্বিতীয় অধ্যায় | আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) : ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুদেশে অমরকোটে যখন আকবরের জন্ম হয় তখন তাঁর পিতা হুমায়ুন রাজ্যহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এর দু'বছর পরে হুমায়ুন উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁর ভাইদের বিদ্রোহ দমন করে ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দে শূর বংশীয় সম্রাটদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ভারতবর্ষে পুনরায় অভিযান করেন। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি লাহোর জয় করেন। পাঞ্জাবের বিদ্রোহী শাসনকর্তা, আফগানদের দ্বারা ঘোষিত সম্রাট সিকান্দর শূরকে তিনি পরাজিত করেন এবং দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। এইভাবে হুমায়ুন তাঁর হৃত রাজ্যের কিছু অংশ উদ্ধার করেন। কিন্তু এর পর তিনি বেশী দিন বাঁচেন নি। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

হুমায়ুনের পুত্র আকবর এই সময়ে তাঁর পিতৃবন্ধু এবং অভিভাবক সমরকুশলী, দক্ষ বৈরাম খাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবে ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে তের বছর বয়সে বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তখন মুঘল সাম্রাজ্য কেবলমাত্র দিল্লী, আগ্রা ও পাঞ্জাব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ (১৫৫৬-১৬০৫) ছিল।

আকবর

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার : আকবর এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম উত্তর ও মধ্য ভারতের উপর তাঁর আধিপত্য স্থাপন করেন। নিজের চেষ্টায় ও বুদ্ধিতে তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন সেই সাম্রাজ্য তাঁর সামরিক কৌশল, সংগঠন শক্তি ও প্রতিভার সাহায্যে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্য সংগঠনের মূলে প্রধানতঃ **নিম্নলিখিত নীতিগুলি** কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়েছিল।

(১) সামরিক অভিযানের দ্বারা রাজ্য জয় (২) বিদ্রোহ দমন (৩) রাজপুত নীতি (৪) শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করণ (৫) সৈন্য সংগঠন ও মনসবদারী ও জায়গীরদারী প্রথার প্রবর্তন (৬) উদার ধর্মীয় নীতি।

সামরিক অভিযান : হুমায়ুনের মৃত্যুর পরই শের শাহের অন্যতম উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিল শাহ শূরের হিন্দু সেনাপতি ও মন্ত্রী **হিমু** দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নিজেকে দিল্লীর অধিপতিরূপে ঘোষণা করেন। এই চরম সঙ্কটকালে আকবরের অভিভাবক ছিলেন

নাবালক আকবরের সংকট ও সমস্যা

বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ ও রণকুশল **বৈরাম খাঁ**। তিনি আকবরকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে হিমুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং **পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে** (১৫৫৬) হিমুকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত ও নিষ্কণ্টক করেন।

দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ (১৫৫৬)

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের পথ সুগম করে দিয়েছিল। এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আফগান-মুঘল দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং মুঘলরা তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। শীঘ্রই দিল্লী এবং আগ্রা মুঘলদের অধীনে আসে।

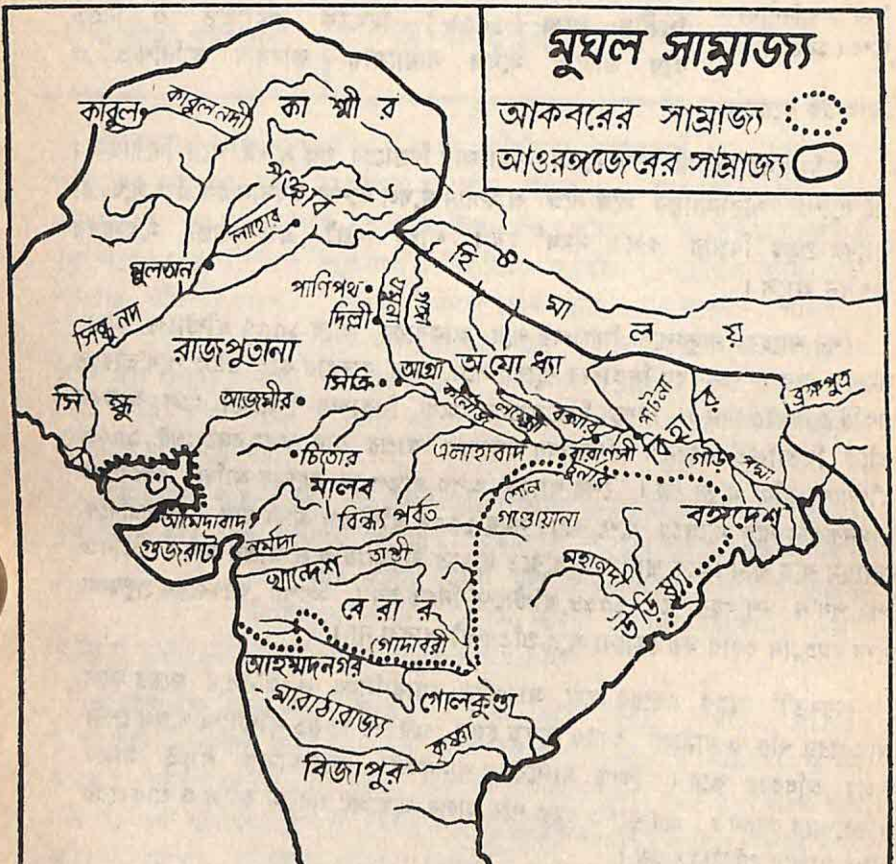
শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র সিকান্দর শুর আকবরের কাছে ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে আত্মসমর্পণ করে। আকবর সিকান্দর শুরের সঙ্গে উদার ব্যবহার করে তাঁকে পূর্বভারতে একটি জায়গীর দেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে সিকান্দর বিদ্রোহী হলে আকবর তাঁকে বিতাড়িত করেন। সিকান্দর বঙ্গদেশে আশ্রয় নেন এবং বঙ্গদেশেই ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। শের শাহের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ আদিল বঙ্গদেশের শাসনকর্তার সঙ্গে মুঙ্গেরে যুদ্ধ করার সময় ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। অপরদিকে ইব্রাহিম শুর স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে ঘুরতে উড়িষ্যায় এসে আশ্রয় নেন। তিনিও শেষ পর্যন্ত দশ বছর পরে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। এরপর আকবরের প্রভুত্বকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করার মত কোনো শুর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকল না।

পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে আজমীর, গোয়ালিয়র ও জৌনপুর জয়ের ফলে আকবরের শক্তি ও সাম্রাজ্য আরও সুদৃঢ় হয়। এর পর ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সৈন্য মালব অধিকার করে। কিন্তু মালবের শাসনকর্তা বজবাহাদুর শীঘ্রই মালব পুনরুদ্ধার করেন। এর কয়েক বছর পরে মালব মুঘলের অধীনে আসে ও আকবরের শাসন মালবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্রোহ দমনঃ বয়ঃপ্রাপ্ত আকবর বৈরামের অভিভাবকত্ব, তাঁর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও ঔদ্ধত্যে অসন্তুষ্ট হয়ে বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করেন। অপমানিত বৈরাম বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্যর্থ হন এবং মক্কাযাত্রার পথে আততায়ীর হাতে নিহত হন (১৫৬১)। কিছুকাল **ধাত্রীমাতার প্রভাবাধীন** হয়ে রাজ্যশাসন করার পর ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে আকবর সম্পূর্ণ নিজের হাতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

বৈরাম খাঁর পদচ্যুতি, বিদ্রোহ ও মৃত্যু

আকবরকে একাধিক বিদ্রোহ দমন করতে হয়। আবদুল্লা খাঁর নেতৃত্বে উজবেগ বিদ্রোহ এবং খান জামান খাঁর বিদ্রোহ তিনি ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে দমন করেন। আকবরের সৎ ভাই মির্জা মহম্মদ হাকিম কয়েকজন আমীর ওমরাহের চক্রান্তে বিদ্রোহ করলে


মুঘল সাম্রাজ্য
আকবরের সাম্রাজ্য
আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য
কাবুল
কাবুল নদী
কাশ্মীর
পঞ্জাব
লাহোর
মুলতান
সিন্ধু নদ
পাণিপথ
দিল্লী
রাজপুতানা
সিক্রি
আগ্রা
অযোধ্যা
সিন্ধু
আজমীর
হিমালয়
পাটনা
বিহার
ব্রহ্মপুত্র
এলাহাবাদ
বারাণসী
চুনার
গৌড়
পদ্মা
চিতোর
মালব
বিন্ধ্য পর্বত
শোন
গণ্ডোয়ানা
বঙ্গদেশ
আমেদাবাদ
গুজরাট
নর্মদা
তাপ্তী
খান্দেশ
বেরার
মহানদী
উড়িষ্যা
গোদাবরী
আহম্মদনগর
মারাঠারাজ্য
গোলকুণ্ডা
কৃষ্ণা
বিজাপুর
কাবেরী
তাঞ্জোর
মাদুরা
রামেশ্বর
ভারত মহাসাগর

আকবর ১৫৮১ সালে এই বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া তাঁর আত্মীয় মির্জারা, তুর্কী ও মোঙ্গল শাসনকর্তারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই সব বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে আকবর শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন।

পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর ধরে রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করে আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। সামরিক শক্তির সঙ্গে কূটনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে আকবর একের পর এক মালব, গণ্ডোয়ানা, রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্য, গুজরাট, বঙ্গদেশ, কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধু, উড়িষ্যা, বেলুচিস্তান ও কান্দাহার জয় করে সমগ্র উত্তর ভারত তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে আহম্মদনগর ও খান্দেশ তিনি জয় করেছিলেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার

আকবরের রাজপুত নীতি ঃ আকবর শুধু সমরকুশলী নায়ক ছিলেন না। তিনি একজন কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন দক্ষ সমরকুশলী ছিলেন। রাজপুত নীতির মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

আকবর বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয়রা মুঘলদের বিদেশী শক্তি মনে করে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে ও মুঘল শাসনকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে ভারতীয়দের শুভেচ্ছা ও বিশেষ করে রাজপুত শক্তির আনুগত্য প্রয়োজন। রাজপুত শক্তি শুধু বীর সমরকুশলী নয়, রাজপুতরা বিশ্বস্ত ও অনুগত। এই কারণে তিনি সাম্রাজ্যে মুসলমান আমীর-ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ মনসবদারদের মত সমান পদমর্যাদা দিয়ে রাজপুতদের নিয়োগ করেছিলেন। তিনি আফগান শক্তির বিরুদ্ধে রাজপুত শক্তিকে মুঘল শক্তির অনুকূলে সংহত করেছিলেন।

তিনি রাজপুত শক্তির সঙ্গে বশ্যতার পরিবর্তে মিত্রতা নীতি অনুসরণ করেছিলেন। সেজন্য অনুগত রাজপুত রাজাদের নিজ নিজ রাজ্যে আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিয়েছিলেন। তিনি রাজপুতদের শৌর্য, বীর্য, দক্ষ শাসন ক্ষমতা ও প্রতিভা মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসনের কাজে লাগিয়েছিলেন। রাজপুতদের সম্বন্ধে তাঁর উদার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের ভীত সুদৃঢ় করেছিল।

আকবর ন্যায়পরায়ণ ও উদারনৈতিক সম্রাট ছিলেন। সুতরাং তাঁর রাজপুত নীতি শুধু মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করবার জন্যই অনুসৃত হয়নি, এর পিছনে আকবরের জাতিয়তাবাদী উদার ধর্মনীতি ও আদর্শবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে বীর রাজপুত জাতির মৈত্রী ও সহযোগিতা মুঘল সাম্রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই বলপ্রয়োগ করে রাজপুত রাজাগুলি জয় করার পরিবর্তে তিনি **উদার শর্ত ও বৈবাহিক সম্পর্কের** বিনিময়ে অম্বররাজ বিহারীমল ও অন্যান্য রাজপুত রাজাদের বশ্যতা অর্জন করেন।

রাজপুত নীতি



রাণা প্রতাপ

মেবারের **রাণা উদয়সিংহ** আকবরের অধীনতা মানতে অস্বীকার করলে মুঘল-বাহিনী চিতোর আক্রমণ করে। নিরাপত্তার জন্য উদয়সিংহ পার্বত্য-অঞ্চলে আশ্রয় নেন। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেও রাজপুতরা চিতোর দুর্গ রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। উদয়সিংহের পুত্র **রাণা প্রতাপ** কোন ভয় বা প্রলোভনেই নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চাইলেন না। **হলদিঘাট বা গোগুণ্ডার** যুদ্ধে (১৫৭৬) প্রতাপ আকবরের বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। রাজ্যহীন, সম্বলহীন, সহায়হীন রাণা প্রতাপ যেভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বাধীনতা ও সম্মানের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তার তুলনা নেই। মৃত্যুর পূর্বে (১৫৯৭) এই রাজপুত বীর মেবারের বহু দুর্গ পুনরুদ্ধার করলেও তাঁর সাধ ও স্বপ্নের চিতোর তিনি উদ্ধার করতে পারেননি।

মেবারের সঙ্গে বিরোধ

গণ্ডোয়ানার বীরাঙ্গনা **রাণী দুর্গাবতী** ও আহম্মদনগরের **চাঁদ সুলতানা** প্রবল বিক্রমে মুঘলবাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা দেশের **বার ভুঁইয়া** নামে খ্যাত হিন্দু ও মুসলমান সামন্তরাজারা মুঘলদের বিরুদ্ধে নিজেদের রাজ্য রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য ও বাকলার কন্দর্পনারায়ণ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের বিদ্রোহের মধ্যে উচ্চাশা ও স্বাধীন চিত্তের পরিচয় সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালে ঐ উচ্চাশা, দুর্জয় সাহস ও মনোবল বাঙালীর নবজাগ্রত দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রাণী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতানা ও বার ভুঁইয়াদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ

শাসন ব্যবস্থা ঃ রাজ্যশাসন ও পরিচালনায় আকবর বিশেষ দক্ষতা, দূরদৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। শাসন ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারে তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের, বিশেষ করে আলাউদ্দীন খলজী এবং শের শাহের নীতি এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তেমনি পরবর্তী যুগে ব্রিটিশ শাসকরা আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার ভিত্তিতেই তাঁদের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টি করেছিলেন।

শাসন-ব্যবস্থা

আকবরের রাজসভার ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন যে সম্রাট ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন গুণের আধার। প্রজা হিতৈষণা ও ন্যায়-পরায়ণতা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য। এই আদর্শে বিশ্বাসী আকবর সার্বিক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে 'উলেমা' ও 'মিল্লাত' (মুসলমান জনসমষ্টি)-এর প্রভাবমুক্ত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। রাজকার্যের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান তিনি করতেন ও প্রজাদের সঙ্গে তাঁর নিয়ত যোগাযোগ ছিল। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে 'ভকিল' বা প্রধান-মন্ত্রীর পদের গুরুত্ব থাকলেও পরে এই পদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে বলা হত 'দেওয়ান' বা 'ওয়াজীর'। তিনিই রাজস্ব ও ব্যয়ের দায়িত্বভার প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁরই পরামর্শে প্রাদেশিক দেওয়ানদের নিযুক্ত করা হত। সামরিক বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন 'মীর বক্সি'। কিন্তু রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা তাঁর স্বাভাবিক দায়িত্ব ছিল না। উপরোক্ত প্রধান পদগুলি ছাড়া রাজপ্রাসাদ, অন্তঃপুর ও কারখানা সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত 'মীর সামান', বিচার বিভাগের প্রধান 'কাজী' প্রভৃতি আরও বিভিন্ন মন্ত্রী ও রাজকর্মচারী ছিলেন।

প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা

আকবরের সাম্রাজ্য ১৫টি 'সুবা' বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে 'সুবাদার' বা 'সিপাহসলার' বা 'নাজিম' বলা হত। অপর গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক রাজকর্মচারী ছিলেন 'দেওয়ান'। শাসন বিভাগে 'সুবাদার' এবং অর্থ ও রাজস্ব বিভাগে 'দেওয়ান' সম ক্ষমতা এবং মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। প্রদেশগুলি 'সরকার' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। কতকগুলি পরগনা নিয়ে জেলা গঠিত হত। অন্যান্য প্রাদেশিক রাজকর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 'ফৌজদার' (জিলার ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার), 'অমল গুজার' (রাজস্ব নির্ণয়, সংগ্রহ ও হিসাব রক্ষার ভারপ্রাপ্ত), 'কাজী' (বিচার বিভাগের প্রধান), 'কোটওয়াল' (স্থানীয় শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত) প্রভৃতি।

ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা

ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে আকবরের গভীর আগ্রহ এবং দৃষ্টি ছিল। মূলত শের শাহের ভূমি-রাজস্ব নীতি অনুসৃত হলেও এই নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিছুকাল এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আকবর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার প্রবর্তন করেন (১৫৮০)। এই নতুন ব্যবস্থার নাম ছিল **'দহ্‌শলা'**। নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত কৃষি জমি মাপ করে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ (১) 'পোলজ' (যে জমি সব সময় চাষ করা হয়), (২) 'পরটি' (যে জমির উর্বরতা ফিরে পাওয়ার জন্য কিছুকাল চাষ করা হয়নি), (৩) 'চাচর' (যে জমি তিন চার বছর চাষ করা হয়নি) ও (৪) 'বনজর' (যে জমিতে দীর্ঘকাল চাষ হয়নি)। পূর্ববর্তী দশ বছরের গড় কৃষি উৎপাদন এবং গড় মূল্যের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণের

ব্যবস্থা হয়। উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ ছিল রাষ্ট্রীয় খাজনা। এই খাজনা অর্থমূল্যে দিতে হত। আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন প্রচলিত রীতি-নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। তাই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে **'বাতাই'** বা **'ঘল্লা-বক্সী'** প্রথা এবং বাংলা দেশে **'নসক্' বা 'কনকুট'** প্রথাও চালু থাকে। 'ঘল্লা-বক্সী' প্রথাতে শস্য উৎপাদন এবং বাছাই বা মাড়াই-এর পর কৃষিক্ষেত্রেই কৃষক এবং রাষ্ট্রের বখরা ভাগ করা হত। কিন্তু সৎ রাজস্বকর্মীদের উপস্থিতির ওপর এই প্রথার কার্যকারিতা নির্ভরশীল ছিল। 'নসক্' প্রথা সম্বন্ধে কিছুটা অস্পষ্টতা আছে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে এই প্রথাতে পূর্ববর্তী বছরের দেওয়া রাজস্বের ভিত্তিতে কৃষকের খাজনার হার নির্দিষ্ট হত। রাজস্ব-ব্যবস্থার সংস্কার প্রবর্তনে আকবরের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন **তোডরমল**।

আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার সাফল্য এবং দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা প্রচুর বিতর্ক-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের কৃষকদের প্রতি পিতার মত আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কৃষকদের তিনি ঋণ, বীজ, কৃষি-সরঞ্জাম ইত্যাদি সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। নতুন জমিতে আবাদ, শস্য উৎপাদনবৃদ্ধি ও উন্নত মানের শস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। জমিদারদের এই বিষয়ে সহযোগিতা করতে তিনি জোর দেন। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও আকবরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় আদর্শ এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। জমি জরিপকারী কর্মচারী, রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী এবং তত্ত্বাবধান-কারীরা বহু ক্ষেত্রেই নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গে কাজ করত না। আর একটি সমালোচনা হল যে আকবরের নির্দিষ্ট খাজনার হার খুব বেশি ছিল। এর উত্তরে বলা হয় যে শের শাহের আমলেও রাজস্বের হার একই ছিল এবং শের শাহ এক-তৃতীয়াংশ ছাড়াও আরও অন্য প্রকার খাজনা ধার্য করেছিলেন। আকবর তা করেননি।

আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থার সমালোচনা

মনসবদারী ও জায়গীর প্রথা ঃ আকবরের শাসন-ব্যবস্থার আর এক উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল **মনসবদারী প্রথার প্রবর্তন**। সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষার জন্য শক্তিশালী সামরিক বাহিনী অপরিহার্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা এবং সামরিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেছিলেন। রাজকর্মচারীদের নিয়োগ, পদমর্যাদা ও মাহিনা নিয়মিত করার জন্য এই প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন। রাজকর্মচারীদের **পদমর্যাদা** ('মনসব') অনুসারে তেত্রিশটি শ্রেণীর মনসবদারে বিভক্ত করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের বেতন নির্ধারিত হয়। সর্বনিম্ন 'মনসব' ছিল দশ এবং সর্বোচ্চ ছিল প্রথমে পাঁচ হাজার, পরে এটি সাত হাজার পর্যন্ত করা হয়েছিল। মনসবদারীতে উত্তরাধিকার

মনসবদারী প্রথার প্রবর্তন

ছিল না। প্রত্যেক মনসবদারকে নিজস্ব সৈন্যদল গঠন ও রক্ষণ করতে হত। সৈন্যবাহিনীর জন্য অশ্ব, হস্তী ও অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণের ব্যয়ভার মনসবদারকে তাঁর নিজস্ব বেতন থেকে দিতে হত।

মুঘল সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রের অধীনস্থ এলাকা যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) খালসা (উচ্চপদস্থ আমীর ওমরাহ ও কর্মচারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এলাকা), (২) জায়গীর (মনসবদারদের অধীনে নিয়ন্ত্রিত এলাকা)।

সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ এলাকাই মনসবদারদের অধীনে জায়গীর জমি ছিল। মনসবদাররা মাহিনার পরিবর্তে জায়গীর এলাকায় খাজনা বা রাজস্ব আদায় করত এবং সেজন্য তাদের বলা হত জায়গীরদার।

জায়গীরদারী প্রথা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে জায়গীরদাররা পদমর্যাদা অনুযায়ী মাহিনা পেত। যদিও জায়গীরগুলির সঠিক আয় (জমা) কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া হত, জায়গীরদার ও তাদের আমলারা ইচ্ছামত জমির খাজনা নিরূপণ করে রাজস্ব (হাসিল) আদায় করত। সময়ে সময়ে বছরের মাঝামাঝি জায়গীরদারদের বদলি করা হত। তখন নতুন ও পুরাতন জায়গীরদারদের রাজস্ব আদায়ের বণ্টন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগ থেকে করে দেওয়া হত।

কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে যখন কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন জায়গীরদাররা ইচ্ছামত প্রজাদের পীড়ন করে রাজস্ব আদায় করত। এর ফলে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রশ্রয় পায় এবং কৃষক ও সাধারণ প্রজাদের উপর অর্থনৈতিক উৎপীড়ন বেড়ে যায়।

মনসবদারী প্রথা এবং জায়গীর প্রথা

একটি প্রচলিত ভুল ধারণা আছে যে আকবর পূর্ব প্রচলিত **জায়গীর প্রথা** (নিষ্কর জমির ওপর জীবনসত্ত্ব দান) রহিত করে মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। এটি ঠিক নয়। আকবর জায়গীর প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং পাঁচ বছরের জন্য (১৫৭৩-১৫৭৮) তা রহিত করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে গোলযোগ-বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় তিনি 'দহ্‌শলা' নিয়মানুসারে জায়গীরগুলির সঠিক আয় নির্ধারণ করে দিয়ে জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেন।

ধর্মমত

ধর্মনীতি ঃ আকবর বুঝেছিলেন যে ধর্মমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোন সুষ্ঠু সুসংবদ্ধ ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমত ও তত্ত্ব সম্বন্ধে আকবরের অনুসন্ধিৎসা ছিল। তিনি ফতেপুর সিক্রিতে **'ইবাদাদখানা'** নামে এক ধর্মসভাগৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হত। ১৫৮৩

খ্রীস্টাব্দে সকল ধর্মের মূলতত্ত্বের সমন্বয় করে আকবর **দীন–ইলাহী** নামে এক নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেন। দীন–ইলাহীর আসল নাম তাউহিদ-ই-ইলাহী (Tauhid-i-Ilahi)। দীন–ইলাহী কোন নতুন ধর্ম নয়। আকবর নিজে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন নি। ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ঐক্য সংহত করে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য আকবর দীন-ইলাহী প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তিনি কাউকে এই ধর্ম গ্রহণের জন্য বাধ্য করেননি। বিফল হলেও বিভিন্ন ধর্মের এই সংশ্লেষ ও সমন্বয় প্রচেষ্টা আকবরের আদর্শবাদ ও মানবিকতার পরিচয় বহন করে।

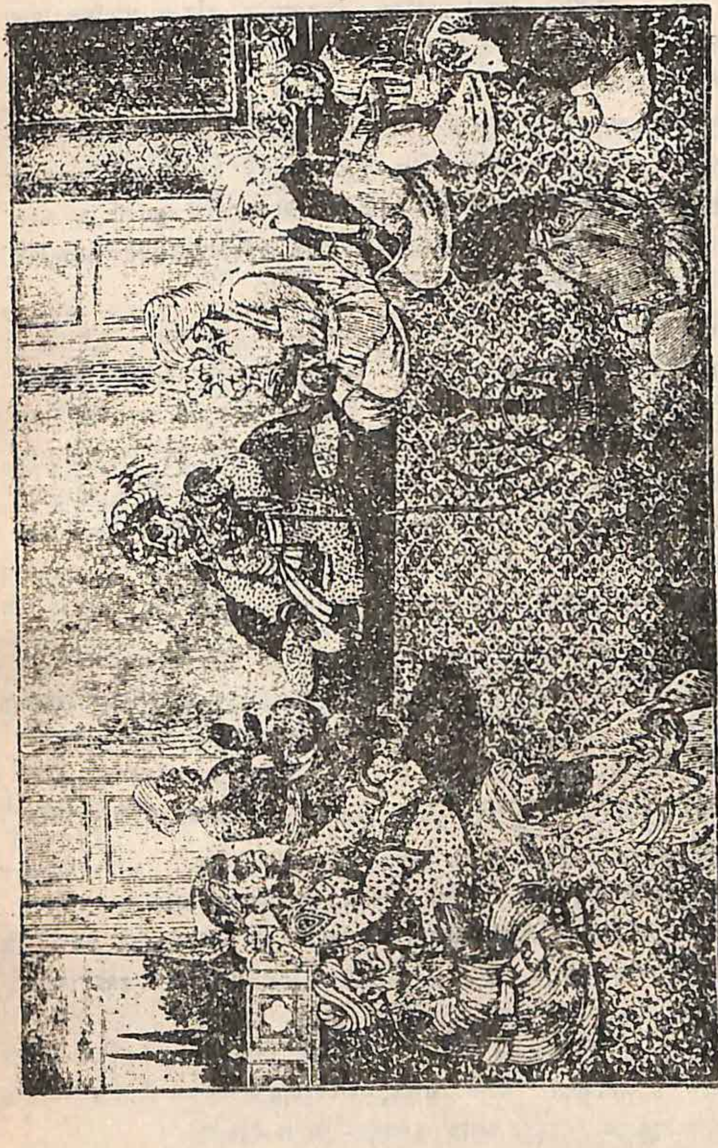
আকবরের রাজসভা : আবুল ফজলের বিবরণ থেকে জানা যায় আকবর প্রত্যহ তিনবার রাজসভায় আসতেন। ঝোরোখা-ই-দর্শন (Jhorokah-i-Darshan) বলে একটি প্রথা ছিল। এই প্রথা অনুসারে সম্রাট প্রত্যহ প্রত্যুষে পূর্ব দিকের বারান্দায় এসে সকলকে দর্শন দিতেন ও প্রজাদের অভিযোগ শুনতেন। এরপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দিওয়ান-ই-আম (Diwan-i-Um)-এ রাজসভা বসত। সম্রাট, পুত্র, পৌত্র ও আমীর, ওমরাহদের নিয়ে সভা করতেন। এখানে নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন সেনাবাহিনী, বিভিন্ন চাকুরিতে নিয়োগ, উন্নতি, জায়গীরদারি সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত।

দিওয়ান-ই-আম ছাড়া, আর একটি রাজসভা বসত দিওয়ান-ই-খাস (Diwan-i-Khas)-এ। এখানে সম্রাট মন্ত্রী পরিষদ ও উচ্চপদস্থ ও অভিজাত আমীর ওমরাহদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এখানে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা ও বৈদেশিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হত।

আকবর নিয়ম অনুযায়ী রাজসভায় আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তবে তিনি ঔরংজীবের মত কোন বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতেন না। কিন্তু সমস্ত আলোচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকতেন।

সাংস্কৃতিক জীবন : আকবর ভারতীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন। ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদগুলি, হুমায়ুনের সমাধি প্রভৃতি আজও আকবরের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন বহন করে।

আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায়, হিন্দু চিত্রশিল্পীরা পারসিক চিত্রকলায় শিক্ষালাভ করেছিল এবং আকবরের আমলে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন হয়।



ইবাদতখানায় ধর্ম আলোচনারত আকবর

আকবর শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক আবুল ফজল, বদায়ুনী ও নিজামুদ্দীন, কবি ফৈজী ও ভরফী, গায়ক তানসেন, সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ বজবাহাদুর, কবি ও সুরসিক রাজা বীরবল, চিত্রকর সৈয়দ আলী ও আবদুস সমাদ প্রভৃতি জ্ঞানীগুণীরা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব

আকবর উদার ধর্মনীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। রাজ্যবিস্তার, রাজ্য গঠন এবং শাসন সুসংহত করার ক্ষেত্রে আকবরের বিস্ময়কর প্রতিভার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, ধর্মসহিষ্ণুতা এবং উদার ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আকবরকে ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলে জওহরলাল নেহেরু অভিহিত করেছেন।

গৃহনির্মাণ শিল্প ও স্থাপত্য শিল্পের প্রতি আকবরের অনুরাগ ছিল। হুমায়ুনের সমাধি, জাহাঙ্গীর মহল, পাঁচ মহল প্রভৃতি আকবরের সময়ের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। আকবরের সময়ের প্রথম আমলের বিখ্যাত বাড়ীগুলি হল আগ্রা এবং লাহোরের প্রাসাদ-দুর্গগুলি। এতে লাল পাথরের ব্যবহার ছিল। আকবরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি হল ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা থেকে ২৬ মাইল পশ্চিমে। ফতেপুর সিক্রির জুমা মসজিদ একটি বিখ্যাত মসজিদ। এই মসজিদের অনুকরণে অন্যান্য মসজিদ নির্মিত হয়। ফতেপুর সিক্রির শহরের পাঁচিল ছিল ছয় মাইল দীর্ঘ, দক্ষিণ দিকের পাঁচিলের কেন্দ্রস্থলে ছিল বুলান্দ দরওয়াজা, ১৭৬ ফুট উচ্চ।

আকবরের সময়ে প্রথম আমলে গৃহ নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পে পারসিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পরে আকবরের নিজের গৃহ নির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পে পারসিক প্রভাব কমে যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি ভারতীয় স্থাপত্য শৈলীর প্রচলন করা। আকবর নিজে নতুন নতুন প্রাসাদ ও হর্ম্যরাজীর পরিকল্পনা তৈরী করতেন। তাঁর আমলের কোন কোন গৃহ বা প্রাসাদে হিন্দু মন্দিরের শিল্পকলার প্রভাব দেখা যায়।

আকবরের সময়ের বহু কেল্লা, মসজিদ, মিনার, সরাইখানা এমনকি হিন্দু মন্দির প্রভৃতি স্থাপত্য ও গৃহ নির্মাণ শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায় | জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান

জাহাঙ্গীর
(১৬০৫-১৬২৭)

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)ঃ আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে মুঘল সিংহাসনে বসেন। জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু আকবরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন বলে তিনি আশা করেছিলেন যে পিতামহ তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ না হওয়ায় খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জাহাঙ্গীর স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমন করেন ও খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ড দেন। শিখদের সঙ্গে সংঘর্ষের সূচনা করে জাহাঙ্গীর অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

পুত্র খসরুর ব্যর্থ বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের আসল কর্ত্রী ছিলেন রাজমহিষী **নুরজাহান**। তাঁর পূর্বনাম ছিল মেহেরুন্নিসা। প্রথমে তাঁর সঙ্গে বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের বিবাহ হয়েছিল। বিদ্রোহের অপরাধে শের আফগানকে প্রাণদণ্ড (১৬০৭) দেবার কয়েক বছর পর জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করেন (১৬১১)। রাজমহিষীর নতুন উপাধি হয় নুরজাহান (জগতের আলো)।

রাজমহিষী নুরজাহানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাণা প্রতাপের পুত্র **অমরসিংহ** বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর সম্মানজনক শর্তে মুঘল আধিপত্য স্বীকার করেন। স্থির হয় যে মেবারের কোন রাজকন্যা মুঘল অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে না এবং মেবারের রাণাকে ব্যক্তিগতভাবে মুঘল দরবারে উপস্থিত থাকতে হবে না। অন্য কোন রাজপুত রাজা মুঘলদের কাছে এই বিশেষ স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়নি। বাংলাদেশের সামন্ত নরপতিদের বিদ্রোহ দমন করে জাহাঙ্গীর ঐ অঞ্চলে মুঘল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জাহাঙ্গীর পিতার মত দাক্ষিণাত্য জয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মালিক অম্বর নামে এক হাবসী মন্ত্রীর পরিচালনায় আহম্মদনগর রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। যুবরাজ খুরম আহম্মদনগর আক্রমণ করে সেখানে মুঘল অধিকার স্থাপন করেন। পুত্রের সাফল্যে খুশি হয়ে জাহাঙ্গীর তাঁকে 'শাহজাহান' (জগতের সম্রাট) উপাধি প্রদান করেন। ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবের কাংড়া দুর্গ মুঘলবাহিনী জয় করে।

মেবারের রাণা অমর সিংহের মুঘল আধিপত্য স্বীকার

বাংলার বিদ্রোহ দমন

দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর জয়

জাহাঙ্গীরের শেষ জীবন বিশেষ গৌরবের বা সুখের হয়নি। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের শাহ কান্দাহার আক্রমণ করে মুঘলদের বিতাড়িত করেন। জাহাঙ্গীর কান্দাহার পুনরুদ্ধার করার জন্য শাহজাহানকে নির্দেশ দেন। কিন্তু পিতৃ-আদেশ অমান্য করে শাহজাহান তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহের ফলে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেনাপতি মহাবৎ খাঁ শাহজাহানের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও নূরজাহানের কর্তৃত্বে উত্যক্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শাহজাহানের পক্ষে যোগ দেন। এই সংকটের মীমাংসার পূর্বেই ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

শাহজাহানের বিদ্রোহ

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ

জাহাঙ্গীরের মৃত্যু

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সূচনা। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ (James I) মুঘল দরবারে **স্যার টমাস রো** নামে এক দূত পাঠিয়েছিলেন। রো-এর বিবরণ থেকে জাহাঙ্গীরের দরবার ও সমসাময়িক যুগ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

ইংরাজ দূত স্যার টমাস রো

শিল্পকলা ও স্থাপত্য ঃ জাহাঙ্গীরের চিত্রকলার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর আমলে মুঘল চিত্রকলা বিশেষ বিকাশ লাভ করে। বহু বিদেশী চিত্রকর যেমন 'আগা রিজা', 'আবুল হাসান', 'উস্তাদ মনসুর' প্রভৃতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পায়। তদানীন্তন আমলের মনোহর, বিষেণ দাস নামে অনেক প্রখ্যাত হিন্দু চিত্রকরও তাঁর রাজসভায় ছিল। আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে মুঘল চিত্রকলায় পারসিক প্রভাব কমে যায় এবং ইউরোপীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সিকান্দ্রার নিকটে আকবরের সমাধি জাহাঙ্গীরের একটি সুন্দর স্থাপত্য কীর্তি।

জাহাঙ্গীরের গাছপালা ও ফুল সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি কাশ্মীরে 'শালিমার বাগ' নামে একটি সুন্দর বাগান করেন। এটি আজও জাহাঙ্গীরের শিল্পী মনের পরিচয় বহন করে।

শুভবুদ্ধি, ন্যায়বিচার, সাহিত্য ও চিত্রশিল্পে অনুরাগ ইত্যাদি গুণের জন্য জাহাঙ্গীর প্রসিদ্ধ। অন্য দিকে তিনি ছিলেন কিছুটা খামখেয়ালী, অদূরদর্শী এবং নিষ্ঠুর। অহিফেন সেবন, অতিরিক্ত মদ্যপান ও বিলাসপ্রিয়তা ছিল তাঁর দুর্বলতা। চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে তাঁর রাজত্বকালে নূরজাহানই সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসন-ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েছিলেন। নূরজাহান বিশ্বস্ত অনুগত অমাত্য, আমীর, ওমরাহদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতেন। রাজ্যের রাজনীতি শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঐই পরিবেশ ক্ষতিকর হয়েছিল।

জাহাঙ্গীরের দুর্বলতা

শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮)ঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান মুঘল সিংহাসনে বসেন। সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করে শাহজাহান তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজা এবং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার খানজাহান লোদীর বিদ্রোহ তিনি দমন করেন। পোর্তুগীজ বণিকদের নানাবিধ অত্যাচারে বাংলাদেশের মানুষ জর্জরিত হচ্ছিল। শাহজাহানের আদেশে বাংলার শাসনকর্তা কাশিম আলি ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে হুগলীর পোর্তুগীজ কুঠি অধিকার করে তাদের দৌরাত্ম্য ও বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়েছিলেন।



শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮)

পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের মত শাহজাহানও দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আহম্মদনগর জয় সম্পূর্ণ করেন (১৬৩৩)। তিন বছর পর দাক্ষিণাত্যের আর দুটি মুসলমান রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে। শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র **ঔরংজীব** দুবার দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথম বার তিনি আট বছর এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার পর ঔরংজীব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটি সম্পূর্ণ জয় করতে উদ্যত হলে শাহজাহান বাধা দেওয়ায় তিনি নিবৃত্ত হতে বাধ্য হন। দাক্ষিণাত্যের শাসনকার্যে ঔরংজীব বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্যজয়

শাহজাহান ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও মধ্য এশিয়ায় মুঘল অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মুঘলবাহিনী মোট তিন বার কান্দাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেও সফল হয়নি। কিন্তু মধ্য এশিয়া অভিযান ও কান্দাহার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে গিয়েছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ও মধ্য এশিয়ায় মুঘলদের ব্যর্থতা

শাহজাহানের জীবিতকালেই তাঁর চার পুত্র দারা, সুজা, ঔরংজীব ও মুরাদের মধ্যে মুঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক ভ্রাতৃযুদ্ধে জয়লাভ করে এবং ভ্রাতাদের হত্যা ও বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে ঔরংজীব ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন।

উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ঔরংজীবের সাফল্য

শাহজাহান ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয়। তাঁর রাজসভায় জাঁক-জমক ছিল। শাহজাহানের শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থায় দক্ষ শাসকের পরিচয় পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে অনেক দেশী, বিদেশী লেখকরা শাহজাহানের প্রশংসা করেছেন। শাহজাহান সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও কুশলী শাসনকর্তা

প্রশাসনিক মূল্যায়ন

ছিলেন। তবে তিনি আকবরের মত সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন না। শাহজাহানের রাজত্ব কালে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন বৈদেশিক আক্রমণ হয়নি।

শাহজাহানের সঙ্গীত, শিল্পকলা ও স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি ফার্সী ও হিন্দী ভাষা জানতেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে যদিও সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নতি হয়েছিল, জনসাধারণের কিন্তু আর্থিক দুর্দশা ছিল। আঞ্চলিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কৃষক, জনসাধারণ ও শিল্প শ্রমিকদের নানা রকম করভারে উৎপীড়িত করত। তাঁর আমলে দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এর ফলে বহুলোক মারা যায়। বহু আমীর, ওমরাহ, সভাসদ ও বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে এবং রাজসভার আড়ম্বর, জাঁক-জমক ও নানারকম স্থাপত্য কীর্তি ও স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করতে বহু অর্থ ব্যয় হয়। এজন্য প্রজাদের ওপর করভার চাপান হয়। ফলে জাতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

শাহজাহানের অন্ধ পুত্রস্নেহ ছিল। যার ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের শেষ দিকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দেয় এবং তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে।

•

শিল্পকলা ও স্থাপত্য ঃ সাম্রাজ্যের বিশালতা, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিপুল ঐশ্বর্য ও অসাধারণ শিল্পকীর্তি শাহজাহানের রাজত্বকালকে গৌরবময় করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্য তাঁর সময় বিশাল ছিল এবং তেমন কোনও বিদেশী আক্রমণের সম্মুখীন হয়নি। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি হয়েছিল উল্লেখযোগ্য।

মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি

আড়ম্বরপ্রিয় ও শিল্পানুরাগী সম্রাট শাহজাহানের সময় বহু মর্মরপ্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। এইগুলির মধ্যে আগ্রার প্রাসাদ অভ্যন্তরে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জাম-ই-মসজিদ, মোতি মসজিদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি হল আগ্রার যমুনা নদীর তীরে তাজমহল। তাজমহলের শিল্প সৌকর্য সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। ওস্তাদ ঈশাকে তাজমহলের প্রধান পরিকল্পক মনে করা হয়। প্রয়াত প্রিয় পত্নী মমতাজের এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণে ২২ বছর (১৬৩২-১৬৫৩ লেগেছিল। তাজমহলের মত বিশ্বখ্যাত না হলেও লাহোরে জাহাঙ্গীরের যে স্মৃতিসৌধ শাহজাহানের সময় নির্মিত হয়েছিল তার শিল্প সৌন্দর্যও অনিন্দ্যসুন্দর।

অবশ্য চিত্রকলায় জাহাঙ্গীরের আমলে রং-এর পরিমিত ব্যবহারে ও শিল্প সৌকর্যে যে ঔজ্জ্বল্য ও গুণগত মান পরিলক্ষিত হয়েছিল, শাহজাহানের আমলে রং-এর যথেচ্ছ ব্যবহারে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিষয়ের অবতারণায় সে গুণগত মান কমে যায়। দিল্লীতে তাঁর নামানুসারে শাহজাহানাবাদ নামে নতুন শহর ও রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়। মুঘল চিত্রশিল্পের চরম বিকাশও তাঁর সময় হয়েছিল। ময়ূর সিংহাসন, কোহিনুর হীরা ইত্যাদি শাহজাহানের ঐশ্বর্যের পরিচয় ছিল। কিন্তু এত বৈভব ও

আড়ম্বর সত্ত্বেও শাহজাহানের রাজত্বকাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

ইউরোপীয় বণিকদের প্রতি বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সনদের সাহায্যে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বণিকরা একটি ব্যবসায়ী সংস্থা বা কোম্পানী (Company) গঠন করে। এই কোম্পানীর হাতে উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) থেকে ম্যাগেল্লান প্রণালী (Straits of Magellan) পর্যন্ত ১৫ বছরের জন্য একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার দেওয়া হয়।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে বাণিজ্য করার অনুমতি চেয়ে ও ইংরাজ বণিকদের জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করার উদ্দেশে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস (James I) জাহাঙ্গীরের রাজসভায় উইলিয়াম হকিংস (William Hawkins) নামে এক দূত প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীর হকিংসকে অভ্যর্থনা জানালেও পোর্তুগীজদের বাধাদানের ফলে এই দৌত্য ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা সুরাটে পাকাপাকি ভাবে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করতে সমর্থ হয়। পোর্তুগীজদের বাধা কিন্তু চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে পোর্তুগীজদের দস্যুবৃত্তিতে (১৬১৪) জাহাঙ্গীর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন। ইংরাজদের নৌশক্তি তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ আবার স্যার টমাস রোকে (Sir Thomas Roe) জাহাঙ্গীরের নিকট দূত হিসাবে পাঠান। এবার উদ্দেশ্য ছিল একটা নির্দিষ্ট চুক্তি করা, যাতে উভয় দেশ নিয়মিত ভাবে পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারে। স্যার টমাস জাহাঙ্গীরের কাছে ভাল ব্যবহার পেলেও এবং তিন বছর জাহাঙ্গীরের সভায় থেকে চেষ্টা করেও কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন নি। অবশেষে যুবরাজ খুরম্ এর সহায়তায় ইংরাজ কোম্পানীর জন্য কতকগুলি সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হন। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল বিনা শুল্কে ভারতে ইংরাজদের কুঠি স্থাপন করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করার অবাধ অধিকার। ভারতে ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যিক ব্যবস্থা সংগঠিত করার পিছনে স্যার টমাসের অনেক অবদান আছে।

১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাসের ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের মধ্যেই ইংরাজরা সুরাট, আগ্রা, আমেদাবাদ, ব্রোচ-এ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। স্যার টমাস সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে কোম্পানীর জন্য যে ফর্মান পান সেই ফর্মানই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশের সূচনা করে।

জাহাঙ্গীরের আমলে ওলন্দাজরা (Dutch) ভারতে বাণিজ্য করার জন্য সুরাটে

পরিচালন দপ্তর স্থাপন (Directorate) করে এবং ব্রোচ্, ক্যাম্বে, আমেদাবাদ ও আগ্রায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের ব্যবস্থা করে।

শাহজাহানের আমলে শেষের দিকে ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পাকাপাকি ভাবে বাণিজ্য করার অধিকার পায় এবং সেখানে 'ফোর্ট গুস্তাভাস' (Fort Gustavus) নামে একটি কুঠি বা দুর্গ তৈরী করে।

শাহজাহানের পুত্র সুজা যখন বাংলার সুবাদার ছিলেন তখন হুগলীতে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। সুজার 'নিশান' ইংরাজ কোম্পানিকে বাণিজ্য করার অনেক সুযোগ সুবিধা ও অধিকার দেয়। এর পরিবর্তে ইংরাজ কোম্পানিকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা শুল্ক দিতে হত। সুজার 'নিশান' ইংরাজ কোম্পানিকে শুল্ক দপ্তরের হয়রানি থেকে রক্ষা করে। এইভাবে ধীরে ধীরে ইংরাজ বণিকের অগ্রগতির পথ পরিষ্কার হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ বাণিজ্যিক সংস্থা ভারতের মাটিতে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে।

চতুর্থ অধ্যায়

ঔরংজীবের রাজত্বকাল (১৬৫৮-১৭০৭)

উত্তরাধিকারের যুদ্ধ

শাহজাহানের জীবিতাবস্থায় তাঁর চার পুত্র দারা, সুজা, মুরাদ ও ঔরংজীবের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ঔরংজীব মুরাদের সঙ্গে মিত্রতা করে ধরমত ও সমুগড়ের যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করেন ও ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করে সিংহাসন অধিকার করেন।



ঔরংজীব

এর পর ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে খাজওয়ার যুদ্ধে সুজাকে ও দেওরাই-এর যুদ্ধে দারাকে চুড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন 'পাদশাহ (বিশ্বজয়ী) গাজী আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুরাদ ঔরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করলে ঔরংজীব মুরাদকে ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করেন। দারা এবং মুরাদকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়। সুজা আরাকানের পথে পালাবার সময় সম্ভবতঃ মগ দস্যুদের হাতে মারা যান। এই ভাবে ঔরংজীব ভ্রাতৃহত্যা করে ও পিতাকে বন্দী করে মুঘল সিংহাসনে তার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর রাজত্বকালকে দুভাগে ভাগ করা হয়: (ক) ১৬৫৮-১৬৮১, (খ) ১৬৮২-১৭০৭। রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণ ভারত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

রাজ্যবিস্তার ও বিদ্রোহ দমন: সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ঔরংজীব মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন। মীর জুমলা **উত্তর-পূর্ব সীমান্তে** শক্তিশালী আহোমদের পরাজিত করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মীর জুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার হন। তিনি আরাকান-রাজের কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোর্তুগীজ

জলদস্যুদের দমন করে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে শান্তি স্থাপন করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্দান্ত আফগান উপজাতিগুলির বিদ্রোহ দমন করতে ঔরংজীবকে প্রচুর অর্থব্যয় ও সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি: মুঘলদের ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল—(১) কান্দাহার, (২) সীমান্ত উপজাতীয় সমস্যা। সাম্রাজ্য রক্ষায় সীমান্তবর্তী সামরিক ঘাঁটি হিসাবে কান্দাহারের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে কান্দাহার উদ্ধারের উপর্যুপরি তিনটি অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। মুঘলদের সীমান্ত সুরক্ষিত করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। পারসিক আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তের উপজাতীয়দের বশে আনার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। আকবরের আমলে এদের হাতে বীরবলের প্রাণ যায়। শাহজাহান পর্যন্ত মুঘল সম্রাটরা অর্থ দিয়ে এদের বশে রাখার চেষ্টা করেন। ঔরংজীব অর্থের প্রলোভন এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ এই দ্বৈত নীতি গ্রহণ করেন। পাঞ্জাব ও আফগানিস্থানের মধ্য অঞ্চলের আফগান বা পাঠান জাতিরা, যেমন—আফ্রিদি, ইউসুফজাই (Yusufzai), খতক—এরা ছিল স্বাধীনতালোভী। এদের নিয়মানুগ কোন সরকার ছিল না। এরা প্রধানত লুটপাট করে জীবিকা নির্বাহ করত। এদের উপদ্রবে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথগুলি ছিল বিপদসঙ্কুল।

১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফজাই জাতির উত্থান, কাবুল এবং কাশ্মীরের সঙ্গে দিল্লীর যোগাযোগ ছিন্ন করে দেয়। এদের দমন করা হলেও, আকমল খাঁর নেতৃত্বে ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিদিরা বিদ্রোহ করে। অন্যান্য উপজাতিগুলি যোগ দেওয়ায়, বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করে। কান্দাহার ও এটকের মধ্যে সব পাঠান এই যুদ্ধে যোগদান করে। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহী আফগানরা মুঘল সেনাপতি সুজায়াত খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য স্বয়ং ঔরংজীবকে ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে পেশোয়ারের কাছে গিয়ে থাকতে হয়। ঔরংজীবের চতুর কূটনীতি এবং যুদ্ধ এই দ্বৈত নীতির সাহায্যে অবস্থা অনেকটা মুঘলের আয়ত্বাধীন হয়। কাবুলের মুঘল সুবাদার মহম্মদ আমিন আফগানিস্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। আমিন খাঁর উদার ব্যবহারে আফগানরা সন্তুষ্ট হয়। ভাতা এবং জায়গীরের লোভে আফগানরা মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করে। খাইবার গিরিপথের বাণিজ্যিক যোগাযোগ খুলে যায়।

উপজাতিগুলি অনেকটা শান্ত হলেও, যুদ্ধের ব্যয়, ভাতাদান ইত্যাদিতে মুঘল রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে যায়। বহু প্রাণহানি হয়; মুঘলদের এই উপজাতি বিদ্রোহ দমনে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়নি, রাজনৈতিক বিপর্যয়ও হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সেনাপতি ও সুদক্ষ বহু সেনানী নিযুক্ত থাকায় শিবাজী

দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। ১৬৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে রাজপুত যুদ্ধেও আফগানদের বিশ্বাস করে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা যায়নি।

রাজপুত নীতি : ঔরংজীবের অদূরদর্শী সাম্রাজ্যলিপ্সা ও ধর্মনীতির আর এক পরিণাম ছিল রাজপুত ও মারাঠাদের অনমনীয় শত্রুতা। ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে মারবাড়ের (যোধপুর) রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর ঔরংজীব যোধপুর অধিকার করেন। এরপর তিনি যশোবন্তের স্ত্রী ও তার শিশুপুত্র অজিতসিংহকে দিল্লীতে আটক রেখে ধর্মান্তরিত করার পরিকল্পনা করলে দুর্গাদাসের নেতৃত্বে রাঠোররা মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। দুর্গাদাস রাণী ও শিশু-রাজপুত্রকে নিয়ে রাজপুতনায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুঘলবাহিনী যোধপুর ও অন্যান্য শহর দখল করে। এই সময় মেবারের রাণা রাজসিংহ বিদ্রোহী রাঠোরদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি ইতিপূর্বে জিজিয়া কর প্রবর্তনের জন্য ঔরংজীবের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। মুঘলরা চিতোর অধিকার করলেও রাজসিংহকে দমন করতে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে বাদশাহের পুত্র আকবর বিদ্রোহী হয়ে রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় ঔরংজীবের সমস্যা ও বিপদ বৃদ্ধি পায়। কুটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এই সংকট থেকে উদ্ধার পেলেও দীর্ঘকাল ধরে রাজপুতদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও ঔরংজীব চূড়ান্ত জয়লাভে ব্যর্থ হন। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহ মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করলেও রাঠোররা ঔরংজীবের মৃত্যুকাল (১৭০৭) পর্যন্ত কোন আপস করেনি। ঔরংজীবের পুত্র বাহাদুর শাহ শেষ পর্যন্ত রাঠোরদের সঙ্গে সন্ধি করে অজিতসিংহকে পিতৃরাজ্যের অধিপতি বলে স্বীকার করেন। রাজপুতদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত থেকে ঔরংজীবের কোন লাভ হয়নি। বরং বীর রাজপুত জাতির সহযোগিতার পরিবর্তে শত্রুতা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল।

রাঠোর-মুঘল সংঘর্ষ

মেবারের সঙ্গে বিরোধ

রাজপুতদের সঙ্গে বিরোধের কুফল

দাক্ষিণাত্য : দক্ষিণ ভারতে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থানের মূলেও ছিল ঔরংজীবের অপরিণামদর্শী সংকীর্ণ নীতি। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর ধরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও বাদশাহ আলমগীরের পক্ষে 'পার্বত্য মূষিক' শিবাজী বা তাঁর পরবর্তী মারাঠা নায়কদের দমন করা সম্ভব হয়নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে 'দাক্ষিণাত্যের ক্ষত' (Deccan ulcer) ঔরংজীবের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তারূপে থাকার সময় থেকেই বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া রাজ্য দুটি জয় করার মনোবাসনা ঔরংজীবের ছিল। প্রথমে ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুর ও পরের বছর গোলকুণ্ডা রাজ্যটি জয় করে ঔরংজীব তাঁর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ করেন। এরপর তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লী পর্যন্ত তিনি মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। কোন

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়

কোন ঐতিহাসিকের মতে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করে ঔরংজীব দূরদৃষ্টির পরিচয় দেননি, কেননা মারাঠাদের দমন করার ব্যাপারে ঐই রাজ্য দুটির স্বাধীন অস্তিত্ব ও সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই যুক্তি সকলে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাদের মতে, এই দুই রাজ্য ইতিমধ্যেই এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তাদের পক্ষে মুঘল সম্রাটকে বিশেষ কিছু সাহায্য করা সম্ভব ছিল না।

সমালোচনা

ঔরংজীবের **দাক্ষিণাত্য-নীতি** চরম ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল। মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে তিনি সক্ষম হননি। বিজাপুর ও গোলকুন্ডার সঙ্গে সংঘর্ষে মুঘল শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উত্তর ভারতেও রাজপুতদের বিরোধিতা এবং অন্যান্য জাতির অসন্তোষ ও বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন করে তুলেছিল। রাজপুত্র আকবর প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিলেন। অন্য দুই পুত্রকেও ঔরংজীব বিশ্বাস করতে পারেননি। দীর্ঘকালব্যাপী লোকক্ষয়ী এবং অর্থক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এই সব কিছুর সমাবেশে ঔরংজীবের মৃত্যুর (১৭০৭) পূর্বেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

ঔরংজীবের রাজত্ব-কালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত

শিবাজী

১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০) পুণা জেলার অন্তর্গত শিবনের পার্বত্য দুর্গে **শিবাজীর** জন্ম হয়। তাঁর পিতা শাহজী ছিলেন আহম্মদনগরের সুলতানের একজন সেনানায়ক ও জায়গীরদার। মাতা জীজাবাঈ-এর স্নেহ-যত্নে ও পিতার বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারী দাদাজী কোণ্ডদেবের অভিভাবকত্বে শিবাজী বড় হয়েছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ কিশোর শিবাজীর স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। কৃতসংকল্প শিবাজী পার্বত্য মাওলিজাতীয় কৃষকদের নিয়ে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের বিজাপুরসুলতানী রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথমে তোরণা দুর্গ জয় (১৬৪৬) করেন ও পরে রায়গড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এরপর তিনি বিজাপুর রাজ্যের আরও কিছু



শিবাজী (১৬২৭।৩০-১৬৮০)

সৈন্যদল গঠন ও তোরণা দুর্গ জয় (১৬৪৬)

অঞ্চল জয় করলে বিজাপুরের ক্রুদ্ধ ও শঙ্কিত সুলতান শিবাজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করেন। বিজাপুর রাজ্য আর আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিবাজী পিতাকে মুক্ত করেন। কিন্তু সাময়িক বিরামের পর শিবাজী আবার রাজ্যজয়ে উদ্যোগী হন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি পুরন্দর ও জাউলীর দুর্গ, রায়গড় এবং কোঙ্কনের উত্তরাংশ জয় করেন।

পুরন্দর ও জাউলীর দুর্গ জয় ও অন্যান্য সাফল্য

শিবাজী যখন নিজের রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট সেই সময় দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদার ঔরংজীব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। শিবাজী বিজাপুরের পক্ষ নিয়ে মুঘলদের আক্রমণ করায় ঔরংজীব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করায় ঔরংজীব শিবাজীকে সম্পূর্ণরূপে দমন করার সুযোগ পাননি। বিজাপুরের সুলতানও শিবাজীর রাজ্য ও ক্ষমতাবৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন। মুঘল আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবার পর তিনি শিবাজীকে দমন করার উদ্দেশ্যে সেনাপতি **আফজল খাঁকে** প্রেরণ করেন (১৬৫৯)। শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় নেন। শেষ পর্যন্ত দুজনের সাক্ষাৎকারের সময় শিবাজী বাঘনখের দ্বারা কেমন করে আফজল খাঁকে নিহত করেছিলেন সে বিতর্কমূলক কাহিনী সুবিদিত। সেনাপতির শোচনীয় মৃত্যুতে বীজাপুরবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে শিবাজী দক্ষিণ কোঙ্কন ও কোলহাপুর অধিকার করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন।

ঔরংজীবের সঙ্গে বিরোধের সূচনা

বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষ

আফজল খাঁর মৃত্যু (১৬৫৯) ও বিজাপুর বাহিনীর পরাজয়

দুঃসাহসী শিবাজীর শত্রুতার কথা ঔরংজীব বিস্মৃত হননি। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার অল্পকাল পরেই তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার **শায়েস্তা খাঁকে** শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খাঁ প্রথম দিকে কিছু সাফল্যলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত সুচতুর শিবাজীর কাছে পরাজিত হন (১৬৬৩)। পরের বছর পশ্চিম ভারতের সমৃদ্ধিশালী বন্দর সুরাট লুণ্ঠন করে শিবাজী প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। তখন ঔরংজীব দুজন সুযোগ্য মুঘল সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে শিবাজীকে দমন করার দায়িত্ব দেন। জয়সিংহের কূটবুদ্ধি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে শিবাজী মুঘলদের সঙ্গে **পুরন্দরের সন্ধি** (১৬৬৫) করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্তানুসারে শিবাজী মুঘল সম্রাটকে কয়েকটি দুর্গ, কিছু অঞ্চল ও বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হন।

মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ

শায়েস্তা খাঁর পরাজয় (১৬৬৩)

কিছুকাল পরে জয়সিংহের পরামর্শে শিবাজী আগ্রায় ঔরংজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু রাজদরবারে উপযুক্ত মর্যাদা না পাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে ঔরংজীব শিবাজীকে কারারুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত কৌশলে কারাগার থেকে পলায়ন

মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের পুনরারম্ভ

করে শিবাজী স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে ঔরংজীব তাঁকে 'রাজা' বলে স্বীকৃতি দিলেও মুঘল-মারাঠা শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অতঃপর শিবাজী তাঁর হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার এবং দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করেন। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গোব্রাহ্মণপালক' উপাধি গ্রহণ করেন এবং রায়গড়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি জিঞ্জি, ভেলোর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করেন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক (১৬৭৪)

মৃত্যু (১৬৮০)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শিবাজী শাসন ও সামরিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের নিয়ামক নিজে হলেও **'অষ্টপ্রধান'** নামে খ্যাত আট জন মন্ত্রীর সাহায্যে শিবাজী রাজ্য পরিচালনা করতেন। এই আট জনের মধ্যে প্রথম ছিলেন **'পেশোয়া'** বা প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তী কালে পেশোয়াই মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। শিবাজী-প্রবর্তিত প্রাদেশিক শাসন ও রাজস্ব-ব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত। মারাঠা রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শিবাজী **চৌথ** (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ) এবং **সরদেশমুখী** (রাজস্বের এক-দশমাংশ) নামে দুই প্রকার কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা

সামরিক সংগঠনে শিবাজী মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুরক্ষিত পার্বত্য দুর্গগুলি ছিল মারাঠা সামরিক শক্তির প্রধান কেন্দ্র। শিবাজীর সৈন্যবাহিনী 'পদাতিক' ও 'অশ্বারোহী' এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। **'বারগীর'** ও **'শিলাদার'** নামে দুই শ্রেণীর অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। 'বারগীর'রা অশ্ব, অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদ পেত সরকার থেকে। 'শিলাদার'রা নিজেরাই এই সব উপকরণ সংগ্রহ করত। শিবাজী 'বারগীর'দের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছিলেন। মারাঠা নৌবহর সৃষ্টি করে শিবাজী তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

সামরিক সংগঠন

বারগীর ও শিলাদার

শিবাজীর সময় এই নৌবাহিনী বিশেষ শক্তিশালী না হলেও পরবর্তী কালে আংগ্রিয়া সর্দারের নেতৃত্বে এই নৌবাহিনীই ইংরাজ, পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের জলপথে বাধা দিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুঘল সম্রাটরা কিন্তু সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নৌবাহিনীর অসীম গুরুত্ব তেমন উপলব্ধি করতে পারেননি।

নৌবাহিনী

দুর্জয় সাহস, অসীম মনোবল, স্থির প্রত্যয় এবং অসাধারণ সামরিক ও সাংগঠনিক

প্রতিভার অধিকারী শিবাজী মানুষ হিসাবেও মহান ছিলেন। সারা জীবন মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও তিনি কখনও ইসলাম ধর্মের অমর্যাদা করেননি। পরধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর উদার মনোভাব সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার ছিল তাঁর চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য। শিবাজীর আদর্শ ও দেশপ্রেম আধুনিক যুগে বহু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

শিবাজীর চরিত্র

শাসক শিবাজী : একজন বীর যোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক হিসাবে ভারতের ইতিহাসে শিবাজীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হল, তিনি বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, মুঘল এবং অংশতঃ সিদ্দি ও জিঞ্জিরের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মহারাষ্ট্রে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গভীর দেশাত্মবোধ, জাতীয়তা ও ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত শিবাজী, দাক্ষিণাত্যের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মারাঠা জনগণকে একত্রিত করে এবং মারাঠা দেশমুখদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে, মধ্য ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে একটি সুসংহত মারাঠা শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

শাসনকর্তা

শিবাজী এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌসেনা ছিল। তিনি এমন একটি সুদক্ষ রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থা, সুসংহত মারাঠা জাতি ও সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পরও মারাঠারা মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

ঔরংজীবের দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের সুদূর প্রসারী ফল : বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার প্রতি ঔরংজীবের যে মনোভাব ছিল, তাতে এই দুটি রাজ্যের পক্ষে মুঘলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটির শাসন কর্তারা ছিলেন 'শিয়া' শ্রেণীভুক্ত আর মুঘলরা ছিল 'সুন্নি'। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। সেজন্য মারাঠাদের বিরুদ্ধে এই দুটি রাজ্যের সাহায্যও মুঘলরা পায়নি।

শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র বোঝার অক্ষমতা ঔরংজীবের এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। তিনি জয়সিংহের পরামর্শ অনুযায়ী শিবাজীর সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেননি। ঔরংজীব ভেবেছিলেন গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর জয়ের পর তাঁর বশ্যতা মেনে নেওয়া ছাড়া মারাঠাদের কোন উপায় থাকবে না। কিন্তু এই ভুল তাঁর পরে ভেঙে গিয়েছিল এবং নানা ভাবে মনসবদারি ও জায়গীর বণ্টন করে মারাঠাদের দলে টানার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই নীতি কার্যকরী হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঔরংজীবের জীবদ্দশায় মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের কোন স্থায়ী মীমাংসা হল না। এর ফলে ঔরংজীব

আহমেদাবাদে ফিরে গেলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে তাঁর সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এছাড়াও গোলকুণ্ডা, বিজাপুর এবং কর্ণাটক পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে মারাঠা আক্রমণের পথ সুগম হয়, তাদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং আমীর ওমরাহদের মনোবল ভেঙে যায়। সেজন্য দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুন্ন হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দীর্ঘস্থায়ী মারাঠা সংগ্রামের জন্য দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং দাক্ষিণাত্য মারাঠা শক্তির অধীনে আসে। জায়গীর প্রথা দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে সামরিক শক্তি ও শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এর জন্য উত্তর ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতিরও ক্ষতি হয়।

মুঘল সৈন্য মারাঠা শক্তির হাতে দাক্ষিণাত্যে পর্যুদস্ত হলেও উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে এবং কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত অধিত্যকায় তারা তাদের প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল। যুদ্ধ এবং লুণ্ঠনের দ্বারা মারাঠারা দাক্ষিণাত্যে ব্যবসা, বাণিজ্য এবং কৃষি প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু উত্তর ভারতে মুঘল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, মারাঠাদের অনেক মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে হয়েছিল। শিবাজী মারাঠা জনগণের মনে যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করেছিলেন, দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে তার অবক্ষয় দেখা দেয়। মারাঠাদের জাতীয় সংহতি দুর্বল হয়ে যায় এবং অনেক উচ্চপদস্থ মারাঠী কর্মচারী মুঘলদের পক্ষে যোগ দেয়। এছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজনে সেনানায়ক বা মনসবদারদের অধীনে পুরাতন জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন হয়।

ঔরংজীবের অসামরিক ও সামরিক শাসন ব্যবস্থা ঃ ঔরংজীব একজন বীর, সমর কুশলী এবং কর্মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর আমলে রাজ্যের

সম্রাটের ক্ষমতা

সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে ছিল। তিনি ছিলেন সামরিক এবং অসামরিক শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি শাসন কার্যের সমস্ত বিষয় নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখতেন, এবং নিজে আদেশ দিতেন। তিনি আইনের শাসন বলবৎ করেন।

ঔরংজীবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্য একুশটি সুবায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সুবার জন্য একজন করে সুবাদার বা শাসনকর্তা ছিলেন। সুবাগুলি সরকার এবং পরগণায় বিভক্ত ছিল। সর্বাপেক্ষা ছোট ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসনভার ছিল পঞ্চায়েতের ওপর।

কিন্তু ঔরংজীব ধর্মান্ধ ছিলেন। ইসলামের আদর্শ তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ইসলামের অনুশাসনগুলি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। তাঁর আমলে সাম্রাজ্যে হিন্দুরা মুসলমানদের মত সমান মর্যাদা পেতেন না।

ইসলামী রাষ্ট্র শাসন

ঔরংজীবের আমলে কাজীরা বিচার করতেন। রাজধানীতে, প্রদেশে ও অন্যান্য বড় বড় শহরে কাজীর বিচার-প্রথা ছিল। তবে এই বিচার ঐস্লামিক আইন অনুযায়ী হত। সম্রাট অবশ্য বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফৌজদারি মামলার ভার সাধারণতঃ থাকত ফৌজদার, সুবাদার এবং কোটালের ওপর।

বিচার ব্যবস্থা

ঔরংজীব আকবরের উদার নীতির বদলে তাঁর ধর্মান্ধ নীতি অনুসরণ করে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত করেন। তাঁর আমলে মুঘল সাম্রাজ্য এত বিশাল হয়ে পড়ে, যার ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা কঠিন হয়। এর জন্য শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুঘল আমলে সম্রাটরা বিরাট বেতনভোগী সৈন্যদল নিজেরা পোষণ করতেন না। মনসবদারদের অধীনে সৈন্য থাকত এবং তাঁরাই সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সৈন্য সরবরাহ করতেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকায়, ঔরংজীবের আমলে বহু অর্থ ব্যয় হয়। এর ফলে প্রজাদের উপর করভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। জায়গীরদারদের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে রাজস্বের আয় কমে যায়। এর জন্য মনসবদারদের বেতন ঠিক সময়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে ও তাদের বেতন মাঝে মাঝে বাকী পড়ে যায়। সেজন্য মনসবদাররা সৈন্য সরবরাহে শীথিলতা দেখায় ও সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সামরিক ব্যবস্থা

মুঘল সম্রাটরা নৌশক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। এর ফলে উপকুল অঞ্চল তাঁদের পক্ষে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

নৌশক্তি

ঔরংজীবের ধর্ম নীতি : ঔরংজীব ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ সুন্নী মুসলমান। কিন্তু তাঁর ধর্মান্ধতা ও পরধর্ম অসহিষ্ণুতা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের ধর্মীয় উদারতার কথা সুবিদিত। মধ্যযুগেও শের শাহ এবং আকবর উদার ধর্মনীতি অনুসরণ করে ছিলেন। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের এই ঔদার্য ও দূরদৃষ্টি না থাকলেও তাঁদের রাজত্বকালে এই নীতি সুপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু ঔরংজীব সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি ইসলামীয় ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্প করে-ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে অ-মুসলমানদের ওপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। জিজিয়া ও তীর্থকর কঠোরভাবে প্রবর্তন করা ছাড়া তিনি বহু হিন্দু মঠ,

ঔরংজীবের ধর্মনীতি

মন্দির ও শিক্ষালয় ধ্বংস করেছিলেন। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল। হিন্দুদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস, রাজকার্যে হিন্দুদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের অস্ত্র ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ঔরংজীব হিন্দুদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি খর্ব করেছিলেন। ঔরংজীবের ধর্মনীতির প্রতিক্রিয়ায় তাঁর রাজত্বকালেই মথুরা অঞ্চলের জাঠরা, মধ্য ভারতের বুন্দেলারা, পাতিয়ালা অঞ্চলের সৎনামী সম্প্রদায় এবং শিখরা বিদ্রোহ করে।

ঔরংজীবের অদূরদর্শী সাম্রাজ্যলিপ্সা ও ধর্মনীতির আর এক পরিণাম ছিল রাজপুত ও মারাঠাদের অনমনীয় শত্রুতা।

আধুনিক গবেষকদের মতে ঔরংজীবের ধর্মনীতি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত। ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। একথা ঠিক যে তিনি ইসলামের নীতি দ্বারা বহুলাংশে পরিচালিত হতেন। তবে তিনি প্রজাদের স্বার্থ উপেক্ষা করতেন না। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর প্রজাদের উপর থেকে বহু রকমের কর তুলে দেন।

ঔরংজীব তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দিকে জিজিয়া প্রবর্তন করেন নি। এই জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করতে কুড়ি বছর সময় লাগে। এই কর প্রবর্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ যোগ দেখা যায়। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঔরংজীব বুঝতে পারেন যে রাজপুত ও মারাঠাদের কাছ থেকে আনুগত্য ও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং দাক্ষিণাত্য অভিযানে গোঁড়া মুসলিমদের সাহায্য প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে জিজিয়া প্রবর্তন হয়। যে সমস্ত রাজপুত ও হিন্দু সৈন্যদলে যোগ দিতে অনিচ্ছুক, তাদের রেহাই দেওয়ার জন্য জিজিয়া প্রবর্তন করা হয়। অ-মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার জন্য জিজিয়া কর দিত এরকম কথা বলা যায় না।

ফারুকির মতে মন্দির ধ্বংসের পিছনে সাধারণ ভাবে কোন আদেশ জারী করা হয়নি। প্রত্যেক মন্দির ভেঙ্গে ফেলার জন্য পৃথক পৃথক কারণ ছিল এবং রাজনৈতিক কারণে ঔরংজীবের ধর্মীয় নীতির পরিবর্তন সময়ে সময়ে হত।

তবে একথাও ঠিক যে ঔরংজীবের ধর্মীয় নীতিতে যে গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দেয়, তা হিন্দুদের ক্ষুব্ধ করে। যদিও রাজনৈতিক কারণ মূলতঃ জাঠ, সতনামী, বুন্দেলা, রাজপুত ও মারাঠা আন্দোলনের পিছনে কাজ করে, ধর্মীয় কারণ এই আন্দোলনগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে শক্তি যোগায়। শিখ জাগরণের পিছনে ধর্মীয় কারণ রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে সমান গুরুত্ব অংশ গ্রহণ করে।

আধুনিক কিছু গবেষকরা অবশ্য এই বিদ্রোহগুলিকে কৃষক বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে ঔরংজীব তাঁর প্রজাদের প্রতি কোন পীড়নমূলক আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর অধীনস্থ স্থানীয় আমীর ওমরাহ ও কর্মচারীরা প্রজাদের

কাছ থেকে জোর জবরদস্তি করে কর আদায় করত ও উৎপীড়ন করত। এর ফলে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে ধর্মীয় অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কৃষকদের ধর্মীয় সূত্রে ঐক্যবন্ধ করে।

ঔরংজীবের চরিত্র : ঔরংজীব অসাধারণ প্রতিভা, বীরত্ব ও চারিত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। সমসাময়িক যুগের শাসকশ্রেণীর শ্রমবিমুখতা এবং বিলাস-ব্যসন ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নৈতিক আদর্শ, কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং সহজ সরল জীবনযাত্রা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। সুদীর্ঘকাল বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ও সুশাসিত রেখে তিনি নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে ঔরংজীবের ধর্মান্ধতা, অদূরদর্শিতা ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে নির্মম আচরণের কাহিনীগুলি ইতিহাসে অতিরঞ্জিত-ভাবে স্থান পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে গোঁড়া সুন্নী মুসলমান হলেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর খুব বেশী কিছু উৎপীড়ন করেননি। অন্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে ঔরংজীবের ভূমিকার এই নব মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে ঔরংজীবের দায়িত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

ঔরংজীবের চরিত্র

শাসক ঔরংজীব : ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ঔরংজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসানের সূচনা হয়। ঔরংজীব একজন সৎ ও পরিশ্রমী শাসক ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ভালবাসতেন এবং সাম্রাজ্যের সকল শাসন ও যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয় নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখতেন। এরজন্য তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের কাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কমে যায় ও তারা গতানুগতিক ভাবে কাজ করে। বিভিন্ন ধর্মী বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে এরকম শাসনকর্তা অনুপযুক্ত। কারণ একজন শাসনকর্তার পক্ষে অতবড় সাম্রাজ্যের শাসন কার্য পরিচালনা একা করা সম্ভব নয়।

ঔরংজীবের মধ্যে উদার মনোভাব, বদান্যতা ও রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধির অভাব ছিল। তিনি রাজপুত ও মারাঠাদের বুঝতে পারেন নি এবং তাদের সঙ্গে মিত্রতা না করে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে রাজ্যের ক্ষতি করেছিলেন। হিন্দুদের প্রতি আকবরের বিচক্ষণ উদার নীতি অনুসরণ না করে তিনি ভুল করেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে ভারতের মত বিশাল দেশকে শাসন করতে গেলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রয়োজন। বহু সম্প্রদায় ও বহু ধর্মীয় মানুষের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে কোন একটি বিশেষ ধর্মের প্রাধান্য অপরাপর সম্প্রদায়ের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে, এই সত্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

উদার, ধর্মসহিষ্ণু ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ সম্রাট আকবর যে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, ঔরংজীব তাঁর সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ ও রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধিহীন নীতি দ্বারা সেই সাম্রাজ্যের অবসানের সূচনা করেন।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

ভূমিকা

অতি প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশগুলির **সামুদ্রিক বাণিজ্যের** সম্পর্ক ছিল। মধ্য যুগে ইউরোপীয় বণিকদের **প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য** প্রধানতঃ **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।** ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ইতালীয় বন্দরের বণিকরা আরব বণিকদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে ইউরোপের নানা দেশে রপ্তানি করতে থাকে। আরব ও ইতালীর বণিকদের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত **ইউরোপীয় বণিকরা ভারত এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য করতে আগ্রহী হয়।** কিন্তু প্রাচ্যে যাতায়াতের জলপথ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূচনা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে অভূতপূর্ব নবজাগরণ দেখা দেয় তার এক প্রধান লক্ষণ ছিল বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে কৌতূহল এবং নতুন নতুন দেশ ও জলপথ আবিষ্কারে আগ্রহ। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার, উন্নত ধরনের ম্যাপ ও চার্টের ব্যবহার, সুদৃঢ় ও বৃহদাকার জাহাজ নির্মাণ এবং ভূগোল, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা ভৌগোলিক আবিষ্কারের সহায়তা করে। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগীজ নাবিক **বার্থোলোমিও দিয়াজ** উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তোলেন। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে **ভাস্কো দা গামা** ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপনীত হন।

ভারতে পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন

দু'বছর পরে **কাব্রাল** এইখানে একটি পোর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। কিছুকালের মধ্যে পশ্চিম উপকূলের **গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন,** বাংলাদেশের **হুগলী** প্রভৃতি স্থানে পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং প্রতিপত্তি বিস্তারের মূলে ছিলেন ভারতে পোর্তুগীজ-অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনকর্তা **আলবুকার্ক** (১৫০৯-১৫১৫)।

পোর্তুগীজদের ব্যর্থতার কারণ

পোর্তুগীজ প্রাধান্য কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভারতীয়দের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা, বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার, স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি দুর্ব্যবহার, কুশাসন, অদূরদর্শিতা, জলদস্যুতার প্রবণতা প্রভৃতি কারণের সমাবেশে পোর্তুগীজদের পতন হয়।

পোর্তুগীজরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত তখন অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরাও নিশ্চেষ্টা ছিল না। ১৬০২ খ্রীস্টাব্দে একটি ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা ভারতবর্ষ, দূরপ্রাচ্য ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা করে। ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাণিজ্য-

ওলন্দাজ বণিকদের উদ্যম

কুঠিগুলির মধ্যে পশ্চিম উপকূলে সুরাট, দক্ষিণে নেগাপত্তম এবং বাংলায় চুঁচুড়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রতি ওলন্দাজদের আকর্ষণ ছিল বেশী।

ইংরাজ বণিকদের আগমন

১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই কোম্পানীটি রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। সুরাটে একটি ইংরাজ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভের জন্য ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কয়েক বছর পর স্যার টমাস রো ইংলণ্ডের রাজদূতরূপে মুঘল দরবারে উপস্থিত হন। কিছুকালের মধ্যে পশ্চিমে সুরাট (১৬১৩), দক্ষিণ-পূর্বে মসলিপত্তন, দক্ষিণে মাদ্রাজ (১৬৩৯), এবং পূর্ব ভারতে হুগলী (১৬৫১), হরিহরপুর, বালেশ্বর, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ-কুঠি নির্মিত হয়। চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজের

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কুঠি নির্মাণ

শাসনভারও ইংরাজরা লাভ করেছিল। এই বাণিজ্যকেন্দ্রটি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তারা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ দুর্গ নির্মাণ করে। ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস্ বিবাহের যৌতুকরূপে পোর্তুগালের কাছ থেকে বোম্বাই দ্বীপটি লাভ করেন। তিনি এই দ্বীপটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নামমাত্র মূল্যে ইজারা দেন (১৬৬৮)।

মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজয়

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুল্ক আদায় সংক্রান্ত মতভেদকে কেন্দ্র করে মুঘল সরকারের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ দেখা দেয়। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইংরাজরা সম্রাট ঔরংজীবের কাছে নতি স্বীকার করলে তিনি তাদের তিন হাজর টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করেন। ইংরাজ কুঠিগুলির প্রধান জব চার্ণক বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে (আগস্ট, ১৬৯০) গঙ্গাতীরে সুতানুটি, কলিকাতা ও

কলিকাতার ইংরাজ প্রেসিডেন্সির প্রতিষ্ঠা

গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। কয়েক বছর পর এইখানে ইংরাজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মত কলিকাতাও একজন ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিলের শাসনাধীন হওয়ায় 'প্রেসিডেন্সি' নামে অভিহিত হয়।

এইভাবে ভারতবর্ষে তিনটি ইংরাজ প্রেসিডেন্সি স্থাপিত হয়। ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে সুরাট (১৬৬৮), মসুলিপত্তন (১৬৬৯), পাণ্ডিচেরী (১৬৭৪) এবং চন্দননগরে (১৬৮৮) ফরাসীরা বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করে। আরও কিছুকাল পরে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে মাহে এবং পূর্ব উপকূলে কারিকল ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও উপনিবেশে স্থাপনের দ্বন্দ্বে কালক্রমে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের পরাজয় হয় এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। দুই দেশের মধ্যে এই বিরোধ ইউরোপের রাজনৈতিক আবর্তনের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল।

ফরাসী বণিক

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা

পঞ্চম অধ্যায় | # ভারতে মুঘল শাসনের প্রভাব

মুঘল যুগ ঃ মুঘল যুগে ভারতীয় সমাজবিন্যাসের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। সমাজের শীর্ষে ছিল আমীর-ওমরাহ এবং উচ্চপদমর্যাদার রাজপুরুষেরা। তারপর ছিল প্রধানতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সর্বনিম্নে ছিল বিত্তহীন সাধারণ মানুষ। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ব্যয়বহুল আড়ম্বর, বিলাসিতা, স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও সাধারণতঃ তাদের জীবনযাত্রা ছিল সংযত। নিম্নশ্রেণীভুক্ত জনসাধারণের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

সামাজিক-শ্রেণীবিভাগ

মুসলমান শাসনের সূচনাকাল থেকে হিন্দু ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে কালক্রমে সামাজিক অনুশাসন আরও কঠোর হয় ও পণপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথার ব্যাপক প্রচলন হয়।

হিন্দু সমাজের অবস্থা

হিন্দুজীবন ও সমাজ, বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা, মুসলমান সমাজকেও প্রভাবিত করেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মুঘল যুগের মুসলমান সমাজ প্রকৃতপক্ষে দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। উচ্চ শ্রেণীভুক্ত লোকেরা 'সরিফ' এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা 'অজলাফ' নামে পরিচিত ছিল। সৈয়দ (শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত), মুঘল-পাঠান (যোদ্ধা), শেখ (সম্মানজনক বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত) ইত্যাদিরা ছিল 'সরিফ' বা ওপরতলার মানুষ। কৃষিজীবী, ক্ষুদ্র কারিগর, কশাই, ঝাড়ুদার প্রভৃতি নিম্ন কাজে নিযুক্ত লোকেরা ছিল 'অজলাফ' বা নীচের তলার মানুষ। সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজের শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এই শ্রেণীবিভাগের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল।

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব

মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল কৃষিপ্রধান ও গ্রামভিত্তিক। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক উৎসব, প্রাথমিক শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি সব কিছুর কেন্দ্র ছিল গ্রাম। কৃষি পদ্ধতি ছিল সহজ ও সরল। জমি ছিল উর্বর ও প্রচুর। সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিশাল, কিন্তু জনসংখ্যা ছিল কম। চাষবাসের উপযোগী জমির তুলনায় কৃষকের অভাব ছিল। অরণ্যাঞ্চল ও জলের কোন অভাব না থাকায় গবাদি পশুপালনের খুব সুবিধা ছিল। জমির মূল্য কম হওয়ায় জমির মালিকানা লাভের জন্য তেমন কোন আগ্রহ ছিল না।

কৃষিকর্ম ও গ্রাম্য জীবন

বেকার সমস্যা ছিল না। কিন্তু আপাতপ্রাচুর্য সত্ত্বেও কৃষকদের অবস্থা ভাল ছিল না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অনেক সময় রাজপুরুষদের উৎপীড়নের ফলে কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হত। গ্রাম্য শাসন বহুলাংশে স্বনির্ভরশীল ছিল। গ্রামের জীবনে পুরোহিত, দৈবজ্ঞ এবং শিক্ষকের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

খাদ্য

চাল, গম, ডাল এবং মাছ বাংলাদেশে এবং উপকূলবর্তী লোকেদের প্রধান খাদ্য ছিল। উত্তর ভারতে গম বা জোয়ারের তৈরী চাপাটি সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। ঘি এবং তেলের দাম কম ছিল। লবণ এবং চিনির দাম খুব বেশী ছিল।

শিল্প-বাণিজ্য

মুঘল যুগের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিনির্ভর হলেও শিল্প-বাণিজ্যও উন্নত ছিল। ভারতীয় সূতী ও রেশমের বস্ত্র, সোনারূপার সৌখিন ও সূক্ষ্ম সামগ্রী, অলঙ্কার ইত্যাদি দেশে-বিদেশে সমাদৃত হত। ভারত থেকে সোরা এবং নীলও বিদেশে রপ্তানি হত। ভারতে নির্মিত জাহাজ ও নৌকার মান ছিল খুব উন্নত। রপ্তানি-বাণিজ্য উন্নত হওয়ায় ভারতে প্রচুর বিদেশী সোনা ও রূপা আমদানি হত। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের গোয়া, কালিকট, কোচিন, সুরাট, ব্রোচ, দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের মসুলিপত্তম এবং পূর্ব ভারতের চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, সোনার গাঁও, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর। মুঘল আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে কাবুল ও কান্দাহারের মধ্য দিয়ে পারস্য ও তুর্কীস্থানের সঙ্গে বাণিজ্য চলত। চীন থেকে ভারতে চীনা রেশম, কর্পূর ও নানা রকম জিনিস আমদানি হত। জলপথে আরব দেশগুলি, ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ ও ইংরাজ বণিকরা বাণিজ্য করতে ভারতে আসেন।

জিনিসপত্রের সুলভ মূল্য

ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা, লাহোর, আহম্মদাবাদ, বারাণসী, পাটনা, ঢাকা, রাজমহল, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, হুগলী ইত্যাদি ছিল সমৃদ্ধিশালী শহর। খাবার-দাবার ও জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই কম। ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে এক টাকায় ৫০ সের চাল এবং প্রায় ২০ সের চিনি পাওয়া যেত। ঘিয়ের দাম ছিল টাকায় ১০ সের, নুন ছিল টাকায় ৬৭ সের। কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে লোকের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা ছিল খুবই কম। মুঘল যুগে বহু দুর্ভিক্ষ হয়; প্রতিরোধে কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না।

সুলতানী শাসনব্যবস্থার মত মুঘল শাসন-ব্যবস্থাও ছিল সামরিক শক্তিনির্ভর ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বাদশাহ। শাসন-তন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

মুঘল সাম্রাজ্য দুটি সার্বভৌম কেন্দ্রীয় শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল: (১) সম্রাটের সর্বোচ্চ ও একচ্ছত্র শাসন কর্তৃত্ব ও (২) সামরিক বাহিনী।

মনসবদারী প্রথায় প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সৈন্যদলে নাম নথিভুক্ত করতে হত। সম্রাট ছিলেন সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি বিচার বিভাগের শীর্ষে ছিলেন ও সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন। সম্রাট প্রত্যেক মনসবদারের পদমর্যাদা অনুযায়ী জায়গীর নির্দিষ্ট করে দিতেন এবং বিচার বিভাগের জন্য সম্রাট নিজে বিচারক নিয়োগ করতেন। মন্ত্রীরা ছিলেন সম্রাটের মনোনীত। অসামরিক ও সামরিক আইনগুলি কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের।

শাসন ব্যবস্থা

যদিও সাম্রাজ্যে 'শরিয়তের' ঐশ্লামিক নীতিগুলি মেনে চলা হত, তবুও সম্রাটের জরুরী ব্যবস্থা ও অন্যান্য আদেশগুলি আইন বলে পরিগণিত হত। সম্রাটের আদেশ বা কার্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন সংগঠনিক আইন সভা বা স্বাধীন বিচার বিভাগ ছিল না। যাই হোক ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে "মহজর" (Mahzar) বিভিন্ন মতবাদের ধার্মিক লোকদের কোরাণের আদর্শ অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থায় মনোনীত করার সীমিত অধিকার আকবরকে দিয়েছিল। এছাড়া হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণের উপর সম্রাটের হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না। পঞ্চায়েত প্রথার প্রবর্তন স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার একটি উদাহরণ। মুসলমান এবং হিন্দুদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় আইন বা নীতির উপর সম্রাটের কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না। জমিদাররা গ্রামে অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তথাপি মুঘল সাম্রাজ্যে সার্বভৌম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের শাসন ব্যবস্থা আকবর জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও ঔরংজীবের আমলে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল জমির খাজনা, শুল্ককর, টাঁকশাল, সামন্তনৃপতিদের সম্রাটকে দেওয়া উপঢৌকন ও উপহার, একচেটিয়া ব্যবসার কর এবং নানা প্রকার ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা। এছাড়া কৃষকদের নিকট হতে জমির উৎপাদনের উপর কর ও অন্যান্য অনেক প্রকার কর ছিল।

রাজস্ব

মুঘল সাম্রাজ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি দেওয়া হত। এই জমির রাজস্বের পরিমাণ মাহিনার সমান হত। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিকে বলা হত জায়গীর এবং যাঁদের নামে এই জমি দেওয়া হত তাদের বলা হত জায়গীরদার। সাধারণতঃ মনসবদারদের জায়গীর দেওয়া হত। এই মনসবদাররাই সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন।

জায়গীরদাররা সরকার নির্দেশিত রাজস্ব ছাড়া নানা প্রকার কর কৃষক ও সাধারণ লোকেদের কাছ থেকে আদায় করত। এর জন্য কৃষক শ্রেণী উৎপীড়িত হত। আবার মাঝে মাঝে জায়গীরদাররা এক জায়গীর থেকে অন্য জায়গীরে বদলি হয়ে যেত। তার ফলে জমির বা জায়গীরের প্রতি তাদের কোন মায়া ছিল না। সে জন্য কৃষির উন্নতি ব্যাহত হত ও কৃষি জমির কোন উন্নতি করার ব্যবস্থা হত না।

জায়গীদারী

মুঘল শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আকবর। তিনি এবং তাঁর

পরবর্তী মুঘল সম্রাটরা মুসলমান জগতের প্রধান 'খলিফার' আনুগত্য স্বীকার করেননি এবং মুঘল সাম্রাজ্যকে বৃহত্তর ঐস্লামিক সাম্রাজ্যের অংশ বলে মনে করেননি। আকবর ভারতে সকল জাতি ও ধর্মের মানুষকে সমানাধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদারনীতি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্পর্শ ও মিলনের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করেছিল। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান আকবরের মহান নীতি ঠিকমত অনুসরণ না করলেও সম্পূর্ণ বর্জন করেননি। ধর্মান্ধ ঔরংজীব এই নীতি স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করে নিজের এবং মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন; কিন্তু তিনিও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলেছিলেন, 'ধর্মের সঙ্গে জাগতিক ব্যাপারের কি সম্পর্ক আছে? গোঁড়ামিই বা কেন ধর্মীয় ব্যাপারে প্রবেশ করবে? তোমার জন্য তোমার, আমার জন্য আমার ধর্ম রয়েছে।'

মুঘল শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

সুলতানী আমল থেকে যে হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ও সমন্বয় শুরু হয়েছিল মুঘল যুগে তার আরও অগ্রগতি হয়। খাদ্য, বেশভূষা, শিষ্টাচার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য গড়ে ওঠে। দুই ধর্মাবলম্বী লোকেরা পরস্পরের উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকে। গ্রামীণ জীবনে এই মেলামেশা আরও ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ ছিল। সরকারী কাজকর্মে সর্বত্র পারসীক ভাষার ব্যবহার, উর্দু ভাষার প্রচলন ও একই মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন রাষ্ট্রীয় সংহতি স্থাপনে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল।

পারস্পরিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় সংহতি

মুঘল যুগে হিন্দুরা যেমন অনেকে ফার্সী ভাষা চর্চা করতে থাকে তেমনি মুসলমানরাও সংস্কৃত চর্চায় আগ্রহী হয়। ভারমল, ভীমসেন, সুজন রায়, ঈশ্বরদাস নাগর প্রমুখ হিন্দু লেখকরা ফার্সী বা পারসীক ভাষায় সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মালিক মহম্মদ জয়সী, 'রসখান', 'খানখানান', আবদুর রহিম প্রভৃতি মুসলমান লেখকরা হিন্দী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেছিলেন। তাছাড়া উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভগবদ্গীতা ইত্যাদি ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেও মুসলমানরা বিশেষ আগ্রহী ছিল। মুঘল বাদশাহরা সকলেই সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। বাবর তুর্কী ভাষায় আত্মজীবনী ও কবিতা লিখেছিলেন। তিনি ফার্সী ভাষাও ভাল জানতেন। হুমায়ুন ছিলেন সাহিত্যরসিক, ভাববিলাসী, জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যানুসন্ধানী। শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে আকবরের গভীর আগ্রহের কথা সুবিদিত। জাহাঙ্গীর সাহিত্য, শিল্প এবং বিশেষ করে চিত্রকলার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শাহজাহানের সময়ও ফার্সী ভাষায় কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অবশ্য তাঁর স্থাপত্যকীর্তির জন্যই

পরস্পরের ভাষা ও সাহিত্যচর্চা

মুঘলদের সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পপ্রীতি

শাহজাহান অধিকতর প্রসিদ্ধ। দারা সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। ঔরংজীবও ছিলেন সুপণ্ডিত ও উত্তম গদ্যলেখক, যদিও তাঁর সাহিত্য বা সুকুমার শিল্পের প্রতি অনুরাগ ছিল না। সম্রাট বাহাদুর শাহ উর্দু ও ব্রজভাষার সুকবি ছিলেন। এছাড়া বাবরের কন্যা গুলবান, শাহজাহানের কন্যা জাহানারা, ঔরংজীবের কন্যা জেবউন্নিসার সাহিত্য-প্রতিভা ছিল।

ফার্সী সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ

রাজপরিবার এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাহিত্যানুরাগ মুঘল যুগে সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল, আবদুল হামিদ লাহোরী, বদায়ুনী, ফিরিস্তা, খাফি খাঁ (মুহম্মদ হাসিম) প্রভৃতির মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ এই যুগে লেখা হয়েছিল। কবি ফৈজী ছিলেন আকবরের সভাসদ্। হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ কবি তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' ও আগ্রার অন্ধ কবি সুরদাসের কবিতাবলী মুঘল আমলে রচিত হয়েছিল। এই যুগেই কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। সপ্তদশ শতকে মুসলমান কবি আলাওল বাংলায় 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। মুঘল যুগে মারাঠী ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। রামদাস, তুকারাম, বামন, মহীপতি, ময়ূখ পণ্ডিত, সেখ মহম্মদ প্রভৃতির রচনা মারাঠী সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রতিটি

হিন্দী সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য

মারাঠী সাহিত্য



সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি

প্রাদেশিক ভাষা ছিল ঐ অঞ্চলের জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষের জীবন ও মননের ধারক ও বাহক।

উর্দু ভাষার বিকাশ লক্ষ করা যায় চতুর্দশ শতক থেকে। মুঘল আমলে উর্দু ভাষার উন্নতি হয় এবং উর্দু ভাষায় কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করা হয়। মীর্জা-জান-ই-জানান ও মীরতাকি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উর্দু লেখক ছিলেন।

উর্দু

মুঘল সম্রাটরা এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলার অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় সুকুমার শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি শিল্পোন্নতির সহায়ক হয়েছিল। ভারতীয় ও পারসীক শিল্পরীতির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলে মুঘল স্থাপত্যরীতি ইন্দো-পারসীক (Indo-Persian) শিল্প নামে পরিচিতি লাভ করেছে। হুমায়ুনের সমাধি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি ও দিল্লী প্রাসাদ দুর্গ, সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি, ইতমদ্দোলার সমাধি, আগ্রা দুর্গাভ্যন্তরে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, শীসমহল, মোতি মসজিদ, জাম-ই-মসজিদ, অন্যান্য স্থানের মুঘল প্রাসাদ, সৌধ, মসজিদ এবং সর্বোপরি তাজমহল মুঘল শিল্পোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ইন্দো-পারসীক শিল্প

মুঘল আমলে চিত্রশিল্পেরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের মত মুঘল চিত্রকলাতেও ভারতীয় ও পারসীক রীতির সমন্বয় ঘটেছিল। আকবর চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলের খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে চিত্রশিল্পের সমঝদার ও গভীর অনুরাগীরূপে জাহাঙ্গীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রাজপুতানার রাজারাও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এর ফলে রাজপুত চিত্রকলা-রীতি উদ্ভব হয়। পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে আর একটি পাহাড়ী চিত্রকলার সৃষ্টি হয়েছিল। এই রীতিটি কাংড়া চিত্ররীতি নামে খ্যাত হয়। মুঘল যুগের বিভিন্ন চিত্রশিল্পরীতিতে হিন্দু ও মুসলমান অঙ্কনরীতি ও পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটেছিল।

চিত্রশিল্প

রাজপুত চিত্রকলা

কাংড়া চিত্রকলা

মুঘল সম্রাটরা সঙ্গীতরসিক ছিলেন। আকবরের রাজসভায় বহু সঙ্গীত-শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তানসেন এবং বজ্‌বাহাদুর। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান দুজনেই সঙ্গীতচর্চা করতেন এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঔরংজীব সঙ্গীতকে ইসলাম-বিরোধী মনে করতেন বলে সঙ্গীতচর্চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

সঙ্গীত

পূর্ববর্তী যুগ থেকে ধর্মচিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে যে সমন্বয়-প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল মুঘল যুগেও তা অব্যাহত ছিল। আকবরের 'দীন-ইলাহী' ছিল ধর্মীয় ঐক্য ও সমন্বয় সাধন-প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি। ষোড়শ শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর এক ধর্মগুরু দাদু দয়াল গভীরভাবে সুফীবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দাদু বলেছিলেন, 'হে আল্লা রাম, আমার

ধর্মচিন্তার সমন্বয়



রাজপুত চিত্রকলা

মনের ভ্রম দূর হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমানে কোনও পার্থক্য নেই। তুমি রাম, তুমিই রহিম, তুমি কেশব, তুমিই করিম।' এইরূপে সমন্বয়ধর্মী চিন্তাধারা ও সুফীবাদ মুঘল যুগে শাসক-শাসিত, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে নিকটতর করে তুলতে সাহায্য করেছিল। সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এই সমন্বয়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এক বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের স্রষ্টা এবং উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও বিরোধী মনোভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন মুঘল সম্রাটদের শাসনকালে যে সব **বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন**, তাঁদের বিবরণ থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। এঁদের মধ্যে আকবরের রাজত্বকালে ইংরাজ ভ্রমণকারী রলফ্ ফিচ্, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ক্যাপ্টেন হকিন্স ও স্যার টমাস রো, ঔরংজীবের রাজত্বকালে ফরাসী ব্যবসায়ী টেভার্নিয়ে ও চিকৎসক বার্নিয়ে প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফিচ্ আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রিকে লণ্ডন নগরী অপেক্ষা বৃহত্তর বলে বর্ণনা করেছেন। হকিন্স মুঘল রাজসভায় আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে মুঘল রাজকর্মচারীদের অনেকেই ঘুষ নিত। পথঘাট নিরাপদ ছিল না। স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের রাজসভার বিলাসব্যসন জাঁকজমকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মুঘল সম্রাট পারস্য বা তুরস্কের সম্রাটের চেয়েও বিত্তশালী ছিলেন। কিন্তু দেশের সাধারণ কৃষকদের অবস্থা ভাল ছিল না। আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা ও প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় ছিল না। দেশে কোন লিখিত আইন ছিল না। সম্রাটের নির্দেশে রাজ্য-শাসন চলত। রো জাহাঙ্গীরের বুদ্ধি ও ন্যায়বিচারের প্রশংসা করেছেন। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে ব্রুটন ও কার্টরাইট নামে দুজন ইংরাজ ব্যবসায়ী বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁরা বাঙালীদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশংসাবাচক উল্লেখ করেছেন। ব্রুটন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে দেশের এক বিশিষ্ট ধর্মস্থান বলে বর্ণনা করেছেন। আকবরের শাসনকাল পর্যন্ত এই মন্দিরের ওপর কোনও কর ধার্য করা হয়নি। ব্রুটন উড়িষ্যার শ্রমজীবীদের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। বাঙালী কারিগরদের নৈপুণ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে মুঘল ভারতের জীবনযাত্রার এক চিত্তাকর্ষক পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে মুঘল ভারত

ডাচ বণিক ফ্রান্সিসকো পেলসায়েরট্ (**Francisco Palsaert**) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে কৃষকরা প্রাদেশিক শাসক ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা উৎপীড়িত হত। বাংলাদেশ তুলা ও রেশম চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। টেভার্নিয়ে বাংলাদেশে পর্তুগীজ ও মগ অত্যাচারের কথা বলেছেন। বার্ণিয়ে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির উল্লেখ করেছেন। মানুসি (**Manucei, Niccolo**) প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের দ্বারা জনসাধারণের শোষিত হওয়ার কথা বলেছেন।

ভারতের ইতিহাস (১৭০৭-১৯৪৭)

নবম শ্রেণী (১৭০৭-১৮৫৭)

প্রথম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও নাদির শাহের ভারত আক্রমণ

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনের অবসান হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী বৃদ্ধ **বাহাদুর শাহ** (১৭০৭-১৭১২) রাজকার্যে অমনোযোগী ছিলেন বলে তাঁকে বিদ্রূপ করে 'শাহ-ই-বেখবর' বলা হত। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একের পর এক অযোগ্য সম্রাট স্বল্প কালের জন্য রাজত্ব করেছিলেন। **দ্বিতীয় শাহ আলম** (১৭৬১-১৮০৬) দীর্ঘকাল রাজত্ব করলেও তিনিও ছিলেন দুর্বল, অকর্মণ্য, অপদার্থ ও অস্থিরচিত্ত। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে ভারতবর্ষে বৃটিশ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পরবর্তী মুঘল সম্রাটের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা

মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের সম্রাট **নাদির শাহ** ভারত আক্রমণ করে দিল্লীতে উপস্থিত হন। বহু মানুষকে হত্যা করে ও আশি কোটি টাকা, ময়ূর সিংহাসন, কোহিনুর হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুঠ করে নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। নাদির শাহের আক্রমণের জের শেষ হতে না হতেই আর এক বৈদেশিক আক্রমণকারীর দৃষ্টি ভারতের ওপর পড়ে। ইনি ছিলেন আফগান অধিপতি **আহম্মদ শাহ দুরানী** বা দুরানী। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ন'বার ভারত আক্রমণ করে তিনি দুবল ও ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যকে প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ভারতে বৃটিশ অধিকার স্থাপনের পথ সুগম করে।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ

আহম্মদ শাহ দুরানীর ভারত আক্রমণ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

কালের নিয়মে সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ইতিহাসের স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং একদা বিশাল ও মহাশক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। ঔরংজীবের ধর্মান্ধতা এবং তাঁর অদূরদর্শী দাক্ষিণাত্য-নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল। রাজপুত, মারাঠা, শিখ এবং অন্যান্য বহু ধর্ম ও জাতির মানুষের শত্রুতা সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে অন্যান্য কারণও ছিল।

ঔরংজীবের দায়িত্ব

স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

সম্রাট আকবর তাঁর দক্ষ শাসন ক্ষমতা, ধর্ম-সহিষ্ণুতা, রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা নীতি, কূটনৈতিক যোগ্যতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য রক্ষা, এবং জন সংযোগ দ্বারা মুঘল সাম্রাজ্য বিশাল ও সুদৃঢ় করেছিলেন। কিন্তু ঔরংজীব সংকীর্ণ ধর্মান্ধ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণ করে রাজপুত, শিখ, মারাঠা ও জাঠ শক্তির সহযোগিতা ও আনুকূল্য হারান। সদা সন্দিগ্ধ ঔরংজীবের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থার প্রত্যেক বিষয়ের নিজে পর্যালোচনা করে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত শাসন ক্ষতিকর হয়ে পড়েছিল। আকবর হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও আনুগত্যের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য তিনি সাম্রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঔরংজীব বুঝতে পারেননি যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণের সহানুভূতি ও শক্তির উপর রাষ্ট্রের শক্তি নির্ভর করে। এই সকল কারণে এবং আকবরের উদারনীতি থেকে সরে আসার ফলে ঔরংজীবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

আকবরের উদার নীতির থেকে সরে আসার ফল

আধুনিক গবেষকদের মতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও যুক্তিবাদী মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে একটি রাজত্বকালের উত্থান, অবস্থিতি ও পতনের পর্যালোচনা করা উচিত। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিবেচনা করা উচিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। এই সময়ে কৃষির উন্নতি হয়েছিল, তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এসত্ত্বেও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র লিখেছেন যে শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে সমতা রেখে কৃষির উৎপাদন যে পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। কৃষির উৎপাদন এক জায়গায় সীমিত হয়ে গিয়েছিল। জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়ায় কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়। কিন্তু তার জন্য জমি চাষ করার নতুন পদ্ধতি ও জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য কোন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া অতিরিক্ত ভূমি রাজস্বের চাপ কৃষির উৎপাদনকে ব্যাহত করে।

কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়

জাহাঙ্গীর থেকে ঔরংজীবের সময়ের মধ্যে মনসবদারদের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থের চাহিদাও বেড়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের রাজস্বের আয় সেই অনুপাতে বাড়েনি। রাজদরবারে এবং আমীর-ওমরাহ ও মনসবদারদের মধ্যে বিলাস ব্যসনও খুব বেড়ে যায়। ফলে জমিদার এবং কৃষকশ্রেণী উৎপীড়িত হয়। এই ভাবে জায়গীরগুলি থেকে সরকার অনুমোদিত রাজস্ব অপেক্ষা জোর করে অধিক রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করা হয়। এর ফলে মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সমাজে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা

অতিরিক্ত রাজস্বের চাপ

দেয়। গ্রামীণ সমাজগুলি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কোন কোন জায়গায় কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, কোন কোন জায়গায় জমিদাররা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আবার অনেক জায়গায় স্থানীয় শাসন কর্তারা আঞ্চলিক শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আমীর ওমরাহ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর ফলে জায়গীর প্রথা সংকটের সম্মুখীন হয়। জায়গীরদাররা প্রত্যেকে সর্বাপেক্ষা লাভজনক জায়গীরটি হস্তগত করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে। এর ফলে মুঘল শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি দেখা দেয়।

জায়গীর প্রথায় সংকট

শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি

ঔরংজীবের আমলে প্রায়ই ব্যয়বহুল যুদ্ধ লেগে থাকত। এই সময়ে শাসন পরিচালনার খরচও অনেক বেড়ে যায়। সেই কারণে যুদ্ধ এবং শাসন পরিচালনার নিমিত্ত **খালসা** বা রাজকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য জমির পরিমাণ ঔরংজীব ধীরে ধীরে বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। এর ফলে জায়গীর সংকট আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সব কারণে **ঔরংজীবের অনুসৃত নীতিগুলিই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা করে।**

মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন ও কৃষি বিপর্যয়কে **জায়গীর সংকট** বলে অভিহিত করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে এই সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র লিখেছেন যে শাসন পরিচালনা এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করে জাতীয় আয়ের যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকত, তাতে শাসক শ্রেণীর মর্যাদা ও সম্মান অনুযায়ী আশানুরূপ জীবন ধারণের ব্যয় সঙ্কুলান হত না। শাসকশ্রেণীর প্রয়োজন যে হারে বেড়েছিল, সে পরিমাণে উৎপাদন বাড়ে নি। এর ফলে জমা বা অনুমিত রাজস্বের বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় প্রান্তিক অবস্থায় পেঁছয় (জমির উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের প্রায় সমান) এবং প্রায়ই **'হাসিল'** বা আদায়ীকৃত রাজস্ব জমার চেয়ে কম হত। সুতরাং জায়গীরদারদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য উৎকৃষ্ট জায়গীর কম পড়ে যেতে থাকল। কিন্তু অপরদিকে মনসবদারদের সংখ্যা বাড়ল এবং সীমিত সংখ্যক জায়গীরের জন্য প্রতিযোগিতা বাড়ল।

শাসকশ্রেণীর ব্যয় বাহুল্য

দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের ফলে দক্ষিণের মনসবদারদের বিশেষ করে মারাঠীদের আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনসবদারিতে এই আনুগত্য আরও হ্রাস পায়। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য মুঘল শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় অধিকাংশ জায়গীর থেকে মনসবদাররা তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করতে পারত না। ফলে বিপর্যয় আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়।

মনসবদারদের আনুগত্য হ্রাস

সুলতানী যুগের মত মুঘল আমলেও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে রাজ্যের জনসাধারণের কোন সহযোগিতা ছিল না। একমাত্র আকবর ছাড়া অন্য কোন সম্রাট সকল প্রজাকে একসূত্রে বাঁধবার প্রচেষ্টা করেননি। মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। আমীর ওমরাহ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতালিপ্সা, চক্রান্ত এবং বিদ্রোহ কেন্দ্রীয় শক্তি ও সাম্রাজ্যের সংহতিকে ক্ষুন্ন করেছিল। ঔরংজীবের পরবর্তী অযোগ্য শাসকদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলি সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়েছিল। মন্ত্রীদের অযোগ্যতা, কর্তব্যে অবহেলা, নৈতিক অধঃপতন, কর্মচারীদের অত্যাচার ইত্যাদি জনসাধারণের জীবন আরও দুর্বিষহ করে তুলেছিল। নানাপ্রকার বিলাস-ব্যসন, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব মুঘল সৈন্যদের মধ্যেও প্রবেশ করে।

আমীর-ওমরাহদের ক্ষমতালিপ্সা

পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা

সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা

মুঘল শাসন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ছিল মনসবদাররা এবং উচ্চপদস্থ আমীর ওমরাহরা। এম, এন, পিয়ারসনের মতে মুঘল যুগে সম্রাট ও মনসবদারদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা হল পৃষ্ঠপোষক ও তার পোষ্যবৃন্দের সম্পর্ক, এর স্থায়িত্ব নির্ভর করত সাম্রাজ্য ও সম্পদের নিয়ত বিস্তার ও বিকাশের ওপর। এই দুপক্ষের যোগসূত্র ছিল একান্ত ব্যক্তিগত ও সামরিক চরিত্রের; কোন জাতিগত বা ধর্মীয় আনুগত্য নয়। শাহজাহানের অসাফল্য, সে আনুগত্যের ভিত্তিকে শিথিল করে দিয়েছিল। ঔরংজীবের রাজত্বকালের শেষের দিকে অসাফল্য, সম্রাট এবং আমীর ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আদান প্রদানের সম্পর্কটি আরও নষ্ট করল ও শাসকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দুর্বলতাকে আরও প্রকট করে তুলল। এই অবস্থায় আমীর ওমরাহ ও অভিজাতশ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় এবং তাঁদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির দিকে নজর থাকায় সংকট আরও ঘনীভূত হল। অবশ্য মুঘলরা বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মনসবদারদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ঔরংজীবের পরে তাঁর বংশধরদের আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ায় আমীর-ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে যে জন্মগত বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ছিল তা প্রকট হয়ে উঠল। সম্রাট দুর্বল হওয়ায় মন্ত্রীরা ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগল।

পৃষ্ঠ-পোষক ও পোষ্যের সম্পর্ক

বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব

মনসবদারদের মধ্যে নানা উপজাতীয় বা ধর্মীয় উপদল ছিল—যেমন তুরাণী, ইরাণী, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি। সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে এদের ক্ষমতালিপ্সা এবং নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও বিবাদ বেড়ে গেল। সম্রাট নিজের অবস্থা নিরাপদ করার জন্য বিভিন্ন

বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দলাদলি

দলের মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য রাখার প্রচেষ্টায় কার্যতঃ তাদের দলাদলি আরও বাড়িয়ে দিলেন।

জে. এফ. রিচার্ডসের মতে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের পর দাক্ষিণাত্যে অনেক রাজপুরুষই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে চলেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বে-আইনী রাজস্ব আদায় করে এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁরা নিজেদের অবস্থা সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন। হায়দ্রাবাদের রুস্তম-দিল-খানের আচরণ এই কথা প্রমাণ করে।

রুস্তম-দিল-খান

ইদানীং কালে আরও একটি মতবাদ দেখা গেছে। এই মতবাদ অনুযায়ী কৃষি বা জায়গীর সংকট নয়। এর চেয়ে আরও বড় শক্তি হল আঞ্চলিকতাবাদ। অর্থাৎ আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ও মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধাচারণ, মুঘল সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কাজেই প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শক্তির উত্থান একটি বড় কারণ।

আঞ্চলিকতাবাদ

ঔরংজীবের শাসনকালে যে অবক্ষয়ের শুরু হয়, তাঁর দুর্বল বংশধরদের আমলে তা রোধ করা সম্ভব হয়নি। মুঘল সাম্রাজ্যের পেছনে কোন জাতীয়তা বোধ বা দেশাত্মবোধের মত শক্তি ছিলনা। মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা জনসমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সেজন্য রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু ঔরংজীবের পরবর্তী বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে সৈন্যবাহিনী উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

জাতীয়তা বোধের অভাব

এই সময় বিদেশী বণিক কোম্পানীগুলি ভারতে আসতে থাকে। তাদের সঙ্গে ব্যবহারে যতটা দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া দরকার মুঘল সম্রাটরা তা দিতে পারেন নি। সমুদ্রের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য নৌবহর তৈরীর উপর নজর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। পাশ্চাত্য দেশগুলির যখন সার্বিক অগ্রগতি হচ্ছিল, তখন ভারতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই অবক্ষয় এবং নিরুদ্যম ও নিশ্চল অবস্থা সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী। আসলে এই জটিল ধারাবাহিক কার্যাবলী বা প্রক্রিয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বহুবিধ কারণ দায়ী।

সার্বিক অগ্রগতির অভাব

মুঘল সাম্রাজ্যের এই পতনোন্মুখ সময়ে **নাদির শাহ** এবং **আহম্মদ-শাহ-দুরানীর** আক্রমণের ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে।

প্রচুর ধনসম্পদ সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যায়। উত্তর ভারতে ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত **বৃটিশ শক্তির** অভ্যুত্থান এই সংকটময় মুহূর্তে মুঘল সাম্রাজ্যের পুনরুত্থানের শেষ সম্ভাবনাটুকুও নষ্ট করে দেয়। এই সময়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গ জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমের বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার জন্য একত্রিত হতে পারল না।

নাদির শাহ ও আহম্মদ-শাহ আবদালী

নাদির শাহের পর মহম্মদ শাহ কোন রকমে মুঘল সিংহাসনটিকে বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু নাদির শাহ, পূর্বেই বলা হয়েছে, ভারত আক্রমণ করে কোহিনুর, ময়ূর সিংহাসন নিয়ে গিয়েছিল। নাদিরের নিজের সচিবের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে নাদির দিল্লী লুঠ করে বহু অর্থ, মূল্যবান রত্নরাজী, হাতী, ঘোড়া, উট প্রভৃতি নিয়ে যায়। সিন্ধু উপত্যকায় ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলি, কাবুল, পশ্চিম পাঞ্জাব পারসীকদের দিয়ে দিতে হল। নাদিরের আক্রমণ, আহম্মদ শাহ দুরানীর আক্রমণের পথ প্রস্তুত করল। ১৭৪৮ থেকে কয়েক বছরের মধ্যে বারবার ভারত আক্রমণ করে তিনি ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেন।

বিচ্ছিন্ন সুবাদারদের স্বাধীনতা ঘোষণা

সম্রাট আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন শাসন কার্যের সুবিধার জন্য। প্রতিটি সুবার শাসনকর্তাদের সুবাদার (সিপাহ শালার বা নাজিম নামেও পরিচিত ছিলেন) বলা হত। সুবাদারদের পরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী কর্মচারী ছিলেন দেওয়ান। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় সুবাদার ও দেওয়ান সম্রাটের প্রতি আনুগত্য রেখে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করতেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময় সম্রাটদের অযোগ্যতা ও কেন্দ্রীয় শক্তির ও শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপে অনেক সুবাদারই কার্যতঃ বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বৈদেশিক আক্রমণ

নাদির শাহ ও **আহম্মদ শাহ দুরানীর** আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা উদ্‌ঘাটিত করেছিল।

অর্থনৈতিক কারণ

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অভিজাত সম্প্রদায়ের অবক্ষয়, দলীয় বা গোষ্ঠীগত রাজনীতি এবং সর্বোপরি আর্থিক সংকটের লক্ষণগুলি ঔরংজীবের রাজত্বকালেরও আগে থেকে দেখা দিয়েছিল। ভূমি ও রাজস্বব্যবস্থার ত্রুটি, কৃষক-উৎপীড়ন, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ইত্যাদি বহু পূর্বেই শুরু হয়েছিল। শাহজাহানের সাম্রাজ্যবিস্তার, বাহ্যিক আড়ম্বর এবং ব্যয়বহুল মর্মরসৌধ, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য অকাতরে অর্থব্যয়ের ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল। ঔরংজীব নিজে মিতব্যয়ী হলেও দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে এবং বিদ্রোহ দমনে প্রচুর অর্থব্যয় করায় সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। অর্থনৈতিক দুর্দশা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল।

নাদির শাহের আক্রমণের ফল ঃ

নাদির শাহের আক্রমণের ফলে মুঘল দরবারের আমীর, ওমরাহ, মনসবদার এবং রাজন্যবর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিজাম-উল-মুল্‌ক আর একবার দরবার পরিত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে তাঁর রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করতে চান। সম্রাটের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় উইজারাত বা ওয়াজির (wizarat)হওয়ার জন্য আবার পুরানো দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

নাদির শাহ সম্রাট, আমীর, ওমরাহ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং দিল্লীর অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রচুর ধনসম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে যাওয়ার ফলে দেশের অর্থ-নীতিতে একটি বড় রকমের আঘাত আসে। অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কোন জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য সম্রাটের কাছে কোন নগদ অর্থ বা টাকা ছিল না। এই আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র দিল্লীর ব্যবসা বাণিজ্যেরও প্রভূত ক্ষতি হয়।

নাদির শাহর আক্রমণে জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কৃষকদের ওপর গুরু করভার চাপান হয়। এর ফলে কৃষকরা উৎপীড়িত হয় ও তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে জায়গীরদারী সংকট বিরাট আকার ধারণ করে।

নাদির শাহের আক্রমণের ফলে ভবিষ্যতে এইরূপ আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীতে দ্রুত গুলি ছোড়ায় দক্ষ বন্দুকধারী সৈন্য ও হাল্কা গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

এই আক্রমণের ফলে ভারত ও পারস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্কে ভাঙন দেখা দেয়। ইরাণী এবং তুরাণী অধিবাসীরা যারা ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল, তাদের পক্ষে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে আলাদাভাবে স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখা শক্ত হয়েছিল। এজন্য অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মনে করেন, নাদির শাহের ভারত আক্রমণে পরোক্ষভাবে একটি সুসংবদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠার পথ প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় | # আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুদয়

বাংলা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, অযোধ্যা, শিখ ও মারাঠা শক্তির উত্থান ও পতন

মুঘল রাজনৈতিক সংগঠনের ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছু স্বাধীন বা আধা স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। যেমন **বাংলাদেশ, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও মারাঠা** রাজ্য ইত্যাদি।

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে বৃটিশ-প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসের বিরুদ্ধে এই রাজ্যগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মুঘল-প্রভুত্ব প্রত্যাখ্যান করে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থায় নিজ নিজ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা স্থাপন করে। এবং স্থায়ী অর্থনীতি গড়ে তোলে।

এই রাজ্যগুলি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল এবং এই সব রাজ্যের শাসনকর্তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তাধারা একরকম ছিল। কিন্তু এরা অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কৃষির উৎপাদন কমে যাওয়ার জন্য উদ্বৃত্ত ফসলের অধিকার নিয়ে এই সব রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিবাদ লেগেই থাকত। কৃষকদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এই সব রাজ্য দেশের মধ্যে যাতে ব্যবসা বাণিজ্য ভেঙ্গে না পড়ে সেদিকে নজর দিয়েছিল। এমন কি বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্যের আধুনিকীকরণ তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ : ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে ঔরংজীব **মুর্শিদকুলি খাঁকে** বাংলার দেওয়ান করে পাঠান। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি বাংলার শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তিনি আমৃত্যু ঐ পদে আসীন থাকেন। মুর্শিদকুলি বিহার এবং উড়িষ্যার সামরিক ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মুর্শিদকুলি সীতারাম রায়, উদয় নারায়ণ, গোলাম মহম্মদ ইত্যাদির বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি মুঘল সম্রাটকে নিয়মিত নজরানা দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর (১৭২৭)

সুজাউদ্দিন

তাঁর জামাতা **সুজাউদ্দিন** ১৭৩৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। তিনি মুর্শিদকুলির পর বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁকে হত্যা করে **আলিবর্দি খাঁ** বাংলার শাসনকর্তা হন। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে আলীবর্দি সম্রাট কর্তৃক বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

বাংলার এই সব নবাবরা দিল্লীর মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করলেও প্রকৃত পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। এই নবাবদের আমলে বাংলায় শান্তি ও শৃংখলা বাড়ে ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়। মুর্শিদ অনেক জায়গীর জমিকে 'খালিসা' জমিতে (সরকারের নিজের অধীনস্থ) পরিণত করেন।

তকাভি ঋণ

দরিদ্র কৃষকদের 'তকাভি' (Taqavi) ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি যে রাজস্ব নীতি প্রবর্তন করেন, তার ফল ভাল হয়নি। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই সরকারের অধীনে সামরিক এবং অসামরিক চাকুরিতে যোগ দেওয়ার সমান সুযোগ পেত। তাঁদের আমলে অধিকাংশ জমিদারী ও রাজস্ব আদায়ের কর্মচারীর পদ হিন্দুদের হাতে ছিল।

বাংলার এই নবাবরা বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাগুলির উপর কড়া নজর রাখেন, যাতে তারা নবাবদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার করতে না পারে।

বিদেশী বাণিজ্য সংস্থা

আলীবর্দি ইংরাজ ও ফরাসীদের কলিকাতা ও চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ করতে দেননি। কিন্তু বহির্বিশ্বের খবর না রাখার জন্য নবাবরা বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চরিত্র বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। সুতরাং তাঁরা ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক শক্তি ব্যবহার করার যে প্রবণতা বোধ বেড়ে গিয়েছিল, তা রোধ করতে পারেন নি! তাঁরা সুদৃঢ় সৈন্য বাহিনী গঠন করেন নি এবং এরজন্য অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। নবাবরা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ করতে পারেন নি। বিদেশী বণিকরা এর পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছিল।

হায়দ্রাবাদ এবং কর্ণাটক : নিজাম-উল-মুল্ক আসফ জা ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দ ভ্রাতাদের পর্যুদস্ত করার পুরস্কার হিসাবে তাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার করা হয়।

১৭২০ থেকে ১৭২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে **আসফ জা** দাক্ষিণাত্যে তাঁর কর্তৃত্ব সুসংহত করেন। ১৭২২ থেকে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি মুঘল

আসফ জা

সাম্রাজ্যের উজির (wazir) হিসাবে সম্রাটের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ শাসন ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়বার জন্য তাঁর প্রচেষ্টাকে সম্রাট মহম্মদ শাহ ব্যাহত করেছিলেন। সুতরাং যেখানে তাঁর প্রাধান্য অব্যাহত থাকবে, সেই দাক্ষিণাত্যে আসফ ঝা ফিরে যাওয়াই মনস্থ করলেন। আসফ জা মুঘল সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করে কখনও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, তবে তিনি স্বাধীন নবাবের মত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। একজন হিন্দু, পুরণচাঁদ তাঁর দেওয়ান ছিলেন। তিনি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আসফ ঝা বড় বড় জমিদারদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ও তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন এবং শক্তিশালী মারাঠা শক্তিকে তাঁর রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে দেননি। তিনি

রাজস্ব ব্যবস্থাকেও দুর্নীতি মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর হায়দ্রাবাদ, দিল্লীর কতকগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আক্রমণস্থল হয়ে দাঁড়ায়।

মুঘল সম্রাটের অধীনস্থ দাক্ষিণাত্যের একটি সুবা হল কর্ণাটক। সুতরাং এটি হায়দ্রাবাদের নিজামের এলাকাভুক্ত। 'নবাব' নামে অভিহিত কর্ণাটকের উপ-শাসন কর্তা, দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। কর্ণাটকের এই নবাব সাদুতুল্লা খাঁ (Saadutullah Kban) তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হায়দ্রাবাদের নিজামের অনুমতি ছাড়াই তাঁর ভাইপো 'দোস্ত আলি'কে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের পর নবাবীর অধিকার নিয়ে বারবার যুদ্ধের জন্য কর্ণাটকের অবস্থার অবনতি হয়। এর ফলে বিদেশী বণিক কোম্পানীদের ভারতীয় রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়।

মহীশূর : হায়দ্রাবাদের পর মহীশূরই দক্ষিণের অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল। **হায়দার আলি** এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে মহীশূর কোনও রকমে তার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে চলছিল। খ্রীস্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে নান্‌জারজ (Nanjarj) ও দেবরাজ (Devraj) নামে দুজন মন্ত্রী মহীশূরের শাসন ক্ষমতা দখল করেন এবং রাজা নামে মাত্র তাঁদের হাতে পুতুলের মত থাকেন।

হায়দার আলি মহীশূর সেনা বাহিনীতে একজন সাধারণ উচ্চপদস্থ সৈনিক ছিলেন। মহীশূর যখন দীর্ঘ কুড়ি বছর নানা প্রকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে হায়দার আলি তখন রণ চাতুর্যের সাহায্যে সেই সুযোগ গ্রহণ করে সৈন্যবাহিনীতে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি শীঘ্রই পশ্চিমী সামরিক শিক্ষার দক্ষতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেইভাবে তাঁর অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তিনি 'দিন্দিগাল' এ ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সামরিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে একটি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ভান্ডার স্থাপন করেন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে হায়দার আলি মন্ত্রী নান্‌জারজকে পর্যুদস্ত করে মহীশূর রাজ্যে তাঁর সর্বময় শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

হায়দার আলি বিদ্রোহী পলিগার বা জমিদারদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যখন মহীশূরের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন মহীশূর একটি দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন রাজ্য ছিল। শাসন ক্ষমতা অধিকারের পর খুব শীঘ্রই হায়দার আলি মহীশূরকে একটি অন্যতম ভারতীয় শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

হায়দার আলি ধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর প্রথম দেওয়ান এবং অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিন্দু ছিলেন। হায়দার আলি প্রথম থেকেই মারাঠা, নিজাম এবং বৃটিশদের

সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। **প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে** (১৭৬৭-১৭৬৯) ইংরাজরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন (এপ্রিল ১৭৬৯)। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে, ইংরাজরা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ 'মাহে' অধিকার করেন। ইংরাজদের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে হায়দার আলি নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে জোট বেঁধে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে **দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৮০-১৭৮৪) আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে হায়দার আলির মৃত্যু হয়।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

হায়দার আলির পর তাঁর পুত্র **টিপু সুলতান** সিংহাসনে আরোহণ করেন। টিপু অবশ্য হায়দার আলির মৃত্যুর পর ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান হয় এবং উভয় পক্ষই পরস্পরের বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি নতুন আইন বৃটিশ পার্লামেণ্ট পাশ করে। এই আইনে নির্দেশ ছিল, কোম্পানী যেন ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার এবং ভারতীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হয়। কিন্তু এই নির্দেশ সঠিকভাবে পালিত হয়নি। মহীশূরের টিপু সুলতান ও ইংরাজদের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয়নি। দুই পক্ষই পরস্পরের মনোভাব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ পোষণ করত। এই পরিস্থিতিতে টিপু ইংরাজ-আশ্রিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলে গভর্নর-জেনারেল **লর্ড কর্নওয়ালিস** (১৭৮৬-১৭৯৩) নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেননি। ফলে **তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৯০-১৭৯২) শুরু হয়। পেশোয়া ও নিজাম ইংরাজ পক্ষে যোগদান করেন। দু'বছর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত হলে টিপু ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তিনি নিজের রাজ্যের অর্ধাংশ ও ৩৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হন। এই যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে মহীশূরের ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পায়।

লর্ড কর্নওয়ালিস ও তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০-১৭৯২)



লর্ড কর্নওয়ালিস

টিপুকে অনেক বৃটিশ ঐতিহাসিক ধর্মান্ধ বলেছেন। তিনি কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না, তবে একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে মারাঠা বর্গীরা সারদা

দেবীর মন্দির লুঠ করলে, টিপু সারদা দেবীর মূর্তি নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থদান করেন। তিনি নিয়মিত এই মন্দিরে এবং অন্যান্য মন্দিরেও উপঢৌকন দিতেন। প্রসিদ্ধ রঙ্গনাথজীর মন্দির তাঁর প্রাসাদের প্রায় একশত গজের মধ্যে ছিল।

অযোধ্যা (Awadh)ঃ সাদাত খাঁ বুরহান-উল-মুলক (Sadat Khan Burhan-ul-mulk) যিনি ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তিনিই সেখানে শাসন ক্ষমতা অধিকার করে স্ব-শাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বহুদিন ধরে বিদ্রোহী জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি অরাজকতা দমন করেন। বড় বড় জমিদারদের তাঁর আয়ত্বে আনেন এবং সরকারের অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধি করার সংস্থান করেন। বেশীর ভাগ পরাজিত জমিদার সরকারকে নিয়মিত কর বা খাজনা দেওয়ার অঙ্গীকারে স্বীকৃত হওয়ায় তারা জমিদারী ভোগ দখল করতে থাকে। তবে তারা সরকারের বাধ্যতা সব সময় মানত না। এতে নবাবের ক্ষমতা খর্ব হচ্ছিল।

সাদাত খাঁ

সাদাত খাঁ ১৭২৩ সালে নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং নিরপেক্ষ রাজস্ব নীতি বলবৎ করে তিনি কৃষকদের উপকার করেন এবং বড় বড় জমিদারদের অত্যাচার থেকেও তিনি কৃষকদের রক্ষা করেন। তাঁর অনেক সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিন্দু ছিল। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অবাধ্য গোঁড়া ধর্মীয় প্রধানদের দমন করেন। সাদাত খাঁর সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। সৈন্যবাহিনীর সেনারা ও সেনাপতিরা ভাল মাহিনা পেতেন। তিনি দক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সাদাত খাঁ সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা অধিকার করে কার্যতঃ অযোধ্যার স্বাধীন নবাব হন এবং অযোধ্যার সিংহাসনে বংশ পরম্পরায় তাঁর উত্তরাধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠা করেন। সাদাত খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো **সফদর জঙ্ (Saffar Jang)** অযোধ্যার সিংহাসনে বসেন। তাঁর পিতৃব্যের মত ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁকেও সাম্রাজ্যের উজীর (wazir) পদে নিয়োগ করা হয় এবং এলাহাবাদ রাজ্যটি তাঁকে দেওয়ানী দেওয়া হয়। সফদর জঙ্ মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে অযোধ্যা ও এলাহাবাদে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর রাজ্যকে মারাঠাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। তিনি রোহিলা ও বাঙ্গাশ পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

সফদর জঙ

তিনি পেশোয়ার সঙ্গে চুক্তি করেন। এই সন্ধির ফলে পেশোয়া আবদালির বিরুদ্ধে মুঘল সাম্রাজ্যকে সাহায্য করার এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে পাঠান বা রাজপুত বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। পেশোয়া শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি লঙ্ঘন করে দিল্লীর দরবারে সফদর জঙ্-এর শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেয়।

পেশোয়ার সঙ্গে চুক্তি

বহুদিন ধরে শান্তি বজায় থাকার জন্য এবং আমীর, ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঐশ্বর্য ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য অযোধ্যার রাজসভাকে ঘিরে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষ্ণৌ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মুর্শিদকুলি, সফদর জঙ্, নিজাম সকলেরই ব্যক্তিগত জীবন ও নৈতিক চরিত্র খুবই উচ্চমানের ছিল। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাব, সুলতান বা আমীর ওমরাহরা অসংযমী জীবন যাপন করতেন তা ঠিক নয়। কেবল মাত্র রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক আচার-আচরণ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁদের তঞ্চকতা, ষড়যন্ত্র ও অবিশ্বাসের আশ্রয় নিতে হত।

শিখজাতির অভ্যুত্থান

শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) দেশে বিদেশে বিভিন্ন স্থান পর্যটনের পর পাঞ্জাবের কর্তারপুরে স্থায়ীভাবে বাস করে ধর্মপ্রচার ও নতুন সম্প্রদায় গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। নানকের পরবর্তী গুরুদের সুযোগ্য নেতৃত্বে শিখধর্ম প্রসার লাভ করতে থাকে। নানক অঙ্গদকে পরবর্তী গুরুরূপে মনোনীত করে যান। এই মনোনয়নের বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, নানক যদি না নিজে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যেতেন, তাহলে রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের শিষ্যদের মত নানকের শিষ্যরাও হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যেত। কিন্তু অঙ্গদের মনোনয়ন সেই সম্ভাবনা দূর করে

গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-১৫৫২)

। গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-

ায়ে পরিণত করেন। অনেকে

১৫৭৪), রামদাস (১৫৭৪-১৫৮১)

পদে বৃত হন। গুরু অমরদাস শিখ-

শিখ জাতির স্বাতন্ত্র্য আরও সুস্পষ্ট হয়।

শিখধর্মের কেন্দ্র স্থাপন করেন।

পুত্র। এই সময় থেকে শিখ গুরুপদ বংশানুক্রমিক

অর্জুন শিখ সম্প্রদায়ের জন্য বাণী ও উপদেশ প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গুরুদের এবং নিজের কিছু উপদেশ সঙ্কলন করে গ্রন্থসাহেব প্রণয়ন করেন (১৬০৪)। হিন্দু ও মুসলমান

ও ধর্মপুরুষদের কিছু কিছু বাণীও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

া হয়। গুরু অর্জুনের সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল।

দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য মসন্দ প্রথার প্রবর্তন করে তিনি

মসন্দ প্রথার প্রচলন শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বনির্ভরতাবোধের উন্মেষে সহায়তা করেছিলেন।

শিখগুরু রামদাস আকবরের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর শিখ সম্প্রদায়ের প্রসার ও প্রভাব বৃদ্ধিতে সন্দিহান হন। বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে তিনি গুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন (১৬০৬)। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, শিখদের দমন করাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তিনি অর্জুনের পুত্র ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দকেও দীর্ঘকাল বন্দী করে রেখেছিলেন। কিন্তু শিখদের দমনের চেষ্টা সফল হয়নি। উপরন্তু জাহাঙ্গীরের নিষ্ঠুর কর্মের ফলে শিখ-মুঘল বৈরিতার সূচনা হয়।

অর্জুনের প্রাণদণ্ড (১৬০৬) ও মুঘল-শিখ বিরোধের সূচনা

রণকুশল ও নির্ভীক গুরু **হরগোবিন্দের** সময় থেকেই শান্তিপ্রিয় শিখ সম্প্রদায় সামরিক জাতিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে একটি ক্ষুদ্র শিখ সৈন্যদল সম্রাট শাহজাহানের বাহিনীকে অমৃতসরের কাছে পরাজিত করে। হরগোবিন্দের পরবর্তী দুই শিখগুরু ছিলেন **হররায়** (১৬৪৫-১৬৬১) এবং **হরকিষণ** (১৬৬১-১৬৬৪)। এই সময়ের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা না ঘটলেও শিখরা মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল।

গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫)

হরকিষণের মৃত্যুর পর নবম শিখগুরু হন **তেগবাহাদুর** (১৬৬৪-১৬৭৫)। মুঘল সম্রাট ঔরংজীবের অনুদার নীতি ও ধর্মান্ধতার প্রতিবাদ করায় তিনি বন্দী হন এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে বীরের মত ঘাতকের হাতে প্রাণ দেন (১৬৭৫)। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমগ্র শিখজাতির মধ্যে গভীর বেদনা ও ক্রোধের সৃষ্টি করে।

তেগবাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫)

তেগবাহাদুর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহকে দশম গুরুরূপে মনোনীত করে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ন'বছর মাত্র। **গুরু গোবিন্দ** (১৬৭৫-১৭০৮) শিখ ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিলেন। পিতার মৃত্যু ও পূর্বপুরুষদের ওপর নির্যাতন তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আক্রমণ ও অত্যাচার প্রতিরোধ করতে হলে সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে। ধর্মনৈতিক ও সামাজিক কলুষমুক্ত এক নতুন জাতি ও রাষ্ট্র তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত 'মুক্তি' নয়, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ছিল তাঁর ধর্মের লক্ষ্য। তিনি প্রচার করেছিলেন যে, আত্মবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মদানই হল সিদ্ধিলাভের সোপান।

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮)

নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যের বাস্তব রূপায়ণের জন্য গুরু গোবিন্দ **'খালসা'র** সৃষ্টি করেন। 'খালসা' শব্দের অর্থ পবিত্র। তিনি বলেছিলেন যে আর গুরুর প্রয়োজন নেই। খালসা অর্থাৎ সমগ্র শিখ সম্প্রদায় তাদের বীরত্ব, অস্ত্রবিদ্যা ও ভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে এক শক্তিশালী জাতিরূপে গড়ে উঠবে। শিখরা এখন থেকে নামে ও কাজে হবে 'সিংহ'। খালসায় সকলে সমান। জাতি, বর্ণ, উচ্চ নীচের কোন ভেদাভেদ থাকবে না। যোদ্ধৃ-সম্প্রদায় শিখদের প্রতীক হবে কেশ, কঙ্কতী (চিরুনি), কৃপাণ, কচ্ছ (খাটো পায়জামা) এবং কড় (লোহার বালা)। গুরু গোবিন্দ প্রচার করেছিলেন যে, ঈশ্বর 'অসিধ্বজ' অর্থাৎ তার পতাকা তরবারি-লাঞ্ছিত। এইভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে শিখদের তিনি এক সামরিক জাতিতে পরিণত করেন।

শিখধর্মাবলম্বীদের প্রতিক



গুরু গোবিন্দ সিংহ

পঞ্চনদীর তীরে গুরু গোবিন্দের নব মন্ত্রে এক নির্ভীক বীর জাতি গড়ে উঠেছিল। তাদের 'জয় গুরুজীর জয়, জয় খালসার জয়'— এই তূর্যনিনাদ মুঘল সম্রাট ঔরংজীবকে বিচলিত করেছিল। পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের রাজাদের সঙ্গে এবং মুঘল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শিখদের কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ঔরংজীব তখন দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়নি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্যে ঔরংজীব গুরু গোবিন্দকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। গুরু গোবিন্দ মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর চার পুত্র, আত্মীয়-বান্ধব ও বহু অনুগামীকে হারিয়ে ছিলেন। তিনি অসীম দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছিলেন, তবু শক্তিশালী শত্রুর কাছে নতি স্বীকারের চিন্তা পর্যন্ত কখনও করেননি।

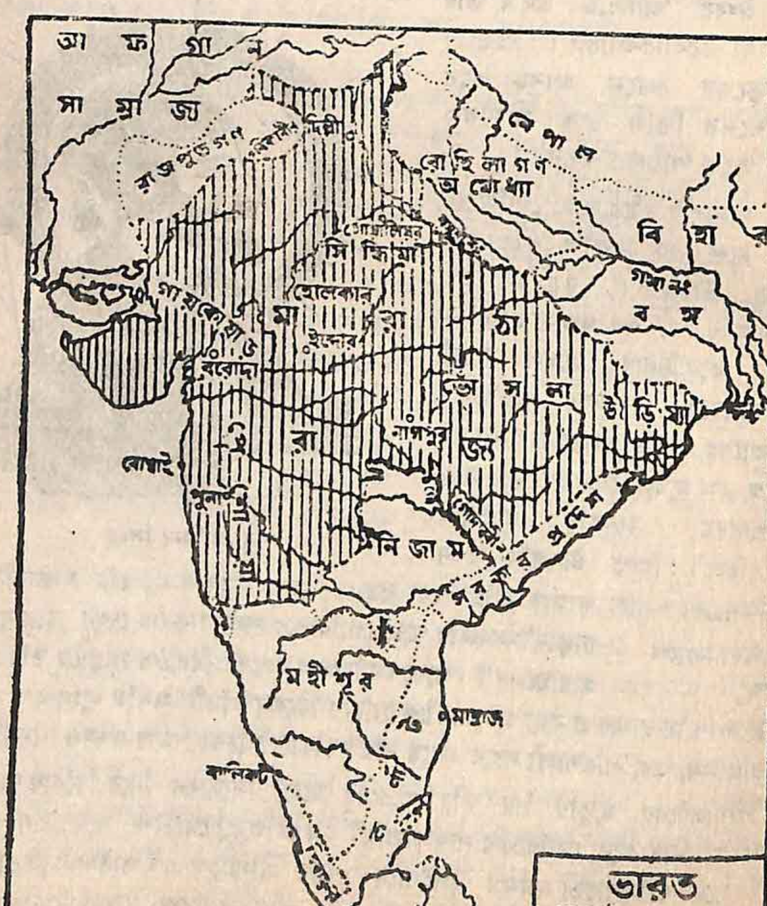
মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধলে বাহাদুর শাহ গুরু গোবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী হন। গুরু গোবিন্দ সম্মত হন এবং তাঁর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যান। সেইখানে ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে এক পাঠান আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। নিজের জীবদ্দশায় গুরু গোবিন্দ তাঁর মানস-লোকের শিখরাজ্য দেখে যেতে পারেননি। তাঁর স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন পরবর্তীকালে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ।

মারাঠাশক্তির উত্থান ও পতন—১৭৬১ সাল পর্যন্ত

ভারতবর্ষের পশ্চিমে সাতপুরা, সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্য পর্বতমালা এবং নর্মদা ও তাপ্তী নদীবেষ্টিত মহারাষ্ট্র দেশ এবং মারাঠাজাতির ইতিহাস সুপ্রাচীন ও গৌরবময়। প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত মহারাষ্ট্রের অসংখ্য পর্বতচূড়া স্বাভাবিক দুর্গের মত হওয়ায় বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের খুব সুবিধা ছিল। পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলের স্বাভাবিক প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষ হওয়ায় মারাঠীরা ছিল কঠোর পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল। প্রাচীন যুগে মহারাষ্ট্র

মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান



রেখাঙ্কিত অংশ মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত (১৭৬১)

অঞ্চল যথাক্রমে সাতবাহন, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও যাদব বংশের রাজ্যভুক্ত ছিল। আলাউদ্দীনের সময় এই অঞ্চলে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে বাহমনী পরে আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানদের রাজ্য ও রাজনীতিতে মারাঠাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কিন্তু মারাঠাজাতির প্রকৃত অভ্যুত্থান হয় সপ্তদশ শতকে শিবাজীর নেতৃত্বে।

প্রাচীন ইতিহাস

মারাঠা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান মারাঠা জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সহায়ক হয়। বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালা ও নর্মদা এবং তাপ্তী নদী বেষ্টিত মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিবেশ উত্তর ভারত থেকে আলাদা। উত্তর ভারতের সমতল ভূমি এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় মহারাষ্ট্রের অনুর্বর পাথুরে জমিতে চাষ আবাদ করে শস্য উৎপাদন করা খুবই পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য। সেজন্য মারাঠীরা পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। পর্বতবেষ্টিত দেশে থাকবার জন্য মারাঠীরা দৃঢ়চিত্ত, সবল ও আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রামী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

ভৌগোলিক পরিবেশ

মারাঠীদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য ছিলনা। সাম্য, ভ্রাতৃভাব ও স্বাধীনতা স্পৃহা মারাঠীদের ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল।

সাম্য ভাব

বাহমনী, আহম্মদনগর ও বিজাপুরের সুলতানদের রাজ্যগুলিতে মারাঠীরা সামরিক কাজকর্ম করত। এই সব রাজ্যগুলিতে সেনাবাহিনীতে কাজ করার সময় তারা সামরিক শিক্ষালাভ করেছিল। মারাঠীরা সামরিক বিভাগে কাজকর্মের সুযোগ পাওয়ার দরুন যুদ্ধ ও রাজনীতিতে পারদর্শী হয়ে উঠে।

সুলতানী রাজ্যে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক শিক্ষা

তাছাড়া একনাথ, তুকারাম, রামদাস, বামনপণ্ডিত প্রমুখ ধর্মসংস্কারকদের জীবন ও শিক্ষা মারাঠীদের মধ্যে সাম্যভাব, স্বদেশপ্রেম ও ঐক্যবোধের সঞ্চার করে। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে এই ঐক্যচেতনা আরও সুদৃঢ় হয়। সর্বোপরি শিবাজীর অসাধারণ সামরিক ও সংগঠনী প্রতিভা, বীরত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সপ্তদশ শতকে মারাঠী-শক্তিকে সুসংহত ও জাগ্রত করে।

ধর্ম ও মারাঠা সাহিত্যের প্রভাব

অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের মতে মারাঠাশক্তির অভ্যুত্থানের একটি সামাজিক কারণও আছে। মারাঠাভাষাভাষী অঞ্চলের ছোট এবং মাঝারি ওয়াতান্দররা (watander)

বড় বড় দেশমুখ ইত্যাদিদের বিরুদ্ধে শিবাজীর পতাকার তলায় সম্মিলিত হয়ে ঐক্য আন্দোলনকে সাহায্য করে। এছাড়া নিম্নশ্রেণীর কুনারি এবং কোলিরা শিবাজীকে সহায়তা করে মারাঠী জাতিতে পরিগণিত হওয়ার সুযোগ পায়। ধর্মসংস্কারকদের প্রচারিত সাম্য ভাবের সঙ্গে এটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

সতীশচন্দ্রের মতে মারাঠা আঞ্চলিক শক্তির অভ্যুত্থান ও ঐক্যবোধের মূল কারণ ঔরংজীবের ধর্মীয় নীতি নয়। এর সূচনা শাহজাহানের আমলেই হয়েছিল। জিজিয়া কর প্রবর্তনের (১৬৭৯ খ্রীঃ) আগেই শিবাজীর স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও অভিষেক হয়ে যায়।

১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০) পুণা জেলার অন্তর্গত শিবনের পার্বত্য দুর্গে শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা শাহজী ছিলেন আহম্মদনগরের সুলতানের একজন সেনানায়ক ও জায়গীরদার। মাতা জীজাবাঈ-এর স্নেহ-যত্নে ও পিতার বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারী দাদাজী কোণ্ডদেবের অভিভাবকত্বে শিবাজী বড় হয়েছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ কিশোর শিবাজীর স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কৃতসংকল্প শিবাজী পার্বত্য মাওলিজাতীয় কৃষকদের নিয়ে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর সুলতানী রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথমে তোরণা দুর্গ জয় (১৬৪৬) করেন ও পরে রায়গড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এরপর তিনি বিজাপুর রাজ্যের আরও কিছু অঞ্চল জয় করলে বিজাপুরের ক্রুদ্ধ ও শঙ্কিত সুলতান শিবাজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করেন। বিজাপুর রাজ্য আর আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিবাজী পিতাকে মুক্ত করেন। কিন্তু সাময়িক বিরামের পর শিবাজী আবার রাজ্যজয়ে উদ্যোগী হন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি পুরন্দর ও জাউলীর দুর্গ, রায়গড় এবং কোঙ্কনের উত্তরাংশ জয় করেন।

সৈন্যদল গঠন ও তোরণা দুর্গ জয় (১৬৪৬)

পুরন্দর ও জাউলীর দুর্গ জয় ও অন্যান্য সাফল্য

শিবাজী যখন নিজের রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট সেই সময় দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদার ঔরংজীব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। শিবাজী বিজাপুরের পক্ষ নিয়ে মুঘলদের আক্রমণ করায় ঔরংজীব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করায় ঔরংজীব শিবাজীকে সম্পূর্ণরূপে দমন করার সুযোগ পাননি। বিজাপুরের সুলতানও শিবাজীর রাজ্য ও ক্ষমতাবৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন। মুঘল আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবার পর তিনি শিবাজীকে দমন

ঔরংজীবের সঙ্গে বিরোধের সূচনা

বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষ

করার উদ্দেশ্যে সেনাপতি **আফজল খাঁকে** প্রেরণ করেন (১৬৫৯)। শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় নেন। শেষ পর্যন্ত দুজনের সাক্ষাৎকারের সময় শিবাজী বাঘনখের দ্বারা কেমন করে আফজলখাঁকে নিহত করেছিলেন সে বিতর্কমূলক কাহিনী সুবিদিত। সেনাপতির শোচনীয় মৃত্যুতে বীজাপুরবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে শিবাজী দক্ষিণ কোঙ্কন ও কোলহাপুর অধিকার করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন।

আফজল খাঁর মৃত্যু (১৬৫৯) ও বিজাপুর বাহিনীর পরাজয়

দুঃসাহসী শিবাজীর শত্রুতার কথা ঔরংজীব বিস্মৃত হননি। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার অল্পকাল পরেই তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার **শায়েস্তা খাঁকে** শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খাঁ প্রথম দিকে কিছু সাফল্যলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত সুচতুর শিবাজীর কাছে পরাজিত হন (১৬৬৩)। পরের বছর পশ্চিম ভারতের সমৃদ্ধিশালী বন্দর সুরাট লুণ্ঠন করে শিবাজী প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। তখন ঔরংজীব দুজন সুযোগ্য মুঘল সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে শিবাজীকে দমন করার দায়িত্ব দেন। জয়সিংহের কূটবুদ্ধি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে শিবাজী মুঘলদের সঙ্গে **পুরন্দরের সন্ধি** (১৬৬৫) করতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্তানুসারে শিবাজী মুঘল সম্রাটকে কয়েকটি দুর্গ, কিছু অঞ্চল ও বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হন।

মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ

শায়েস্তা খাঁর পরাজয় (১৬৬৩)

কিছুকাল পরে জয়সিংহের পরামর্শে শিবাজী আগ্রায় ঔরংজীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু রাজদরবারে উপযুক্ত মর্যাদা না পাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে ঔরংজীব শিবাজীকে কারারুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত কৌশলে কারাগার থেকে পলায়ন করে শিবাজী স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে ঔরংজীব তাঁকে 'রাজা' বলে স্বীকৃতি দিলেও মুঘল-মারাঠা শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অতঃপর শিবাজী তাঁর হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার এবং দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করেন। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গোব্রাহ্মণপালক' উপাধি গ্রহণ করেন এবং রায়গড়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি জিঞ্জি, ভেলোর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার করেন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের পুনরারম্ভ

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক (১৬৭৪)

মৃত্যু (১৬৮০)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শিবাজী শাসন ও সামরিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের নিয়ামক নিজে হলেও **'অষ্টপ্রধান'** নামে খ্যাত আট জন মন্ত্রীর সাহায্যে শিবাজী রাজ্য পরিচালনা করতেন। এই আট জনের মধ্যে প্রথম ছিলেন **'পেশোয়া'** বা প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তীকালে

শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা

পেশোয়াই মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠেন। শিবাজী-প্রবর্তিত প্রাদেশিক শাসন ও রাজস্বব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত। মারাঠা রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শিবাজী **চৌথ** (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ) এবং **সরদেশমুখী** (রাজস্বের এক-দশমাংশ) নামে দুই প্রকার কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

সামরিক সংগঠন

সামরিক সংগঠনে শিবাজী মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুরক্ষিত পার্বত্য দুর্গগুলি ছিল মারাঠা সামরিক শক্তির প্রধান কেন্দ্র। শিবাজীর সৈন্যবাহিনী 'পদাতিক' ও 'অশ্বারোহী' এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। **'বারগীর'** ও **'শিলাদার'** নামে দুই শ্রেণীর অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। 'বারগীর'রা অশ্ব, অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদ পেত সরকার থেকে। 'শিলাদার'রা নিজেরাই এই সব উপকরণ সংগ্রহ করতো। শিবাজী 'বারগীর'দের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেছিলেন। মারাঠা নৌবহর সৃষ্টি করে শিবাজী তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

বারগীর ও শিলাদার

নৌবাহিনী

শিবাজীর সময় এই নৌবাহিনী বিশেষ শক্তিশালী না হলেও পরবর্তীকালে আংগ্রিয়া সর্দারের নেতৃত্বে এই নৌবাহিনীই ইংরাজ, পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের জলপথে বাধা দিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মুঘল সম্রাটরা কিন্তু সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নৌবাহিনীর অসীম গুরুত্ব তেমন উপলব্ধি করতে পারেননি।

শিবাজীর চরিত্র

দুর্জয় সাহস, অসীম মনোবল, স্থির প্রত্যয় এবং অসাধারণ সামরিক ও সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী শিবাজী মানুষ হিসাবেও মহান ছিলেন। সারা জীবন মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও তিনি কখনও ইসলাম ধর্মের অমর্যাদা করেননি। পরধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর উদার মনোভাব সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার ছিল তাঁর চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য। শিবাজীর আদর্শ ও দেশপ্রেম আধুনিক যুগে বহু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

শম্ভুজী (১৬৮০-১৬৮৯)

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী **শম্ভুজী** (১৬৮০-১৬৮৯) ঔরংজীবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দেওয়ায় মুঘল সম্রাট স্বয়ং মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। পিতার মত সুযোগ্য ও সচ্চরিত্র না হলেও শম্ভুজী নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মুঘলদের হাতে বন্দী ও নিহত হন (১৬৮৯)। তাঁর শিশুপুত্র শাহুকে মুঘলরা বন্দী করে রাখে এবং রাজধানী রায়গড় সমেত বহু মারাঠা দুর্গ তারা অধিকার করে নেয়। মহারাষ্ট্রের এই চরম সংকটমুহূর্তে শিবাজীর

দ্বিতীয় পুত্র **রাজারাম** (১৬৮৯-১৭০০) জিঞ্জি দুর্গে আশ্রয় নিয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই সময় সান্তাজী ঘোরপাড়ে ও ধনজী যাদব নামে দুজন মারাঠা সেনাপতি বারবার আক্রমণ করে মুঘলবাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। শেষপর্যন্ত জিঞ্জি, সাতারা ও অন্যান্য দুর্গ জয় করেও ঔরংজীব মারাঠাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা ও মনোবল জয় করতে পারেননি।

রাজারাম
(১৬৮৯-১৭০০)

রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী **তারাবাঈ** নাবালক পুত্র **তৃতীয় শিবাজীকে** সিংহাসনে স্থাপন করে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। মারাঠা প্রতি-আক্রমণ কেবল মাত্র দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত গুজরাট, মালব, বেরার প্রভৃতি অঞ্চল আক্রমণ ও লুঠ করে। শিবাজী মুঘলদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন প্রতিকূল অবস্থা ও বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁর উত্তরাধিকারীরা তা অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রায় অর্ধশত বছর ধরে অকাতরে অর্থক্ষয় ও লোকক্ষয় করেও ঔরংজীব মারাঠাশক্তিকে দমন করতে পারেননি।

তৃতীয় শিবাজী
(১৭০০-১৭১২)

মারাঠা দমনে
ঔরংজীবের ব্যর্থতা

ঔরংজীবের মৃত্যুর পর শম্ভুজীর পুত্র শাহু দীর্ঘকালের বন্দীদশা হতে মুক্তি পান। এই মুক্তিদানের পিছনে মুঘলদের আসল উদ্দেশ্য ছিল মারাঠাদের মধ্যে বিভেদ ও অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করা। তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। শাহু স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলে তারাবাঈ তাঁর দাবী অস্বীকার করেন। এই গৃহবিবাদের পরিণতিরূপে কোলহাপুরে তারাবাঈ-এর অভিভাবকত্বে **তৃতীয় শিবাজী** এবং সাতারায় শাহু দুটি স্বতন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তৃতীয় শিবাজীর মৃত্যুর পর (১৭১২) তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা **দ্বিতীয় শম্ভুজী** (১৭১২-১৭৬০) কোলহাপুরের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি লুপ্ত হলে সমগ্র মহারাষ্ট্রে পেশোয়ারাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মারাঠা রাজ্যে
গৃহবিবাদ

সাতারায় **শাহু** বা **দ্বিতীয় শিবাজীর** (১৭০৮-১৭৪৯) অধিকার ও কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার মূলে ছিল বালাজী বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ কর্মচারীর অসাধারণ যোগ্যতা ও কূটবুদ্ধি। তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে শাহু তাঁকে পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন (নভেম্বর, ১৭১৩)। বালাজী বিশ্বনাথ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রথম বাজীরাও নিজেদের বুদ্ধি ও যোগ্যতার বলে 'পেশোয়া'কেই মারাঠা রাজ্যের প্রকৃত শাসক ও ক্ষমতার অধিকারী করে তোলেন। এইভাবে **মহারাষ্ট্রে পেশোয়া-শাসন** বা **পেশোয়াতন্ত্রের** প্রতিষ্ঠা হয়। পেশোয়ারা পুণা থেকে মারাঠা রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং মারাঠা নৃপতি বা 'ছত্রপতি' প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়ে সাতারার দুর্গে বাস করতে থাকেন।

পেশোয়াতন্ত্রের
প্রতিষ্ঠা

পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০)

পেশোয়া নিযুক্ত হওয়ার অল্পকালের মধ্যে **বালাজী বিশ্বনাথ** রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে মুঘল সম্রাট ফররুখ্‌সিয়ারের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। সন্ধির সর্তানুসারে শাহু দাক্ষিণাত্যের বেরার, খান্দেশ, ঔরঙ্গাবাদ, বিদর, হায়দ্রাবাদ ও বিজাপুর এই ছ'টি সুবার চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করার অধিকার পান। তাছাড়া একদা শিবাজী-শাসিত যে সব অঞ্চল মুঘলরা জয় করে নিয়েছিল সেইগুলি শাহু ফিরে পেলেন। বিনিময়ে মারাঠারাজ মুঘল আনুগত্য স্বীকার করেন। এই সন্ধির ফলে শিবাজীর স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের আদর্শ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও দাক্ষিণাত্যের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মারাঠাদের প্রভাব ও গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

মুঘল সম্রাটের সঙ্গে চুক্তি : গুরুত্ব

প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০)

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **প্রথম বাজীরাও** (১৭২০-১৭৪০) পেশোয়া নিযুক্ত হন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সামরিক প্রতিভার অধিকারী প্রথম বাজীরাও-এর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে 'হিন্দুপাদশাহী' (সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জয়পুরের দ্বিতীয় জয়সিংহ বুন্দেলরাজ ছত্রসাল প্রভৃতি রাজাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধও তাঁর পথ সুগম করেছিল। তাঁর নেতৃত্বে মারাঠাবাহিনী মালব ও গুজরাট জয় করে। তাঁর ক্ষমতা, রাজ্যবিস্তার এবং দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত অগ্রগতিতে ভীত হয়ে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ হায়দ্রাবাদের নিজামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভূপালের কাছে এক যুদ্ধে (১৭৩৮) নিজামকে পরাজিত করে বাজীরাও নর্মদা থেকে চম্বল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় মারাঠা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। পোর্তুগীজদের কাছ থেকে সলসেট ও বেসিন অধিকার (১৭৩৯) তাঁর আর এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। পারস্য সম্রাট নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি যখন হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যস্ত, সেই সময় মাত্র ৪২ বছর বয়সে প্রথম বাজীরাও এর মৃত্যু হয় (১৭৪০)।

রাজ্যবিস্তার

মারাঠা সামন্তরাজ্যের উৎপত্তি

সুনিপুণ সেনানায়ক এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্যতম স্থাপয়িতারূপে প্রথম বাজীরাও প্রসিদ্ধ। চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ইত্যাদি নানাবিধ গুণের জন্যও তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার ব্যাপক প্রসারের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে পরবর্তী কালে যে অনৈক্য এবং অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়েছিল তার সূচনাও হয়েছিল প্রথম বাজীরাও-এর সময়কালে। শক্তিশালী মারাঠা সেনানায়করা এক-একটি অঞ্চলে নিজ নিজ রাজ্য গড়ে তোলেন। এইভাবে নাগপুরে **ভোঁসলা রাজ্য**, গোয়ালিয়রে **সিন্ধিয়া রাজ্য**, বরোদায় **গায়কবাড় রাজ্য**, ইন্দোরে **হোলকার**

রাজ্য এবং মালবের অন্তর্গত **পবার রাজ্য** গড়ে ওঠে। সব কয়টি মারাঠা রাজ্যকে ঐতিহাসিকেরা **মারাঠা রাজ্যসঙ্ঘ** (Maratha Confederacy) নামে অভিহিত করেছেন। নামেমাত্র পেশোয়াকে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রধানরূপে স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মারাঠা রাজ ছিল স্বাধীন। মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে এই বিভাগ ও পারস্পরিক বিরোধ ভবিষ্যতে ইংরাজদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-১৭৬১)

প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **বালাজী বাজীরাও** (১৭৪০-১৭৬১) পেশোয়া নিযুক্ত হন। পিতার মত যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল না। মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ভাড়াটিয়া অ-মারাঠা সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি মারাঠা সৈন্যবাহিনীর জাতীয় চরিত্র নষ্ট করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শও বর্জন করেছিলেন। তাঁর সময় মারাঠা সৈন্যরা হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে সকলের ওপর জোরজুলুম লুঠতরাজ করে অর্থ সংগ্রহ করায় রাজপুত এবং অন্যান্য হিন্দু নেতাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হারিয়েছিল। এই **অপরিণামদর্শী নীতির ফলে ভবিষ্যতে মারাঠারা দেশী বা বিদেশী কোন শত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দু জাতির নেতৃত্বের মর্যাদা ও ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হয়।**

অদূরদর্শী নীতি

অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সত্ত্বেও বালাজী বাজীরাও-এর সময় মারাঠা সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি হয়েছিল। মহীশূরের একাংশে এবং কর্ণাটকে মারাঠা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে উদ্‌গীরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যের কিছু অঞ্চল মারাঠাদের দিতে বাধ্য হন। বেরারের মারাঠা নেতা ভোঁসলা বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে চৌথ দিতে বাধ্য করেন এবং উড়িষ্যা অধিকার করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা ও বাদশাহের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে মারাঠারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবিস্তার

আভ্যন্তরীণ সংকটের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য যখন বিপর্যস্ত সেই সময় আফগান অধিপতি আহম্মদ শাহ দুরানী বারংবার ভারত আক্রমণ করে সিন্ধু, কাশ্মীর ও পাঞ্জাব জয় করেন এবং ঐ অঞ্চলে তাঁর পুত্র তিমুরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু আহম্মদ শাহের অনুপস্থিতির সুযোগে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-এর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও পাঞ্জাব অধিকার করে নেন (১৭৫৮)। এর ফলে আফগান-মারাঠা সংঘর্ষ ঘনিয়ে আসে। পরের বছরই পাঞ্জাব পুনরধিকার করে আহম্মদ শাহ দুরানী মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং রোহিলা নায়ক নজীর খাঁ যোগদান করায় আফগান শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে মারাঠাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ রাজপুতেরা নীরব

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)

দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। শিখরাও নিরপেক্ষ থাকে। আহম্মদ শাহের রণনীতিও ছিল উন্নততর। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের পরিণতিরূপে **পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে** মারাঠাবাহিনী আফগানদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় (১৪ জানুয়ারী, ১৭৬১)। এই যুদ্ধে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-এর পুত্র বিশ্বাসরাও ও সেনাপতি সদাশিবরাও নিহত হন। তাছাড়া বহু সহস্র মারাঠা সৈন্য নিহত বা বন্দী হয়। এই নিদারুণ বিপর্যয়ের অল্পকালের মধ্যেই পেশোয়া বালাজী বাজীরাও মারা যান।

মারাঠা বিপর্যয়

প্রথম ও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের মত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধও ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথম পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) হিমুকে পরাজিত করে আকবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত ও ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করেছিলেন। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে পেশোয়ার নেতৃত্বে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। এই যুদ্ধে বিজয়ী আহম্মদ শাহ আবদালী ভারতবর্ষে স্থায়ী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এমন কি পাঞ্জাবে পর্যন্ত আফগানরা নবজাগ্রত শিখজাতিকে দমন করতে পারেননি। কিন্তু তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের শোচনীয় বিপর্যয়ের ফলে মারাঠাদের মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পেশোয়া প্রথম মাধবরাও এবং মহাদাজী সিন্ধিয়া উত্তর ভারতে মারাঠা প্রাধান্য বহুলাংশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেও মারাঠা সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে পারেননি। মারাঠাদের দুর্বলতা মহীশূর রাজ্যে হায়দার আলির এবং কালক্রমে সারা ভারতে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তারের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **প্রথম মাধবরাও** পেশোয়া হন। প্রায় কিশোর বয়সে এবং অত্যন্ত সংকটজনক কালে গুরুদায়িত্বভার বহন করলেও তিনি তাঁর শাসনকালে (১৭৬১-১৭৭২) অসাধারণ বুদ্ধি ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে মারাঠাদের হৃত প্রাধান্য তিনি কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে সফল হয়েছিলেন।

পেশোয়া প্রথম মাধবরাও (১৭৬১-১৭৭২)

তৃতীয় অধ্যায় | ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রসার ও ইঙ্গ ফরাসী দ্বন্দ্ব

অতি প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশগুলির সামুদ্রিক বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। মধ্য যুগে ইউরোপীয় বণিকদের প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ইতালীয় বন্দরের বণিকরা আরব বণিকদের কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে ইউরোপের নানা দেশে রপ্তানী করতে থাকে। আরব ও ইতালীয় বণিকদের সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ইউরোপীয় বণিকরা ভারত এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু প্রাচ্যে যাতায়াতের জলপথ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি।

ভূমিকা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে অভূতপূর্ব নবজাগরণ দেখা দেয় তার এক প্রধান লক্ষণ ছিল বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে কৌতূহল এবং নতুন নতুন দেশ ও জলপথ আবিষ্কারে আগ্রহ। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের আবিষ্কার, উন্নত ধরনের ম্যাপ ও চার্টের ব্যবহার, সুদৃঢ় ও বৃহদাকার জাহাজ নির্মাণ এবং ভূগোল, অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা ভৌগোলিক আবিষ্কারের সহায়তা করে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূচনা

ইউরোপে প্রাচ্যের মশলার চাহিদা ছিল। শীতকালে লবণ এবং গোলমরিচ সহযোগে মাংসই ছিল ইউরোপীয়দের প্রধান খাদ্য। কিন্তু কনস্ট্যান্টিনোপল জয় (১৪৫৩) করার পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পুরাতন বাণিজ্য সড়কগুলি তুর্কীদের অধিকারে আসে। তাছাড়া ভেনিস (Venice) এবং জেনোয়ার (Genoa) বণিকরা সেই সময় ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে একচেটিয়া বাণিজ্য করত। সুতরাং তারা পশ্চিম ইউরোপের জাতিদের, বিশেষ করে স্পেন এবং পোর্তুগালকে এই সব পুরাতন সড়কগুলি দিয়ে এশিয়ার সঙ্গে তাদের বাণিজ্যে ভাগ বসাতে বাধা দিত। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের জাতিগুলির কাছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সম্পদ এত লোভনীয় ছিল যে তাদের পক্ষে এই দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক তুলে দেওয়া সহজ ছিল না।

ভেনিস ও জেনোয়ার একচেটিয়া ব্যবসা

পশ্চিম ইউরোপের জাতি সমূহের মধ্যে ব্যবসা ও বাণিজ্যের মাধ্যম ছিল সোনা

ভারতের স্বর্ণ সম্পদের আকর্ষণ

কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে সোনার স্বল্পতা ছিল। সেজন্য ভারতের স্বর্ণ সম্পদ পশ্চিম ইউরোপের জাতিগুলির কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যাতে সোনার অভাবে তাদের দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি না হয়, সেজন্য তারা বাণিজ্য করে ভারত থেকে সোনা আমদানী করতে বিশেষ আগ্রহী ছিল। পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি এবং সেখানকার বণিকরা **ভারত** এবং **ইন্দোনিয়ার** মশলা দ্বীপগুলি বা **পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের** সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য নতুন এবং নিরাপদ সমুদ্র পথের সন্ধান করতে লাগল। তারা তুর্কীদের বাধা প্রতিহত এবং আরব ও ভেনিসীয় বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ করে ভারতের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়।

ভারতে পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন

১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগীজ নাবিক **বার্থোলোমিও দিয়াজ** উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তোলেন। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে **ভাস্কো দা গামা** ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে উপনীত হন। দু'বছর পরে **কাব্রাল** এইখানে একটি পোর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। কিছুকালের মধ্যে পশ্চিম উপকূলের গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন, বাংলাদেশের হুগলী প্রভৃতি স্থানে পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়। পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং প্রতিপত্তি বিস্তারের মূলে ছিলেন ভারতে পোর্তুগীজ-অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনকর্তা **আলবুকার্ক** (১৫০৯-১৫১৫)।

পোর্তুগীজদের ব্যর্থতার কারণ

পোর্তুগীজ প্রাধান্য কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভারতীয়দের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা, বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার, স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি দুর্ব্যবহার, কুশাসন, অদূরদর্শিতা, জলদস্যুতার প্রবণতা প্রভৃতি কারণের সমাবেশে পোর্তুগীজদের পতন হয়।

স্বৈরতান্ত্রিক পোর্তুগাল পতনোন্মুখ অবস্থায় জাহাজী শিল্পের কোনো উন্নতি করতে পারেনি। অপরাপর ইউরোপীয় রাজ্যগুলির চেয়ে তারা পেছিয়ে পড়েছিল।

ইংল্যান্ড হলান্ড ও ফ্রান্স

এদিকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগের শেষ দিকে ইংল্যান্ড, হলান্ড এবং ফ্রান্স ব্যবসা, বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের নৌশক্তির ও যথেষ্ট উন্নতি হয়। তারা স্পেন এবং পোর্তুগালের সারা পৃথিবীতে একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা দান করে। অবশেষে পোর্তুগাল ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের অধিকারে আসে। ইংরাজরা ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের রণতরী **(আর্মাডা)**কে পরাজিত করে।

রণতরী আর্মাডা

সুতরাং এরপর ইংরাজ এবং ওলন্দাজরা উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Goodhope) হয়ে সমুদ্র পথটি ব্যবহার করতে সক্ষম হয় এবং

ইংরাজ ও ওলন্দাজদের উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে সমুদ্র পথের ব্যবহার প্রাচ্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা করে।

ওলন্দাজ বণিকদের উদ্যম

পোর্তুগীজরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত তখন অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরাও নিশ্চেষ্ট ছিল না। ১৬০২ খ্রীস্টাব্দে একটি **ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী** প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা ভারতবর্ষ, দূরপ্রাচ্য ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা করে। ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাণিজ্যকুঠিগুলির মধ্যে পশ্চিম উপকূলে সুরাট, দক্ষিণে নেগাপত্তম এবং বাংলায় চুঁচুড়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রতি ওলন্দাজদের আকর্ষণ ছিল বেশী। ওলন্দাজরা ভারতীয়দের নির্মমভাবে শোষণ করে।

ইংরাজ বণিকদের আগমন

১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী** নামে এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই কোম্পানীটি রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। সুরাটে একটি ইংরাজ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভের জন্য ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কয়েক বছর পর স্যার টমাস রো ইংলণ্ডের রাজদূতরূপে মুঘল দরবারে উপস্থিত হন। কিছুকালের মধ্যে পশ্চিমে সুরাট (১৬১৩), দক্ষিণ-পূর্বে মসুলিপত্তন, দক্ষিণে মাদ্রাজ (১৬৩৯) এবং পূর্ব ভারতে হুগলী (১৬৫১), হরিহরপুর, বালেশ্বর, ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ-কুঠি নির্মিত হয়। চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজের শাসনভারও ইংরাজরা লাভ করেছিল। এই বাণিজ্যকেন্দ্রটি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তারা ফোর্ট সেন্ট জর্জ দুর্গ নির্মাণ করে। ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস্ বিবাহের যৌতুকরূপে পোর্তুগালের কাছ থেকে বোম্বাই দ্বীপটি লাভ করেন। তিনি এই দ্বীপটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নামমাত্র মূল্যে ইজারা দেন (১৬৬৮)।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কুঠি নির্মাণ

মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজয়

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুল্ক আদায় সংক্রান্ত মতভেদকে কেন্দ্র করে মুঘল সরকারের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ দেখা দেয়। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইংরাজরা সম্রাট ঔরংজীবের কাছে নতি স্বীকার করলে তিনি তাদের তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করেন। ইংরাজ কুঠিগুলির প্রধান জব চার্ণক বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে (আগস্ট, ১৬৯০) গঙ্গাতীরে সুতানুটি,

কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলিকাতা নগরীর পত্তন করেন। কয়েক বছর পর এইখানে ইংরাজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মত কলিকাতাও একজন ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিলের শাসনাধীন হওয়ায় 'প্রেসিডেন্সি' নামে অভিহিত হয়। এইভাবে ভারতবর্ষে তিনটি ইংরাজ প্রেসিডেন্সি স্থাপিত হয়।

কলিকাতার ইংরাজ প্রেসিডেন্সির প্রতিষ্ঠা

ফরাসী বণিক

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা : ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে সুরাট (১৬৬৮), মসুলিপত্তন (১৬৬৯), পণ্ডিচেরী (১৬৭৪) এবং চন্দননগরে (১৬৮৮) ফরাসীরা বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করে। আরও কিছুকাল পরে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে মাহে এবং পূর্ব উপকূলে কারিকল ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের দ্বন্দ্বে কালক্রমে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের পরাজয় হয় এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। দুই দেশের মধ্যে এই বিরোধ ইউরোপের রাজনৈতিক আবর্তনের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৪৬-১৭৪৮) : ভারতবর্ষে **ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান ক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্য।** মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতাপ্রসূত রাজনৈতিক অরাজকতা এই রাজ্যটিতেও প্রবেশ করেছিল। তখন কর্ণাটকের নবাব ছিলেন **আনোয়ারউদ্দীন**। ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি এই রাজ্যের শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর বহু শত্রু ছিল এবং সামগ্রিকভাবে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে ইউরোপে **অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ** (১৭৪০-১৭৪৮) শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দুই বিবদমান পক্ষে যোগ দেওয়ায় ভারতবর্ষেও ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সংঘর্ষ নিবারণের চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ভারতেও এই যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। প্রথমে ফরাসীরা কিছু অসুবিধার মধ্যে পড়লেও মরিশাসের শাসনকর্তা **লা বুরদনে** একটি নৌবাহিনীর সাহায্যে মাদ্রাজ অধিকার করেন (১৭৪৬)। বিপন্ন হয়ে ইংরাজরা নবাব আনোয়ারউদ্দীনের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন, কেননা তাঁর রাজ্যের মধ্যেই দু'পক্ষের যুদ্ধ সুরু হয়েছিল। তখন পণ্ডিচেরীর ফরাসী শাসনকর্তা **ডুপ্লে** নবাবকে জানালেন যে মাদ্রাজ তাঁরা তাঁকেই প্রদান করবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য মনে না করে আনোয়ারউদ্দীন ফরাসীদের যুদ্ধ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ তারা অমান্য করলে নবাব ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু মাদ্রাজের

কর্ণাটক রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ

ক্রমবর্ধমান ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে কর্ণাটকে প্রতিক্রিয়া

কাছে এক যুদ্ধে মাত্র কয়েকশত ফরাসী সৈন্য দশ সহস্রাধিক সৈন্যের নবাববাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। অল্পকালের মধ্যে ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হওয়ায় ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান হয়। ফরাসীরা ইংরাজদের মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করে।

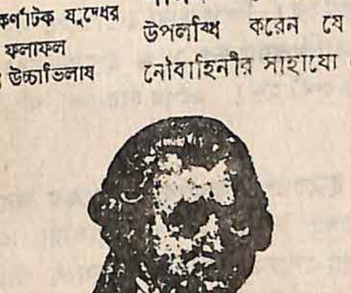
প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ইংরাজ ও ফরাসীদের অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তবে পরোক্ষ ফল হিসাবে ফরাসীরা ভারতে ঔপনিবেশিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই অভিজ্ঞতাগুলির সুযোগ ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় ইংরাজরাও গ্রহণ করেছিলেন।



দুপ্লে

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের ফলাফল
দুপ্লের উচ্চাভিলাষ

দুপ্লের স্বপ্ন ছিল ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের কাছে নবাববাহিনীর শোচনীয় পরাজয় তাঁকে আরও উৎসাহিত করে। তিনি ভারতের **সামরিক** এবং **শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতা** বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে আরও বেশীসংখ্যক সৈন্য ও শক্তিশালী নৌবাহিনীর সাহায্যে এবং **রাজনৈতিক অরাজকতার** সুযোগে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হলেও তিনি ভবিষ্যৎ সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।



রবার্ট ক্লাইভ

দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৫১-১৭৫৪): দুপ্লেকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। খুব শীঘ্রই হায়দ্রাবাদ এবং কর্ণাটক রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে প্রবল অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। সুযোগ বুঝে দুপ্লে দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে ফরাসী প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যোগী হন। ঘটনাচক্রে পরিস্থিতি ফরাসীদের অনুকূলে গেলে এবং দুই রাজ্যেই তাদের সমর্থিত প্রার্থী ক্ষমতা লাভ করলে ইংরাজরা উদ্বিগ্ন হয়ে বিরোধী প্রার্থীদের পক্ষে যোগ দেয়। এর ফলে দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৫১-১৭৫৪) সুরু হয়। এই সময় ইংরাজ পক্ষের

অধিনায়ক ছিলেন **রবার্ট ক্লাইভ।** অসীম সাহস, বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ক্লাইভ অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও রাজধানী আর্কট অধিকার করেন এবং ত্রিচিনোপল্লীতে ফরাসী এবং ফরাসী মিত্রবাহিনীকে পরাজিত করেন। কর্ণাটক রাজ্যে ফরাসী প্রাধান্য লুপ্ত এবং ইংরাজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও দু'বছর ব্যর্থ যুদ্ধের পর ফরাসীরা ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয় (১৭৫৪)। হতাশ ও পদচ্যুত হয়ে দুপ্লে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের অবসানের দু'বছরের মধ্যে **সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ** (১৭৫৬-১৭৬৩) সুরু হলে ভারতবর্ষেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তৃতীয় বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩): এই তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের (১৭৫৬-১৭৬৩) সূচনাতেই ইংরাজরা চন্দননগর অধিকার করে নেয় (মার্চ, ১৭৫৭)। এর কয়েক মাস পরেই পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করায় বাংলাদেশে ইংরাজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সরকার তাদের সুদক্ষ সেনানায়ক **লালীকে** দক্ষিণ ভারতে প্রেরণ করে। প্রাথমিক সাফল্যের পর ফরাসীরা বিপর্যস্ত হলে লালী ফরাসী সেনাপতি **বুসিকে** হায়দ্রাবাদ থেকে আসতে নির্দেশ দেন। এর ফলে নিজামের রাজ্যে ফরাসী প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়। কিন্তু তারা ইংরাজদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে **ওয়ান্দিওয়াশের যুদ্ধে** ইংরাজ সেনাপতি স্যার আয়ার কূটের কাছে লালী পরাজিত ও বন্দী হন। এরপর ইংরাজরা পণ্ডিচেরী অধিকার করে।

ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের চূড়ান্ত ফল

১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ইউরোপে **সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হলে** ভারতবর্ষেও যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ফরাসীরা তাদের অধিকৃত স্থানগুলি ফিরে পেলেও ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরকালের মত বিলীন হয়। অন্য দিকে প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ইংরাজরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ আরও সুগম করে।

ফরাসী ব্যর্থতার কারণ

ফরাসী সরকারের কাছ থেকে সময় ও প্রয়োজনমত উৎসাহ এবং সাহায্যের অভাব, ভারতে ইংরাজ কোম্পানীর সাংগঠনিক শক্তি ও আর্থিক সমৃদ্ধি, ইংরাজ নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রথমে দুপ্লে ও পরে লালীর কূটনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনার ত্রুটি, ক্লাইভের সুযোগ্য নেতৃত্ব, বাংলাদেশে ইংরাজদের সাফল্য, ইউরোপে সাত বৎসরের যুদ্ধ ও আমেরিকার রণক্ষেত্রে ফ্রান্সের পরাজয় ইত্যাদির ফলে ভারতবর্ষে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীদের পরাজয় ঘটেছিল।

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইংরাজরা কিছু মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছিল। সেগুলি হল ঃ

প্রথমতঃ ভারতে জাতীয় ঐক্যবোধের অভাব ও দেশীয় নৃপতিদের নিজেদের মধ্যে বিবাদের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমী সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক সৈন্যবাহিনীর পক্ষে গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তায় ভারতীয় সৈন্যদের ছোট ছোট যুদ্ধে অতি সহজেই পরাজিত করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ একজন ভারতীয় সেনা ইউরোপীয় সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পেলে যে কোনো ইউরোপীয় সেনার মত দক্ষ হতে পারে (Bipan Chandra in Modern India)।

চতুর্থ অধ্যায়

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা (১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) ঃ সিরাজ ও মীরকাশিমের সঙ্গে দ্বন্দ্ব।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রসার

১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হুগলীতে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হয়। ঢাকা, পাটনা, বালেশ্বর ইত্যাদি স্থানে ইংরাজরা কুঠী স্থাপন করে। বোম্বাই এবং মাদ্রাজে স্বাধীন সুরক্ষিত ব্যবস্থা করতে পারায় ইংরাজরা এবার বাংলায় স্বাধীন ভাবে বসতি স্থাপনের কথা চিন্তা করতে শুরু করল।

রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা

অবাধ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইংরাজরা রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাহিনী ইংরাজদের শোচনীয় ভাবে পরাজিত করলে ইংরাজরা অবনমিত হয়ে আবার ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য মুঘল সরকারের কাছে আবেদন করে। ঔরংজীব প্রচুর ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে পুনরায় ব্যবসা করার অনুমতি দেন।

কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের জমিদারী লাভ

১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে বছরে মাত্র (৩০০০) তিন হাজার টাকার পরিবর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। **১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারী পেল।**

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের অবাধ বাণিজ্যের ফারমান

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের ফারমান ঃ ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়রের কাছ থেকে ইংরাজরা একটি ফারমান বা সনদ (farman) পেল। এই ফারমানের দ্বারা, ইংরাজরা ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে যে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, পুনরায় তা স্বীকৃত হল।

দস্তক

এই সনদের দ্বারা কোম্পানীকে **বিনা শুল্কে অবাধ আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়া হল।** তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের চলাচলের জন্য কোম্পানীকে **দস্তক** (ছাড়পত্র) বিলি করার অধিকার দেওয়া হল।

এই দস্তকের বলে কোম্পানীর অধীনস্থ কর্মচারীরাও বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। তবে তাঁদের দেশীয় বণিকদের মত সমান হারে বাণিজ্য শুল্ক দিতে হবে।

এই সনদ বাংলার নবাবদের সঙ্গে ইংরাজদের চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া দস্তক বা ছাড়পত্র বিলি করার ক্ষমতার অপব্যবহার করে, কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের ব্যবসার মালের জন্য কোম্পানীর নামে দস্তক বিলি করে সরকারকে শুল্ক ফাঁকি দিতে লাগল। ফলে শুল্ক থেকে রাজ্যের আয় কমে যেতে লাগল। রাজ্যের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল।

বাংলার নবাবদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণ না হলেও ব্যবসা বাণিজ্য ফেঁপে উঠতে লাগল। এর ফলে ভারত থেকে ইংলণ্ডে আমদানীকৃত পণ্যের বৃদ্ধি বেড়ে ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে দাঁড়াল (৫০০০,০০) পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে এই অংক দাঁড়ায় (১,৭৯৫,০০০) সতেরো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাউণ্ড। এর দ্বারা বোঝা যায় যে অষ্টাদশ শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রসার কি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রসার

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বৃটিশ উপনিবেশ গুলি ভারতে উন্নতিশীল শহর গুলির কেন্দ্র বলে পরিগণিত হল। ইংরাজরা যখনই এদেশের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ বুঝতে পেরেছিল, তখনই এই সব গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলিকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিয়েছিল।

বাংলা দেশে ইংরাজ প্রভুত্বের সূচনা

১৭০০ খ্রীস্টাব্দে ঔরংজীব **মুর্শিদকুলি** খাঁকে দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলার দেওয়ান রূপে প্রেরণ করেছিলেন। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি বিহার এবং উড়িষ্যায় সামরিক ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা বলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাকে কার্যতঃ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন।

বাংলার নবাব মুর্শিদ-কুলি খাঁ

১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হন তার জামাতা **সুজাউদ্দিন** (১৭২৭-৩৯)। তাঁরই শাসন কালে বাংলার সঙ্গে বিহার যুক্ত হয়। এই সুবিস্তৃত রাজ্যের উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকেরা দিল্লীর মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁরা সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন।

সুজাউদ্দিন

নবাব সুজাউদ্দিন **দস্তকের** অপব্যবহারের বিষয়ে বার বার কোম্পানীকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হয় না। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **সরফরাজ খাঁ** (১৭৩৯-৪০) নবাব হন। তাঁর আমলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বিহারের শাসন কর্তা **আলিবর্দি খাঁ** সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে বাংলার নবাব হন। আলিবর্দি মুঘল সম্রাটকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা, বিহার

আলিবর্দি খাঁ

উড়িষ্যার সুবাদার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং কার্যতঃ বাংলা, বিহার উড়িষ্যার শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন।

দস্তক

এদিকে মুর্শিদকুলি খাঁ সাময়িক ভাবে কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার উপর হস্তক্ষেপ করলেও, ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফারুকসিয়ারের প্রদত্ত **দস্তকের** সুযোগে কোম্পানীর বিনা শুল্কে ব্যবসা আবার বৃদ্ধি পায়। আলিবর্দি ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতি নজর রেখেছিলেন এবং কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর জমিদারীর জন্য ইংরাজদের নিকট থেকে প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করতেন। আলিবর্দির আমলেও সাময়িক অসুবিধা সত্ত্বেও কোম্পানীর বিনা শুল্কে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

আলিবর্দি দক্ষ শাসন কর্তা ছিলেন। তিনি সমর কুশলী দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন। তিনি ইংরাজ কোম্পানীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাদের কোন সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গ নির্মাণ করতে দেন নি। অবশ্য তিনি কোম্পানিকে মারাঠাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য মারাঠা পরিখা (**Maratha ditch**) খনন করবার অনুমতি দেন। নবাব আলিবর্দির কোনো পুত্র ছিল না। সেজন্য তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে বাংলার নবাব মনোনীত করেছিলেন।

সিরাজ ও ইংরাজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

সিরাজদৌল্লা ও ইংরাজদের আমলে বিরোধের কারণ

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র **সিরাজদ্দৌল্লা** বাংলার মসনদ লাভ করেন। বিভিন্ন কারণে তরুণ নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আলিবর্দির জীবিতকালে ইংরাজরা তাঁর রাজ্যের মধ্যে কোন দুর্গ সংস্কারের অনুমতি লাভ করেনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সিরাজের আদেশ অমান্য করে ইংরাজরা কলিকাতার দুর্গের সংস্কার করে। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সুযোগসুবিধার অপব্যবহারও তারা করতে থাকে। এছাড়া সিরাজের গভীর সন্দেহ হয় যে ইংরাজরা তাঁর বিরোধী পক্ষের কার্যকলাপের সঙ্গে লিপ্ত রয়েছে। নবাবের বিরোধী দলভুক্ত রাজকর্মচারী রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় আশ্রয় দেওয়ায় সিরাজ ইংরাজদের ওপর আরও অসন্তুষ্ট হন। এইভাবে বারবার তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও তাঁর আদেশ অমান্য করায় ক্ষুব্ধ হয়ে সিরাজ প্রথমে কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠি



সিরাজদ্দৌলা

দখল ও পরে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন (জুন, ১৭৫৬)। নবাবের আক্রমণে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কলিকাতার গভর্নর ড্রেক ও অন্যান্য বহু ইংরাজ কর্মচারী পলায়ন করেন।

কলিকাতা পুনরধিকার: আলিনগরের সন্ধি (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)

ইংরাজদের বিপর্যয়ের সংবাদ মাদ্রাজে পেঁছিলে রবার্ট ক্লাইভ ও নৌসেনাপতি ওয়াটসনের নেতৃত্বে একদল ইংরাজ সৈন্য ও কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে এবং অল্পায়াসে কলিকাতা পুনরধিকার করে (জানুয়ারী, ১৭৫৭)। সিরাজ ও ইংরাজদের মধ্যে **আলিনগরের সন্ধি** হয়। সন্ধির সর্তানুসারে নবাব যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণে সম্মত হন। ইংরাজরা দুর্গ-নির্মাণ, বিনা শুল্কে বাণিজ্য পরিচালনা এবং নিজেদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকার লাভ করে।

পলাশীর যুদ্ধ: পরবর্তী কয়েক মাসের ঘটনা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। ইংরাজরা উপলব্ধি করেছিল যে এই ইংরাজ-বিরোধী তরুণ নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত বাংলাদেশে তাদের পক্ষে নিশ্চিন্তে বাণিজ্য ও প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হবে না। ঘটনাচক্রে এই সময় মুর্শিদাবাদের রাজদরবারেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার এক গভীর ষড়যন্ত্র সুরু হয়েছিল। এর নায়ক ছিলেন নবাবের আত্মীয় ও সেনাপতি **মীরজাফর**। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, স্বরূপচাঁদ ইত্যাদি বিত্তশালী ও প্রভাবশালী বহু ব্যক্তি। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিল সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা। সুবর্ণসুযোগ বুঝে ক্লাইভ গোপনে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন। স্থির হল যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে মীরজাফর কোম্পানীকে ১৭৫ লক্ষ টাকা দেবেন।

মুর্শিদাবাদে সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র

এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শোচনীয় পরিণতিরূপে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে মাত্র কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে ক্লাইভের পরিচালনায় অল্পসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য পঞ্চাশ সহস্রাধিক নবাব সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে। মীরমদন, মোহনলাল প্রভৃতি বীর সেনাপতিদের মরণ-পণ সংগ্রাম মীরজাফর ও তাঁর সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতায় নিষ্ফল হয়। হতভাগ্য সিরাজ পলায়নকালে ধরা পড়ে মীরজাফরের পুত্র মীরনের হাতে নিহত হন। **পলাশীর যুদ্ধ নামে 'যুদ্ধ' হলেও প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রহসন-মাত্র। কিন্তু এই জঘন্য ও মর্মান্তিক ষড়যন্ত্র ও প্রহসনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।** কালক্রমে এই সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ করে সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছিল।

পলাশীর যুদ্ধ: (২৩ জুন, ১৭৫৭)

মুর্শিদাবাদে সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র ছাড়াও, সিরাজের পতনের আরও কারণ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, কোম্পানী মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হতে একটু একটু করে সামরিক শক্তি গড়ে তোলে। ইংরাজরা বুঝেছিল যে এ দেশে বাণিজ্য করতে গেলে, রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা অধিকার করা প্রয়োজন। এর জন্য তাদের দূরদৃষ্টি ছিল এবং ধীরে ধীরে সামরিক ঘাঁটি তৈরী করে ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে নিজেদের শক্তিশালী করে তুলছিল। অপর পক্ষে বাংলার নবাবদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে কোন প্রচেষ্টা ছিল না। তাঁদের সামরিক শক্তি ইংরাজদের তুলনায় দক্ষ এবং শক্তিশালী ছিল না। সুতরাং কর্মচারীদের দুর্নীতি, সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র এবং সামরিক শক্তির দুর্বলতা পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের কারণ

মীরকাসিমের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও বক্সারের যুদ্ধ

ইংরাজদের ক্রীড়নকরূপে **মীরজাফর** (১৭৫৭-১৭৬০) বাংলার সিংহাসনে বসলেও দীর্ঘকাল তাঁর পক্ষে রাজ্যসুখ ভোগ করা সম্ভব হয়নি। প্রচুর জমি-জমা, অর্থ-সম্পদ দান করেও তিনি কোম্পানী, রবার্ট ক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরাজ কর্মচারীদের অর্থের চাহিদা মেটাতে পারেননি। বিরক্ত ও ধৈর্যচ্যুত হয়ে মীরজাফর ওলন্দাজদের সহযোগিতায় ইংরাজদের বিতাড়িত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু **বিদেরার যুদ্ধে** (নভেম্বর, ১৭৫৯) ওলন্দাজদের পরাজিত করে ক্লাইভ এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেন। কয়েক মাস পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে **ভ্যান্সিটার্ট** কলিকাতার গভর্নর নিযুক্ত হন। ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হন। ইংরাজরা মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে।



মীরকাসিম (১৭৬০-১৭৬৩)

ওলন্দাজদের পরাজয় (১৭৫৯)

মীরজাফরের মত **মীরকাসিমও** (১৭৬০-১৭৬৩) ইংরাজদের সাহায্য ও অনুগ্রহে বাংলার নবাব হয়েছিলেন এবং তার বিনিময়ে কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার জমিদারী স্বত্ব ও প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন। কিন্তু মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা, সাহসী ও সুদক্ষ শাসক। ইংরাজদের প্রভাব-প্রাত পত্তি তিনি

পছন্দ করতেন না। কোম্পানীর কর্মচারীরা ক্রমাগত দস্তকের অপব্যবহার করে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নবাবকে তাঁর প্রাপ্য শুল্ক না দেওয়ায় মীরকাসিম ক্ষুব্ধ হয়ে এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এরই পরিণতিরূপে **প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে** তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বেধে যায় (১৭৬৩)। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হবার পর মীরকাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের মিত্রতা প্রার্থনা করেন। কিন্তু **বক্সারের যুদ্ধে** (২২ অক্টোবর, ১৭৬৪) ইংরাজ সেনাপতি **মেজর হেক্টর মনরো** ঐ ত্রিশক্তির সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে পূর্ব ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করেন। মীরকাসিমের সঙ্গে সুজার মিত্রতার ফলেই বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল এবং এই যুদ্ধের ফলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে মীরকাসিমের ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ তিনি মনরোর আক্রমণের পূর্বেই সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। এরপর মীরকাসিম পালিয়ে যান এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে ঘুরতে ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং বক্সারের যুদ্ধের পরাজয়ের সমস্ত দায়ভার সুজাকেই বহন করতে হয় এবং উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নবাব সুজাউদ্দৌলা ধুলায় মিশিয়ে যান।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)

সুজা কিন্তু রাজনীতি ও যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন, যে দক্ষতা সিরাজের ছিলনা। বক্সারের যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর শুধু সামরিক জয়লাভই হয়নি, এই যুদ্ধে কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলায় আধিপত্য স্থাপনের ফলে নবাবের অবশিষ্ট ক্ষমতাটুকুও লুপ্ত হয় এবং অযোধ্যা ও এলাহাবাদে কোম্পানীর প্রভুত্ব বিস্তারের পথ সুগম হয়।

বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বাংলার নবাবের অবশিষ্ট মর্যাদা ও ক্ষমতাটুকুও লুপ্ত হয়। ইতিপূর্বে মীরকাসিমের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজরা তাঁকে পদচ্যুত করে মীরজাফরকে বাংলার নবাব পদে পুনর্নিযুক্ত করেছিল। মীরজাফরের মৃত্যুর (১৭৬৫) পর তাঁর পুত্র **নজমউদ্দৌলার** সঙ্গে স্বাক্ষরিত এক নতুন চুক্তি অনুসারে নবাব নামেমাত্র রাজ্যের প্রধানরূপে থাকলেও প্রকৃত শাসনক্ষমতা কোম্পানীর হস্তগত হয় (ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৫)।

ইংরাজদের শাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি

বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ক্লাইভকে পুনরায় বাংলার গভর্ণর করে পাঠান (মে, ১৭৬৫)। তাঁর দ্বিতীয় শাসনকালে (১৭৬৫-১৭৬৭) দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমতঃ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমের সঙ্গে একটি সন্ধির মাধ্যমে ইংরাজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী (রাজস্ব সংগ্রহ ও দেওয়ানী বিচারের অধিকার) লাভ করে (আগস্ট, ১৭৬৫)। দেওয়ানী লাভের পরিবর্তে

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫)

সম্রাটকে ইংরাজ কোম্পানীর বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে হয়। তিনটি প্রদেশের উদ্বৃত্ত-রাজস্ব দুটি উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হত। প্রথমটি হল নিরাপত্তার জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে এবং দ্বিতীয়টি হল নিজামতের শাসন পরিচালনা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে।

মুঘল শাসননীতি অনুযায়ী বিভিন্ন সুবা বা প্রদেশের দেওয়ানী কাউকেও চিরস্থায়ী ভাবে দেওয়া হত না। বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে সম্রাট দেওয়ানীর শাসন কার্যে নিযুক্ত করতেন। কিন্তু কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই বন্দোবস্ত পাকাপাকি বা চিরস্থায়ীভাবে করা হয় এবং ব্যক্তির পরিবর্তে একটি ব্রিটিশ সংস্থার উপর দেওয়ানীর ভার অর্পণ করা হয়। মুঘল আমলের চিরাচরিত রীতি ভঙ্গ করে এই প্রথম দেওয়ানীর উপর নিজামতের শাসন ভার অর্পণ করা হল। সুতরাং ১৬৭৫ এর সনদের বলে বাংলার শাসন কর্তৃত্ব কার্যতঃ কোম্পানীর উপর ন্যস্ত করা হয়। মুঘল বাদশাহ ইংরাজদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। দ্বিতীয়তঃ অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এলাহাবাদের সন্ধির সর্তানুসারে ইংরাজরা ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ছাড়া কোরা ও এলাহাবাদ জেলা লাভ করে ঐ দুটি জেলা মুঘল সম্রাটকে প্রদান করে। অযোধ্যা রাজ্যটি ইংরাজের প্রভাবাধীন হয়।

অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সন্ধি

রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অর্থলোভী ও নীতিজ্ঞানহীন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ষড়যন্ত্র, শঠতা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে ফরাসীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরাজের সাফল্য ও বাংলাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল তাঁর সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অসাধারণ কূটবুদ্ধি।

ক্লাইভের কৃতিত্ব

বাংলাদেশে ইংরাজ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার খুব সহজ হয়নি। উত্তর ভারতে মারাঠা রাজ্য, হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং মহীশূর রাজ্যের হায়দার আলি তখন বিশেষ শক্তিশালী ছিল। এইসব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র ভারতে বৃটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল না। ক্লাইভের পরবর্তী দুই গভর্নর **ভেরেল্স্ট** (১৭৬৭-১৭৬৯) ও **কার্টিয়ার** (১৭৬৯-১৭৭২) কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেননি।

প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় রাজ্যসমূহ

পলাশী থেকে বক্সার ঃ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার প্রত্যক্ষ শাসন ক্ষমতা মীরজাফরের হাতে থাকলেও কার্যতঃ ইংরাজরাই শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা মীরজাফরকে নামেমাত্র সিংহাসনে বসিয়ে বাংলার শাসনকার্য

পরিচালনা করতেন। পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা হরণের যে প্রস্তুতি শুরু হয়, তার চূড়ান্ত অবসান হয় ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে।

মীরজাফরের পর বাংলার নবাব মীরকাসিম চেষ্টা করেছিলেন ইংরাজদের হারিয়ে বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিমের পরাজয়ের ফলে এবং ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সম্রাটদের কাছ থেকে ইংরাজদের দেওয়ানী লাভ করায় বাংলার স্বাধীনতার অবসান হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার (১৭৬৭-১৮৫৭)

*　*　*　*

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ড রূপে।

—রবীন্দ্রনাথ

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজ ও মীরকাশিমের দ্বন্দ্ব হয়েছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে। নবাবের আদেশ অমান্য করে ইংরাজরা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সুবিধাগুলির অপব্যবহার করতে থাকে। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নবাবকে তাঁর প্রাপ্য শুল্ক থেকে বঞ্চিত করে। কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করায় ইংরাজরা নবাবের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়।

আসলে ইংরাজরা বুঝেছিল যে ভারতে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। তাই তারা মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই একটু একটু করে তাদের সামরিক শক্তিকে সুসংহত করে। অপরদিকে নবাবরা ইংরাজদের মনোভাব বুঝতে পারেন নি এবং ভবিষ্যতে ইংরাজদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের আশঙ্কায় সামরিক শক্তিকে জোরদার করেন নি। উপকূল সংরক্ষণের জন্য নৌশক্তির গুরুত্বও নবাবরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। এছাড়া আমীর ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীদের দুর্নীতি ও চক্রান্তের জন্য নবাবের শাসন ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। কুটবুদ্ধি সম্পন্ন ক্লাইভ এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা লোপ পায়।

সাম্রাজ্যবিস্তারে ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকা

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫) বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ভারতে বৃটিশ প্রাধান্য বিস্তারে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম মারাঠাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ায় হেস্টিংস তাঁর বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করে দেন এবং তাঁর কাছ থেকে এলাহাবাদ ও কোরা জেলা দুটি কেড়ে নিয়ে

পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবকে ফিরিয়ে দেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা

অযোধ্যায় ইংরাজ প্রভাব বৃদ্ধি

অযোধ্যায় একদল বৃটিশ সৈন্য রাখতে ও তার ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হন। ইংরাজ সমর্থন ও সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সুজাউদ্দৌলা তাঁর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রোহিলখণ্ড রাজ্যটি জয় করতে উদ্যোগী হন। রোহিলা নামে আফগানরা এই রাজ্যটি স্থাপন করেছিল। চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হেস্টিংস সুজাউদ্দৌলাকে একদল ইংরাজ সৈন্য ভাড়া দেন। এই ভাড়াটিয়া সৈন্যের সাহায্যে তিনি রোহিলখণ্ড অধিকার করে নেন (১৭৭৪)।



ওয়ারেন হেস্টিংস

ন্যায়নীতির বিচারে **হেস্টিংসের রোহিলা নীতি** সমর্থন করা যায় না। কিন্তু রোহিলা যুদ্ধের ফলে ঐ অঞ্চলে মারাঠাদের প্রাধান্য বিস্তারের সম্ভাবনা দূর হয়েছিল ও অযোধ্যায় ইংরাজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং হেস্টিংসের রোহিলা নীতির পিছনে কিছুটা রাজনৈতিক যুক্তি ছিল।

মারাঠা : ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় ইংরাজদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মারাঠা ও মহীশূর রাজ্য। **প্রথম** ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের (১৭৭৫-১৭৮২) কারণ, ঘটনাবলী ও সলবই-এর সন্ধি (১৭৮২) ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮২)

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের শোচনীয় বিপর্যয়ের ফলে মারাঠাদের মনোবল **নষ্ট** হয়ে গিয়েছিল। পেশোয়া প্রথম মাধবরাও এবং মহাদাজী সিন্ধিয়া উত্তরভারতে মারাঠা প্রাধান্য বহুলাংশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেও মারাঠা সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে পারেননি। মারাঠাদের দুর্বলতা মহীশূর রাজ্যে হায়দার আলির এবং কালক্রমে সারা ভারতে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তারের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **প্রথম মাধবরাও** পেশোয়া হন। প্রায় কিশোর বয়সে এবং অত্যন্ত সংকটজনক কালে গুরুদায়িত্বভার বহন করলেও তিনি তাঁর শাসনকালে (১৭৬১-১৭৭২) অসাধারণ বুদ্ধি ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে মারাঠাদের হৃত প্রাধান্য তিনি কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে সফল হয়েছিলেন। নিজামের আক্রমণ প্রতিরোধ, কর্ণাটক অভিযান, হায়দার আলির বিরুদ্ধে সাফল্য এবং ইংরাজ-আশ্রয়াধীন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ

পেশোয়া প্রথম মাধবরাও (১৭৬১-১৭৭২)

আলমের ওপর মারাঠা প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে পেশোয়া প্রথম মাধবরাও-এর অকালমৃত্যুতে মারাঠা সাম্রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

প্রথম মাধবরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **নারায়ণরাও** পেশোয়া পদ লাভের অল্পকালের মধ্যে নিজের পিতৃব্য **রঘুনাথরাও**-এর ষড়যন্ত্রে নিহত হন (১৭৭৩)। রঘুনাথরাও নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু কিছুকাল পর **নানা ফড়নবীশ** নামে এক সুযোগ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে মারাঠা নায়করা রঘুনাথরাওকে বিতাড়িত করে নারায়ণরাও-এর শিশুপুত্র **দ্বিতীয় মাধবরাওকে** (মাধবরাও নারায়ণ) পেশোয়ার পদে অধিষ্ঠিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর এই শিশুর জন্ম হয়েছিল। দ্বিতীয় মাধবরাও-এর আমলে (১৭৭৪-১৭৯৬) মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন নানা ফড়নবীশ।


নানা ফড়নবীশ

দ্বিতীয় মাধবরাও (১৭৭৪-১৭৯৬)

রাজ্যচ্যুত রঘুনাথরাও বোম্বাই-এর ইংরাজ সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হন এবং সলসেট ও বেসিন প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বোম্বাই-এর ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে **সুরাটের সন্ধি** করেন (১৭৭৫)। রঘুনাথরাও ও ইংরাজদের সম্মিলিত বাহিনী পেশোয়ার সৈন্যদলকে একটি যুদ্ধে পরাজিত করে। কিন্তু বাংলার ইংরাজ সরকার বোম্বাই সরকারের নীতি সমর্থনযোগ্য বিবেচনা না করে পেশোয়ার সঙ্গে **পুরন্দরের সন্ধি** করেন (১৭৭৬)। সন্ধির সর্তানুসারে ইংরাজরা সলসেট লাভের বিনিময়ে রঘুনাথের পক্ষত্যাগে স্বকৃীত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করায় বোম্বাই ও বাংলার ইংরাজ সরকার মিলিতভাবে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু মারাঠারা ইংরাজবাহিনীকে পরাজিত করে অপমানজনক সর্তে **ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি** (১৭৭৯) স্বাক্ষরে তাদের বাধ্য করে। ওয়ারেন হেস্টিংস এই সন্ধির সর্ত স্বীকারে অসম্মত হলে যুদ্ধ পুনরায় শুরু হয়। অবশেষে **মহাদাজী সিন্ধিয়ার** মধ্যস্থতায় মারাঠা ও ইংরাজদের মধ্যে **সলবই-এর সন্ধি** (১৭৮২) স্বাক্ষরিত হলে **প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের** অবসান হয়। দ্বিতীয় মাধবরাও পেশোয়া রূপে স্বীকৃত হন।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮২)

সলবই-এর সন্ধি (১৭৮২)

রঘুনাথরাওকে বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরাজরা সলসেট লাভ করে।

মহাদাজী সিন্ধিয়া

সলবই-এর সন্ধির পর বিভিন্ন অঞ্চলের মারাঠা সামন্তরাজদের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আরও বৃদ্ধি পায়। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হন মহাদাজী সিন্ধিয়া। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে মারাঠারা এক সুদক্ষ রণনায়ক ও রাজনীতিজ্ঞকে হারায়। মারাঠা রাজ্যের আর

নানা ফড়নবীশ

এক নায়ক **নানা ফড়নবীশের** সঙ্গে মহাদাজী সিন্ধিয়ার সদ্ভাব ছিল না। নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদের কিছু অংশ জয় করে (১৭৯৫) এবং ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতার বিনিময়ে মহীশূর রাজ্যের একাংশ লাভ করে নানা ফড়নবীশ মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন।

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৬-১৮১৮)

অপুত্রক দ্বিতীয় মাধবরাও-এর মৃত্যুর (১৭৯৬) পর রঘুনাথরাও-এর পুত্র **দ্বিতীয় বাজীরাও** পেশোয়াপদ লাভ করেন। এই সময় মারাঠা নায়কদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ মারাঠা সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তোলে। নানা ফড়নবীশের মৃত্যুর পর (১৮০০) পেশোয়া রাজ্যের অবস্থা আরও খারাপ হয়। সমসাময়িক জনৈক ইংরাজ রাজকর্মচারী মন্তব্য করেন যে ফড়নবীশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়া দরবারের রাজনৈতিক সংযম ও সুবুদ্ধি লুপ্ত হয়। যশোবন্তরাও হোলকারের বাহিনীর কাছে

বেসিনের সন্ধি (১৮০২): পেশোয়ার ইংরাজ অধীনতা স্বীকার

পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় বাজীরাও পুণা থেকে পলায়ন করেন এবং ইংরাজদের সঙ্গে **বেসিনের সন্ধি** (১৮০২) স্বাক্ষর করে লর্ড ওয়েলেসলি-প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। সিন্ধিয়া, ভোঁসলা প্রমুখ মারাঠা সামন্তরাজারা পেশোয়ার এই আত্মমর্যাদাহীন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেননি। দ্বিতীয় বাজীরাও নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন। ফলে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে পেশোয়া,

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩-১৮০৫)

সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে **দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ** শুরু হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সমগ্র জাতির সংকট মুহূর্তেও মারাঠা সামন্তরাজারা স্বার্থ ও বিরোধ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হন। দুই অন্যতম প্রধান মারাঠা নেতা হোলকার ও গায়কবাড় যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকেন। বিচ্ছিন্ন বিভক্ত মারাঠাদের পরাজিত করা আর্থার ওয়েলেসলি (গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা), লর্ড লেক প্রমুখ

বিভিন্ন যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়

কুশল ইংরাজ রণনায়কদের পক্ষে দুরূহ হয়নি। দক্ষিণ ভারতে **আসাই আরগাঁও** এবং উত্তর ভারতে **দিল্লী ও লাসোয়ারির** যুদ্ধে মারাঠাবাহিনী পরাজিত হয়। ফলে **দেওগাঁও-এর সন্ধির**

সর্তানুসারে ভোঁসলা ইংরাজদের উড়িষ্যা অঞ্চল প্রদান করতে বাধ্য হন। অন্য দিকে সিন্ধিয়া **সুরজী অঞ্জনগাঁও-এর সন্ধি** স্বাক্ষর করে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে ইংরাজ প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও মারাঠা আশ্রয় ত্যাগ করে কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। এই ভাবে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মারাঠা শক্তি ও সাম্রাজ্যের বিপর্যয় ঘটে।

দেওগাঁও ও সুরজী অঞ্জনগাঁও-এর সন্ধি (১৮০৩)

সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার পরাজয়ের পরিণামে উদ্বিগ্ন হয়ে যশোবন্তরাও হোলকার ভরতপুরের জাঠ রাজার সহযোগিতায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৮০৪)। কিন্তু **দীগের যুদ্ধে** তিনিও পরাজিত হন। লর্ড লেক ভরতপুর অবরোধ করলেও অধিকার করতে ব্যর্থ হন (১৮০৫)। যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বেই গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হওয়ায় হোলকার সম্পূর্ণ পরাজয়ের অবমাননা থেকে অব্যাহতি পান।

হোলকারের পরাজয় (১৮০৪)

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় থেকেই পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব ও সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য ইংরাজ সরকার তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। যুদ্ধের পরও ইংরাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-১৮২৩) তাঁকে আরও কঠোর এবং অমর্যাদাকর চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। এর ফলে দ্বিতীয় বাজীরাও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তারে সিন্ধিয়া, ভোঁসলা, হোলকার প্রভৃতি মারাঠা সামন্তরাজারাও খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত লর্ড হেস্টিংসের পিণ্ডারীদমনে ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে পেশোয়ার বাহিনী পুণার নিকটবর্তী কির্কির বৃটিশ দূতাবাস আক্রমণ করলে **তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ** আরম্ভ হয় (১৮১৭)। কিন্তু মারাঠা নায়করা ঐক্য-বদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে না পারায় ইংরাজদের পক্ষে জয় লাভ করা কঠিন হয়নি। কির্কি আক্রমণ ব্যথ হয়। নাগপুরের কাছে **সিতাবলদিতে** ভোঁসলার সৈন্যবাহিনীর এবং **মাহিদপুরের** যুদ্ধে হোলকার বাহিনী ইংরাজ সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়। পরিশেষে **কোরেগাঁও** এবং **অষ্টির** যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হয়ে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে (১৮১৮) তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয়। পেশোয়ার পদ বিলোপ করা হয়। দ্বিতীয় বাজীরাওকে বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করে কানপুরের কাছে বিঠুরে নির্বাসিতের জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। সাতারার সিংহাসনে শিবাজীর বংশধর প্রতাপসিংহ অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু পেশোয়ার রাজ্যের বৃহত্তর অংশ ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হয়। ভোঁসলা ও হোলকার নিজ নিজ রাজ্যের

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ :(১৮১৭-১৮১৮)

মারাঠাদের পরাজয় ও পেশোয়ার আত্মসমর্পণ

কিছু অংশ ইংরাজদের প্রদান করে তাদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করেন। সিন্ধিয়ার প্রভাবাধীন রাজপুত রাজ্যগুলিও ইংরাজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হওয়ায় রাজপুতানায় ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত হয়।

মারাঠা শক্তির পতন

মারাঠা শক্তি ও সাম্রাজ্যের পতন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করে। এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির পরাজয়ের ফলে ভারতে নিরংকুশ ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ প্রায় নিষ্কণ্টক হয়ে পড়ে।

মহীশূর ঃ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে মহীশূর একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে **হায়দার আলি** নামে এক সাহসী ও সুদক্ষ সেনানায়ক মহীশূরের হিন্দু রাজাকে পদচ্যুত করে নিজেকে ঐ রাজ্যের সুলতানরূপে ঘোষণা করেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁর শক্তিবৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন নিজাম, মাদ্রাজের ইংরাজ সরকার ও মারাঠাদের মধ্যে এক হায়দার-বিরোধী চুক্তি হয়। কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এই জোটের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও হায়দার ইংরাজবাহিনীর কাছে পরাজিত হন (১৭৬৭)। কিন্তু কিছুকাল পরে রণ-চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে হায়দার আকস্মিকভাবে মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলে ইংরাজরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয় (এপ্রিল, ১৭৬৯)। স্থির হয় যে ভবিষ্যতে উভয়ে উভয়ের বিপদ-কালে সাহায্য করবে। এইভাবে **প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৬৭-১৭৬৯) শেষ হয়। কিন্তু দু'বছর পর মারাঠারা হায়দারের রাজ্য আক্রমণ করলে ইংরাজরা সন্ধির সর্ত পালন না করায় হায়দার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ প্রাধান্য উচ্ছেদ করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হন।


হায়দার আলি

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে ইংরাজরা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী উপনিবেশ মাহে অধিকার করে। ইংরাজদের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে হায়দার নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে জোট বেঁধে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে **দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৮০-১৭৮৪) আরম্ভ হয়। মাদ্রাজ সরকারের ত্রুটিপূর্ণ নীতির ফলে এই যুদ্ধ শুরু হলেও হেস্টিংস এই সংঘর্ষে লিপ্ত হন, কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতে ইংরাজশক্তি বিপন্ন হলে সমগ্র ভারতে ইংরাজদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তিনি কৌশলে

প্রথমে নিজামকে ও পরে মারাঠাদের এই জোট থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বে হায়দারের মৃত্যু হলে (১৮৮২) তাঁর পুত্র **টিপু সুলতান** যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে **ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির** দ্বারা যুদ্ধের অবসান হয়। দুই পক্ষ পরস্পরের বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করে।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪)



টিপু সুলতান

মারাঠা ও মহীশূর যুদ্ধে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছিল তা সংগ্রহ করার জন্য হেস্টিংস বারাণসীর রাজা চৈং সিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের সঙ্গে অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত আচরণ করেছিলেন।

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি নতুন আইন বৃটিশ পার্লামেণ্ট পাশ করে। এই আইনে নির্দেশ ছিল, কোম্পানী যেন ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার এবং ভারতীয় রাজ্যসমূহের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হয়। কিন্তু এই নির্দেশ সঠিকভাবে পালিত হয়নি। মহীশূরের টিপু সুলতান ও ইংরাজদের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয়নি। দুই পক্ষই পরস্পরের মনোভাব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ পোষণ করত। এই পরিস্থিতিতে টিপু ইংরাজ-আশ্রিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলে গভর্নর-জেনারেল **লর্ড কর্নওয়ালিস** (১৭৮৬-১৭৯৩) নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেননি। ফলে **তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৯০-১৭৯২) শুরু হয়। পেশোয়া ও নিজাম ইংরাজ পক্ষে যোগদান করেন। দু'বছর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত হলে টিপু ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তিনি নিজের রাজ্যের অর্ধাংশ ও ৩৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মহীশূরের ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পায়।

লর্ড কর্নওয়ালিস ও তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০-১৭৯২)

লর্ড কর্নওয়ালিসের পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল **স্যার জন শোর** (১৭৯৩-১৭৯৮) ভারতীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপারে বিলাতের কর্তৃপক্ষ-নির্দেশিত নির্লিপ্ততা বা **ঔদাসীন্যের নীতি** অনুসরণ করেন। কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে হস্তক্ষেপ করে তিনি এলাহবাদ দুর্গটি লাভ করেন।

শোরের ঔদাসীন্য নীতি

শোরের পরবর্তী ইংরাজ শাসনকর্তা **লর্ড ওয়েলেসলি** (১৭৯৮-১৮০৫) ঔদাসীন্য

নীতির যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ইংলণ্ড তখন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনায় ভীত ও সন্ত্রস্ত। ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ ও ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবের সুযোগে ফরাসীরা প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে ঔদাসীন্যের নীতি ত্যাগ করে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ও ফরাসী প্রভাব উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা ওয়েলেসলি গ্রহণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ওয়েলেসলি **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি** (Policy of Subsidiary Alliance 1798) প্রবর্তন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে যদি কোন দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করে ইংরাজদের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে ইংরাজরা তাঁর রাজ্যকে বহিঃশত্রু ও আভ্যন্তরীণ বিপদ হতে রক্ষা করবে। কিন্তু ঐ আশ্রিত রাজাকে তাঁর রাজ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য রাখতে হবে এবং ঐ সৈন্যদলের ব্যয়বহনের জন্য তাঁকে নগদ টাকা বা রাজ্যের একাংশ ইংরাজদের দিতে হবে। তাছাড়া তিনি অন্য কোন বিদেশী শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে বা তাঁর রাজ্যে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোন বিদেশী কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারবেন না। নিজের স্বাধীনতার বিনিময়ে ইংরাজদের কাছে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লাভ—এই ছিল ওয়েলেসলি-প্রবর্তিত নীতির মূল কথা।



লর্ড ওয়েলেসলি

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

ওয়েলেসলির '**অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি**' ছিল ভারতে বৃটিশ রাজশক্তিকে সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার একটি যন্ত্র। ওয়েলেসলি সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতির একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই নীতির উদ্ভাবক ছিলেন না। ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে নিজামই অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হয়ে ওয়েলেসলির নীতির সর্বপ্রথম কার্যকরী রূপ দেন। এই নীতি অনুযায়ী প্রথম নিজামের সঙ্গে ফরাসীদের চুক্তি (১৭৫০) হয়। অবশ্য কর্ণাটক ও অযোধ্যায় এই নীতি পূর্বেই অংশতঃ প্রচলিত ছিল।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির বৈশিষ্ট্য

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজন্যবর্গের শাসনের কেন্দ্র থেকে ফরাসী প্রভাব দূর করা। এই সময়ে ফরাসী বীর নেপোলিয়নের

বিরুদ্ধে বৃটেন ইউরোপে এক জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। নেপোলিয়ন মিসরের সঙ্গে মিত্রতা করে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ভারতীয় রাজন্যবর্গের দুর্বলতা ও নৈতিক সাহসের অভাব প্রকট করেছিল। তাঁদের শাসন ক্ষমতার অযোগ্যতা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। কুশাসনের ফলে তাঁরা হয় ক্রমবর্ধমান বৃটিশ হস্তক্ষেপের (যেমন হায়দ্রাবাদের ক্ষেত্রে) অথবা কালক্রমে বৃটিশ ভারতের (British India) সঙ্গে তাদের রাজ্যের সংযুক্তির (অযোধ্যা) পথ প্রস্তুত করেছিলেন। ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজন্যবর্গের সহায়তায় তাদের রাজ্যে বৃটিশ সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। ওয়েলেসলির এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

হায়দ্রাবাদের নিজাম ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় নৃপতি প্রথমে এই অপমানকর প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। ঘোরতর ইংরাজবিরোধী টিপু সুলতান ফরাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ওয়েলেসলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কালক্ষেপ না করে ইংরাজরা মহীশূর আক্রমণ করে ও **চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ** (১৭৯৯) আরম্ভ হয়। শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রামের পর টিপু পরাজিত ও নিহত হন। মহীশূর রাজ্যের বৃহদংশ কোম্পানী ও নিজাম নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। বাকি অংশ প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের এক উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হয়। এইভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথের অন্তরায় স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ [১৭৯৯] ঃ মহীশূর রাজ্যের পরাজয় ও অবলুপ্তি

কিছুকালের মধ্যে মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্বিরোধের ফলে **পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও** বেসিনের সন্ধির (১৮০২) সর্তানুসারে **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয় (১৮০৩)**। এই যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় ও মারাঠা সামন্ত রাজাদের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের কাহিনী পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩)

অন্যান্য রাজ্য অধিকার ঃ বিনা যুদ্ধেও ওয়েলেসলি কয়েকটি দেশীয় রাজ্য অধিকার করেছিলেন। বিভিন্ন অজুহাতে তিনি সুরাট, তাঞ্জোর, কর্ণাটক এবং অযোধ্যা রাজ্যের একাংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন।

ওয়েলেসলির পদত্যাগের (১৮০৫) পর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভারতের ইংরাজ সরকার পুনরায় ঔদাসীন্য নীতি অনুসরণ করে। এই সময়ের মধ্যে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়নি। অবশ্য রণজিৎ সিংহের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৫) স্বাক্ষর করে **লর্ড মিণ্টো** (১৮০৭-১৮১৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বৃটিশ প্রাধান্য বিস্তৃত করেছিলেন।

ঔদাসীন্য নীতির পুনঃপ্রবর্তন (১৮০৫-১৮১৩)

লর্ড ময়রা (বা **হেস্টিংস**) গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে ঔদাসীন্য নীতি বর্জন করে পুনরায় সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে (১৮১৩-১৮২৩) **ইঙ্গ-নেপাল বা গুর্খা যুদ্ধ** (১৮১৪-১৮১৬) এবং **তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ** (১৮১৭-১৮১৮) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নেপাল রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা ও কোম্পানীর সাম্রাজ্যের উত্তর সীমানা সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় প্রায়ই সীমান্ত-সংঘর্ষ হত এবং এই কারণেই শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ শুরু হয়। কিছুকাল যুদ্ধের পর গুর্খারা **সগৌলির সন্ধি** স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। সন্ধির সর্তানুসারে ইংরাজরা কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জিলা এবং তরাই অঞ্চলের একাংশ লাভ করে। সিকিমে গুর্খা আধিপত্য লুপ্ত হয়। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।



লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-১৮২৩)

ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ (১৮১৪-১৮১৬)

লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এই যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে (পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫)।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে জয়লাভ (১৮১৮)

পিণ্ডারী দমন বা পিণ্ডারী যুদ্ধে (১৮১৭-১৮১৮) সাফল্য লর্ড হেস্টিংসের আর এক স্মরণীয় কীর্তি। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে গঠিত পিণ্ডারী নামে একদল সশস্ত্র দস্যু মধ্য ভারত ও রাজপুতানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আক্রমণ ও লুঠতরাজ করে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। কোম্পানীর রাজ্যের শান্তিও তারা বিঘ্নিত করেছিল। এই দস্যুদলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে হেস্টিংস তাদের দমন করেন। পিণ্ডারী নেতারা ইংরাজ বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে সাফল্যের ফলে ভারতে ইংরাজ প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ভূপালের নবাব অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করেন (১৮১৮)। পিণ্ডারী যুদ্ধ পরোক্ষভাবে রাজপুতানায় ইংরাজ আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করেছিল। দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন রাজপুত রাজ্যগুলি উপলব্ধি করেছিল যে ইংরাজদের সাহায্য ভিন্ন ঐ নির্মম দস্যুদের আক্রমণ ও অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব নয়। কিছুকালের মধ্যে রাজপুত রাজ্যগুলি ইংরাজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হলে রাজপুতানায় বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিণ্ডারী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮)

রাজপুতানায় ইংরাজ প্রাধান্য বিস্তার

পরবর্তী পঁচিশ বছর (১৮২৩-১৮৪৮) ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থিতি ও সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে। **লর্ড আমহার্স্ট**-এর শাসনকালে (১৮২৩-১৮২৮) **প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধে** (১৮২৪-১৮২৬) জয়লাভের ফলে ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বৃটিশ অধিকার বিস্তৃত হয় ও সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত হয়। ভরতপুরের দুর্গ অধিকার (১৮২৬) আমহার্স্টের শাসনকালের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

লর্ড আমহার্স্ট ও প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৪-১৮২৬)

পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল **লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক** (১৮২৮-১৮৩৫) তাঁর শাসন ও সমাজ-সংস্কারের জন্য অধিকতর প্রসিদ্ধ হলেও তাঁর সময় কুর্গ ও মহীশূর রাজ্য এবং পূর্ব দিকে কাছাড় ও জয়ন্তিয়া জিলা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমে রণজিৎ সিংহ ও সিন্ধু প্রদেশের আমীরদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে তিনি সম্ভাব্য রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তিতে ইংলণ্ডের শাসকগণ এই সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। মূলতঃ রুশ আতঙ্ক ও অন্যান্য ঘটনাচক্রের ফলে **লর্ড অকল্যাণ্ড**-এর সময় (১৮৩৬-১৮৪২) **প্রথম আফগান যুদ্ধ** শুরু হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজদের শোচনীয় বিপর্যয় এবং মর্যাদাহানি হয়েছিল। **লর্ড এলেনবরার** শাসনকালে (১৮৪২-১৮৪৪) ইংরাজ সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ার সিন্ধুদেশের আমীরদের পরাজিত করে ঐ অঞ্চলে ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের পররাষ্ট্রনীতি

লর্ড অকল্যাণ্ড ও প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২)

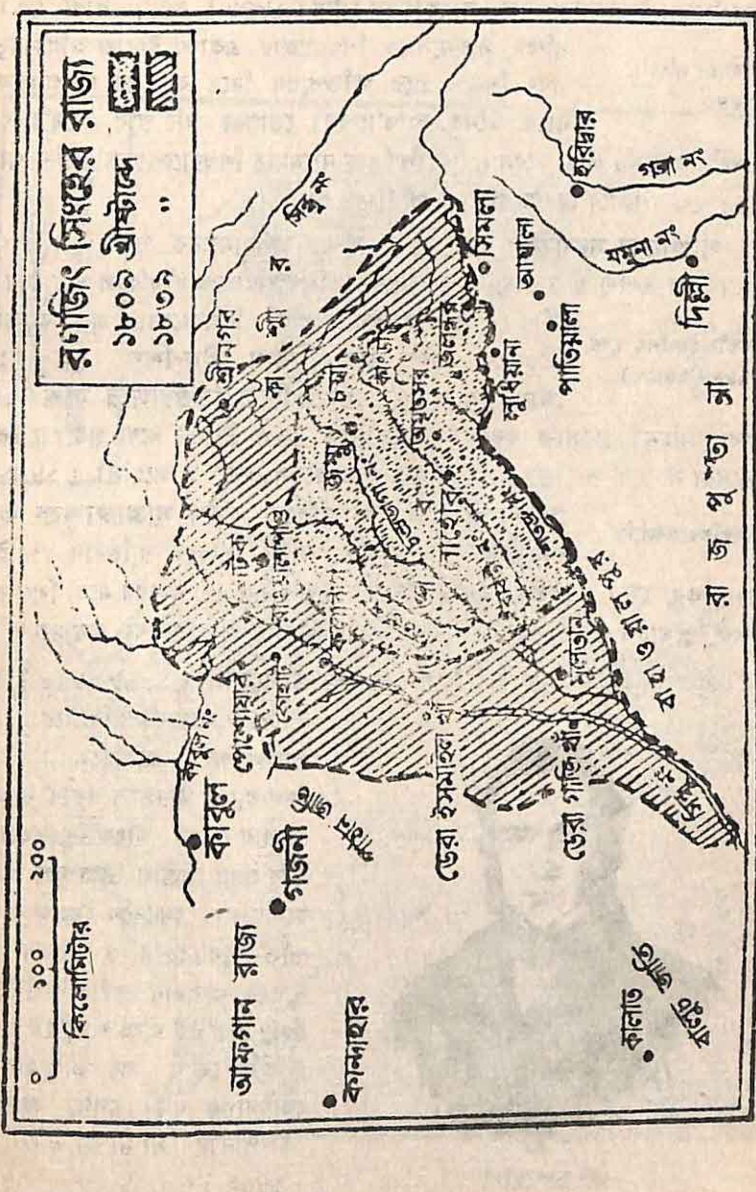
সিন্ধু বিজয় (১৮৪৩)

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। দৈবদুর্ঘটনা ও চক্রান্তে অল্পকালের মধ্যে তাঁর দুই পুত্র ও এক পৌত্র নিহত হন। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে রণজিৎ সিংহের নাবালক পুত্র **দলীপ সিংহ** তাঁর মাতা **রাণী ঝিন্দনের** অভিভাবকত্বে সিংহাসনে বসেন। এই সময় খালসা সৈন্যদল দুর্বল শাসনের সুযোগে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও দুর্বিনীত হয়ে ওঠে। রাজমাতা ঝিন্দন বা অন্য কেউই এই সৈন্যদলকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তাদের ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। শিখরাজ্যের সীমান্তে ইংরাজদের তৎপরতা ইতিমধ্যেই শিখদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-১৮৪৬)



রণজিৎ সিংহ


রণজিৎ সিংহের রাজ্য
১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে
১৮৩৯ ''
কিলোমিটার
0 100 200
আফগান রাজ্য
কাবুল
কান্দাহার
গজনী
পেশোয়ার
ডেরা ইসমাইল খাঁ
ডেরা গাজি খাঁ
লাহোর
অমৃতসর
শ্রীনগর
সিমলা
আম্বালা
পাতিয়ালা
লুধিয়ানা
দিল্লী
হরিদ্বার
গঙ্গা নং
যমুনা নং
সিন্ধু নং
কাবুল নং
রা জ পু তা না
কালাত

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শিখবাহিনী অমৃতসরের সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করে শতদ্রু নদী অতিক্রম করলে **প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ** শুরু হয়। পর পর চারটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শিখরা ইংরাজদের সঙ্গে **লাহোরের সন্ধি** (১৮৪৬) করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির সর্তানুসারে শিখরাজ্যের একাংশ ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয় এবং শিখরা প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। গুলাব সিংহ নামে জনৈক স্বার্থান্বেষী ডোগরা সর্দার প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কাশ্মীর রাজ্যটি লাভ করেন। দলীপ সিংহ নামেমাত্র শিখরাজ্যের অধিপতি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবে ইংরাজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

লাহোরের সন্ধি (১৮৪৬)

পাঞ্জাবের সংযুক্তি : লাহোরের সন্ধির অপমানজনক সর্ত এবং শিখরাজ্যে ইংরাজদের উপস্থিতি ও প্রাধান্য স্বাধীনচেতা শিখদের পক্ষে দীর্ঘকাল সহ্য করা সম্ভব হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই শিখরাজ্যের এক আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে **দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ** (১৮৪৮-১৮৪৯) শুরু হয়। প্রথমে **চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে** (১৮৪৯) ইংরাজবাহিনী জয়লাভ করতে না পারলেও অল্প দিনের মধ্যে **গুজরাটের যুদ্ধে** শিখেরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৯) এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা **পাঞ্জাবকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।** রাজ্যচ্যুত শিখ নৃপতি দলীপ সিংহকে বৃত্তিদান করে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। এইভাবে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর মাত্র দশ বছরের মধ্যে শিখ রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে আর এক বড় অন্তরায় দূর হয়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-১৮৪৯)

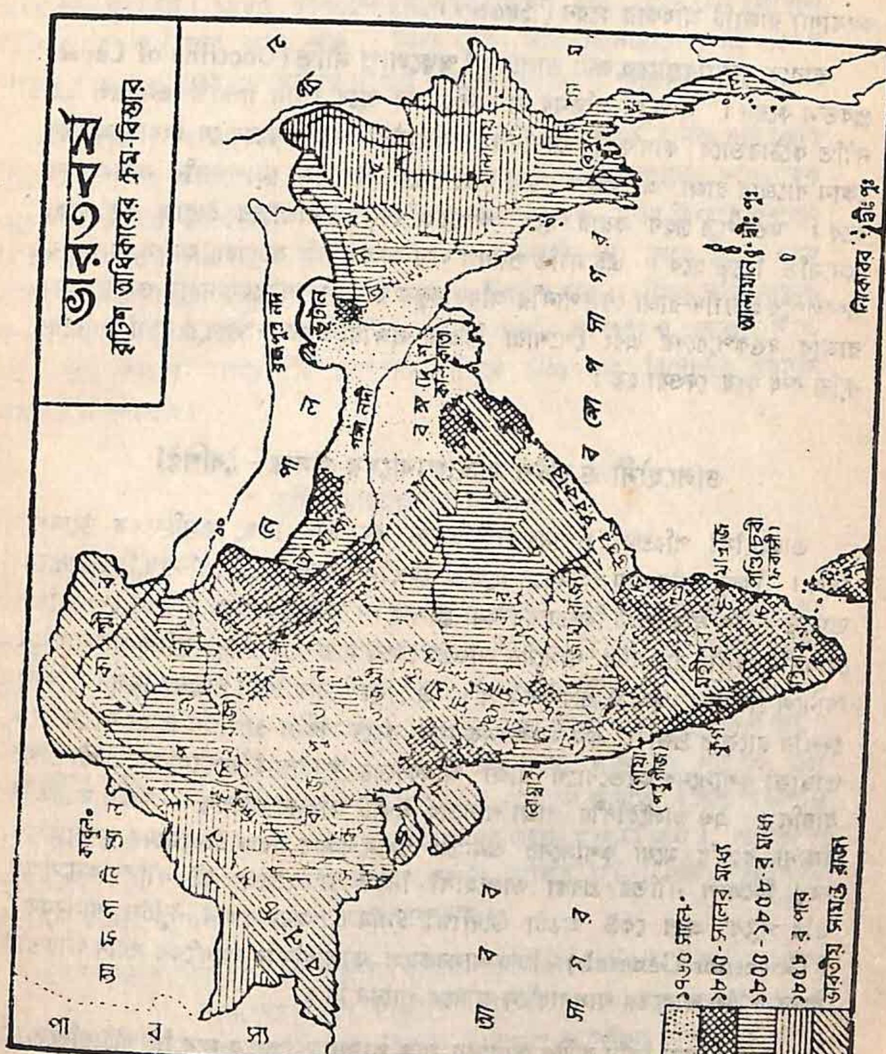
শিখশক্তির অবলুপ্তি

ওয়েলেসলি ও লর্ড হেস্টিংসের মত **লর্ড ডালহৌসী** (১৮৪৮-১৮৫৬) ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে সমগ্র পাঞ্জাব বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয়েছিল। তাঁর সময় **দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ** অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রহ্মদেশে ইংরাজ বণিকদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও একজন ইংরাজ দূতকে অপমান করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে জয়লাভের পর ডালহৌসী এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পেগু প্রদেশটি কোম্পানীর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন (১৮৫২)।



লর্ড ডালহৌসী

দুইজন ইংরাজ কর্মচারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে তিনি সিকিমরাজ্যের


ভারতবর্ষ
ব্রিটিশ অধিকারের ক্রম-বিস্তার
১৭৬৫ সালে
ভারতীয় সামন্ত রাজ্য
কলিকাতা
কাবুল
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর

একাংশ অধিকার করে নেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যের বৃটিশ সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহের জন্য টাকা দিতে না পারায় বেরার প্রদেশটি কোম্পানীকে দিতে বাধ্য হন। কুশাসনের অভিযোগে ডালহৌসী অযোধ্যা রাজ্যটি অধিকার করেন (১৮৫৬)।

বিভিন্নরাজ্য অধিকার

ভারতে রাজ্যবিস্তারের জন্য ডালহৌসী **স্বত্বলোপ নীতি** (Doctrine of Lapse) প্রবর্তন করেন। সম্পূর্ণ অভিনব না হলেও তাঁর পূর্বে কোন গভর্নর-জেনারেল এই নীতি কঠোরভাবে কার্যকরী করেননি। ডালহৌসী ঘোষণা করেন যে ইংরাজ-আশ্রিত কোন রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ঐ রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হবে। দত্তকপুত্র গ্রহণ করার পূর্বে অপুত্রক দেশীয় রাজাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। এই নীতি প্রয়োগ করে ডালহৌসী সাতারা, ঝান্সি, নাগপুর, সম্বলপুর ইত্যাদি রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করেন। কর্ণাটকের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তকপুত্রদের এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ডালহৌসী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার—বৈশিষ্ট্য

ডালহৌসী পরিশ্রমী শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর কিছু জনহিতকর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁর নাম ইতিহাসে মূলতঃ দেশীয় রাজ্যগুলির পূর্ণ-সংযুক্তির মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দায়িত্ব বোধহীন দেশীয় রাজাদের শাসনের আওতা থেকে মুক্ত করে প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসনাধীনে আনলে প্রজাদের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি হবে। এ চিন্তা ধারায় কিছু নতুনত্ব ছিল। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের প্রজারা এটা মঙ্গলজনক মনে করবে কিনা তা তিনি গ্রাহ্য করেন নি। তাছাড়া কুশাসনের অভিযোগে রাজ্য অধিকারের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে বড় একটা দেখা যায়নি। এও ডালহৌসীর রাজ্য শাসনের একটি অভিনব কৌশল। কারণ ভারতীয় রাজন্য বর্গের মধ্যে কুশাসনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইংরাজদের হস্তক্ষেপ। স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রবক্তা ডালহৌসী নিজে না হলেও এই নীতি অনুসরণে তাঁর পূর্বে আর কেউ অতটা উদ্যোগী হননি। অন্য কোন বৃটিশ শাসনকর্তা (Governor General) তাঁদের শাসনকালে ডালহৌসীর অর্ধেকের সমান ভারতীয় রাজ্য বৃটিশ ভারতের শাসনাধীনে আনতে পারেন নি।

যুদ্ধের দ্বারা তিনি বৃটিশ ভারতের সঙ্গে পাঞ্জাব ও পেগুর সংযুক্তি ঘটিয়েছিলেন। তবে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে নতুনত্ব ছিল এই যে প্রচুর জনকল্যাণমূলক সংস্কারের মাধ্যমে বৈষয়িক উন্নতি ঘটিয়ে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।

কতকগুলি রাজ্য ডালহৌসী আদৌ যুদ্ধ না করে শুধু স্বত্ব বিলোপ নীতি ও

কুশাসনের অজুহাতে সরাসরি অধিকার করেছিলেন। ডালহৌসীর শাসন কালে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার চরম পরিণতি লাভ করে।

পরবর্ত্তী কালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পর বৃটিশ বেলুচিস্তান নামে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশ জয়ের ফলে সমগ্র ব্রহ্মদেশে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। কিন্তু বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের এই ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাইরের রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বলপ্রয়োগ ও বিভিন্ন কৌশলের দ্বারা ডালহৌসী ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রাজ্যবিস্তারের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও ডালহৌসীর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরাজ-আশ্রিত দায়িত্বশূন্য দেশীয় রাজাদের শাসনাধীন না থেকে প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ শাসনাধীন হলে ভারতীয় প্রজাদের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিন্তু তাঁর অত্যুগ্র রাজ্যবিস্তার নীতির ফলে ভারতীয় রাজ্যসমূহে গভীর আশঙ্কা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এই কারণে ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাস-নীতিকে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের অন্যতম কারণ মনে করা হয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার

উদ্দেশ্য ঃ

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এলেও সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই ভারতে অবস্থিত কোম্পানীর শাসনকর্ত্তা স্যার জোসায়া চাইল্ড ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের কাছ থেকে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি আদায় করেছিলেন। ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যও চিন্তা করেছিলেন। ১৬৮৭ এবং ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে এবং বোম্বাইয়ে কোম্পানীর নির্দেশ এসেছিল ভারতে বৃটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে ইংরাজদের তৎপর হওয়ার জন্য। মারাঠা ও মুঘলদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ, ইংরাজদের গোপনে লালিত বৃটিশ ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ করে দেয়।

রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা ও রাজস্ব সংগ্রহ

ইংরাজদের রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছার পশ্চাতে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য কাঁচা মাল ও অর্থের প্রয়োজন ছিল। ইংরাজরা বুঝেছিল যে ভারতে বৃটিশ শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে এ দুটির অফুরন্ত সরবরাহ যেমন সম্ভব হবে, তেমনি ইংলন্ডে যন্ত্রে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর বিরাট উদ্বৃত্ত অংশের বিক্রীর জন্য ভারতে বাজারও পাওয়া যাবে। কাজেই ভারতে

ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবে ভারতীয় কাঁচামাল ও বাজারের প্রয়োজনীয়তা

বৃটিশ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ইংরাজদের পরিকল্পিত চেষ্টার ফলশ্রুতি। আসলে ইংরাজদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে বিনা শুল্কে অবাধ একচেটিয়া আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য করে, রাজস্ব সংগ্রহ করে ও ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে বৃটিশ অর্থনীতির উন্নতি সাধন করা। এর জন্য বৃটিশ রাজশক্তির ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা অধিকার করার প্রয়োজন হয়েছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পিছনে পরোক্ষভাবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যও কাজ করেছিল। বৃটেনের খ্রীস্টান মিশনারীরা ক্রমেই খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য উদগ্রীব ও তৎপর হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খ্রীস্টের বাণী ও খ্রীস্টধর্মাবলম্বী দেশের আলোক পেঁছে দেবার ব্রত ও কর্মসূচী তারা গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামরিক তৎপরতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে পার্লামেণ্টে ও পার্লামেণ্টের বাইরেও এই মিশনারীদের প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়েছিল। পরোক্ষভাবে অনেক রাজনৈতিক নীতি ও সিদ্ধান্ত ধর্মীয় উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

খ্রীস্টান মিশনারীদের পরোক্ষ প্রভাব

বৃটিশ জয়লাভের মূল কারণ

ইংরাজদের জয়লাভের অনুকূলে এমন কতকগুলি কারণ ছিল যেগুলি চূড়ান্ত ভাবে যুদ্ধের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

বাংলাদেশের ওপর অধিকার স্থাপন করে বাংলার অজস্র সম্পদ যেমন ইংরাজদের হস্তগত হয়েছিল তেমনি সৈন্যবাহিনীর জন্য রসদ ও সেনা সংগ্রহ তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। এগুলির সরবরাহের জন্য তাদের আর স্বদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়নি।

বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য

সমুদ্রের ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য যে কোন দেশী বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে ইংরাজদের অপরাজেয় করে তুলেছিল। ফরাসীদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতে মারাঠাদের কিছু শক্তি ছাড়া সাফল্যের সঙ্গে ইংরাজদের প্রতিরোধ করার মত অগ্রগণ্য নৌশক্তি ছিল না। ফলে সমুদ্রপথে সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি।

সমুদ্রের ওপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব

নেতৃত্ব ও সেনাপতিত্বের দিক থেকেও ইংরাজদের যোগ্যতা ছিল অনেক বেশী। তাদের সৈন্যদলে দেশীয় সৈন্যের সংখ্যাই ছিল বেশী। কিন্তু সুপরিচালনার গুণে এবং দক্ষ সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা এক সুশৃঙ্খল বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল ও অসীম যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত দৃঢ়চিত্ততা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তারা কঠিনতম পরিস্থিতিও উত্তীর্ণ হয়েছিল।

নেতৃত্ব ও সেনাপতিত্ব

ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সন্দেহ, বিভেদ ও ঈর্ষার জন্য এদেশে ইংরাজদের সম্মিলিত প্রতিরোধের খুব বেশী সম্মুখীন হতে হয়নি। ইংরাজদের দক্ষ কূটনীতি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতীয় দুই মহাশক্তি মহীশূর ও মারাঠাকে এবং নিজামকে বিচ্ছিন্ন রেখে ইংরাজ এককভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল এবং সফলও হয়েছিল।

দেশীয় রাজাদের মধ্যে অনৈক্য

ইংরাজ কূটনীতি

এছাড়া ভাগ্যেরও কিছু কিছু ভূমিকা ছিল। হায়দারের আকস্মিক মৃত্যু, ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতা ইত্যাদি এমন অনেক ঘটনা ভারতে ইংরাজদের জয়কে সুনিশ্চিত করেছিল। অবশ্য এই জয়ের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলেসলি ও ডালহৌসীর মত কয়েকজন দক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মুখ্য ভূমিকা ছিল।

ভাগ্যের সহায়তা

গভর্নর জেনারেলদের মুখ্য ভূমিকা

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎপত্তি

প্রকৃতি ঃ ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের পর কলিকাতা কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ **মীরজাফরকে** আবার বাংলার মসনদে ফিরিয়ে আনেন। মীরজাফর মহারাজা **নন্দকুমারের** সহায়তায় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করতে থাকেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা নন্দকুমারের কার্যকলাপ পছন্দ করতেন না। মীরজাফরের মৃত্যু হলে কোম্পানী মৃত নবাবের বালকপুত্র **নজম্-উদ্‌দৌলাকে** সিংহাসনে বসায় এবং নজমউদ্দৌলার সঙ্গে এক সন্ধির (ফেব্রুয়ারী ১৭৬৫) বলে কোম্পানীর মনোনীত নায়েব দেওয়ানের মাধ্যমে শাসন পরিচালনার বা নিজামত পরিচালনার ক্ষমতা করায়ত্ত করে। কোম্পানীর অনুমতি ভিন্ন নায়েব দেওয়ানকে বরখাস্ত না করা সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল। এই সন্ধির সুযোগ গ্রহণ করে, কোম্পানী নন্দকুমারকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করে **রেজা খাঁকে** নিযুক্ত করে। বিহারের দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত হন **সিতাব রায়।**

মীরজাফর

নজমউদ্দৌলার সঙ্গে চুক্তি

বাংলার দেওয়ানী লাভ ঃ কোম্পানীর নতুন আদেশ অনুসারে মুঘল বাদশাহের কাছ থেকে বাংলার নবাবের সনদ প্রার্থনা করার অধিকার লোপ করা হয়। ফলে বাদশাহী সনদের অভাবে নবাব আইনতঃ কোম্পানীর অধীনস্থ হয়ে পড়েন এবং কোম্পানী মসনদের পশ্চাতে প্রকৃত শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। ইতিমধ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের

নবাবের সনদ প্রার্থনা করার অধিকার লোপ

মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দেয়। তারা বিনাশুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে থাকে। এই দুর্নীতি ও অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ **ক্লাইভকে** দ্বিতীয় বার গভর্নর (১৭৬৫-১৭৬৭) নিযুক্ত করে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। ক্লাইভ বুঝতে পারেন যে বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানী যে সব ক্ষমতা প্রয়োগ করছিল তার কোন বৈধ ভিত্তি ছিল না। কারণ মুঘল সম্রাট আইনতঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অধিকার বলে তিনিই বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করতে পারেন। বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে ক্লাইভ **এলাহাবাদের দ্বিতীয় সন্ধি** করেন (১৭৬৫ খ্রীঃ) এবং **বাংলার দেওয়ানী লাভ করেন**। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকারের বিনিময়ে কোম্পানী বাদশাহকে বাৎসরিক **২৬** লক্ষ টাকা এবং বাংলার নবাবের রাজস্ব আদায়ের অধিকার বর্জনের পরিবর্তে ৫৩ লক্ষ টাকা তাঁর সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবে এবং উদ্বৃত্ত সমগ্র রাজস্ব কোম্পানীর প্রাপ্য হবে। এছাড়াও কোম্পানী অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে **এলাহাবাদের প্রথম সন্ধি** (১৭৬৪) স্বাক্ষর করেন যার শর্ত অনুসারে নবাব কোম্পানীকে কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ অর্পণ করেন এবং বক্সারের যুদ্ধের দরুণ ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হন। উভয় শক্তির **মধ্যে আত্মরক্ষামূলক মিত্রতা স্থাপিত হয়**।

দুর্নীতি ও বিনাশুল্কে কর্মচারীদের ব্যবসা

ক্লাইভের সংস্কার

দেওয়ানী লাভ

অযোধ্যার সঙ্গে সন্ধি

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ঃ কোম্পানীকে দেওয়ানী দান করে মুঘল সম্রাট যে ফরমান জারী করেছিলেন (১২ই আগস্ট ১৭৬৫), তার ফলে কোন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। একটি বাস্তব অবস্থা আইন সিদ্ধ করা হয়েছিল মাত্র।

দেওয়ানী লাভের পর রাজ্যের প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হলেও, শাসনের দায়িত্ব থাকে অক্ষম মর্যাদাহীন নবাবের ওপর। অর্থাৎ এক বিরাট অঞ্চলের প্রভুত্ব লাভ করলেও শাসকের কোন দায়দায়িত্ব গ্রহণে কোম্পানী অনিচ্ছুক ছিল। অন্যদিকে নবাবের কোন মর্যাদা ও ক্ষমতা না থাকলেও রাজ্যশাসনের গুরু দায়িত্ব ছিল তাঁর। ক্লাইভ প্রবর্তিত এই **দ্বৈত শাসন** (Dual Government) ব্যবস্থা অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আইনতঃ বাংলার **দেওয়ান** রূপে এবং **নবাব নাজিম** অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান রূপে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। এই ব্যবস্থায় কোম্পানীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকলেও তাদের রাজ্য শাসনের কোন দায়িত্ব ছিল না। অন্যদিকে **রাজ্যশাসনের সকল দায়িত্ব নবাবের ওপর ন্যস্ত হলেও তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না**। নবাবের নামের অন্তরালে কোম্পানীই আসলে সব কিছু ক্ষমতার অধিকারী ছিল বলে এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাকে 'Masked System' (মুখোশ বা ছদ্মবেশ) বলা হয়।

ক্লাইভ কর্তৃক দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন

নবাবের শাসন কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত প্রশাসন যন্ত্র অর্থাৎ পুলিশ, সেনা নবাবের হাতে না থাকায় আইন-শৃঙ্খলা লুপ্ত হয়। সম্রাটের সঙ্গে চুক্তির ফলে কোম্পানীর ক্ষমতা আইনগত ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়। অপরদিকে বাংলার নবাবের প্রকৃত ক্ষমতা একেবারে লোপ করা হয়। ইংরাজ কোম্পানী নবাবের অধীনে কাজ করছে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করে দেশীয় রাজাদের মন থেকে ইংরাজ আগ্রাসন ভীতি দূর করার চেষ্টা করে। তবে দেওয়ানী লাভের পর থেকে বাংলাদেশের জনসাধারণের ওপর শোষণ বৃদ্ধি পায়। বাংলার অর্থসম্পদ ইংলণ্ডে চলে যেতে থাকে। ইংলণ্ডে কোম্পানীর আর্থিক দাবী পূরণের জন্য বাড়তি টাকা কোম্পানী বাংলার জনসাধারণকে শোষণ করে আদায় করতে থাকে। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য চাষের জমিগুলিকে চড়া হারে বছর বছর নীলামে ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইজারাদাররা ইচ্ছামত কর আদায় করতে থাকে। এর সঙ্গে ছিল ইংরাজ কর্মচারী ও ইংরাজ বণিকদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য।

দেওয়ানী ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলাফল

বাংলায় শোষণ

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কুফল

শাসনতান্ত্রিক ও রাজস্ব বিভাগীয় চরম অব্যবস্থা ও দৈব দুর্বিপাকের পরিণতি রূপে দেখা দেয় **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর** বা ভীষণ দুর্ভিক্ষ (ইং ১৭৭০/১১৭৬ বঙ্গাব্দ)। বাংলার মোট জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ মারা যায়। কিন্তু এই সংকটের মধ্যেও প্রজা উৎপীড়ন করে রাজস্ব আদায় এতটুকুও কমেনি বরং ১৭৭১ সালে আগের আগের বছরের তুলনায় বেশী কর সংগৃহীত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের ফলে আইন শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ে, জনসাধারণের নৈতিক মান, সমাজ জীবন, রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থার কাঠামো ধ্বসে পড়ে।

'৭৬-এর মন্বন্তর

আইন শৃঙ্খলার অবনতি

দ্বৈত শাসন প্রসূত শোচনীয় অরাজকতা ও অব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন **ওয়ারেন হেস্টিংস** (১৭৭২-১৭৮৫)।

কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাতঃ (হেস্টিংস থেকে কর্নওয়ালিস)

ওয়ারেন হেস্টিংস কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। রাজস্ব ও বিচার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন, কলকাতায় প্রধান বিচারালয়গুলি প্রতিষ্ঠা ও কোষাগার স্থাপন করে তিনি কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৮৫)

তিনি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রদ করে প্রত্যক্ষভাবে শাসন ভার গ্রহণ করেন। রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত করে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য **কালেক্টার** নামে ইংরাজ রাজকর্মচারীদের নিযুক্ত করেন।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত

কালেক্টার
রাজস্ব সংস্কার
কোষাগার স্থানান্তরিত

রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা তদারকি করার জন্য একটি **রেভিনিউ বোর্ড** স্থাপন করেন। জমিদারদের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদী বন্দোবস্ত করার জন্য ঐ বোর্ডের অধীনে একটি **ভ্রাম্যমান কমিটি** (Committee of Circuit) গঠন করেন। রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

বিচার
বিভাগীয় সংস্কার
সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত

হেস্টিংস বিচার ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেন। বিচার ব্যবস্থায় এই কেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিফলিত হয়। প্রতিটি জেলায় একটি দেওয়ানী আদালত ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপন করে দেওয়ানী বিচারের ভার কালেক্টারের ওপর এবং ফৌজদারী বিচারের ভার দেশীয় বিচারকের ওপর অর্পণ করা হয়। মফঃস্বল আদালতের আপীল বিচারের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত স্থাপন করা হয়। **এই ভাবে রাজস্ব ও বিচার ববস্থার সংস্কার করে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশে বৃটিশ শাসন** ব্যবস্থা সুসংবদ্ধ ও উন্নত করেন।

পুলিশ

হেস্টিংস সর্বপ্রথম আইনের শাসন প্রচলনের চেষ্টা করেন। হেস্টিংসের আমলে গ্রামাঞ্চলে কোম্পানীর থানা ও পুলিশ ছিল না। এই জন্য শান্তিরক্ষার্থে তিনি জমিদারদের ওপর নির্ভর করতেন। কিছু সংখ্যক ফৌজদার ও থানাদার তিনি নিয়োগ করেন কিন্তু এই ব্যবস্থা সফল হয়নি।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট (১৭৭৩)

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে **রেগুলেটিং অ্যাক্ট** দ্বারা বাংলার গভর্নরের পদকে গভর্নর জেনারেলের পদে উন্নীত করা হয় এবং চার সদস্য বিশিষ্ট এক **কাউন্সিলের** ওপর বাংলার **শাসন**ভার অর্পণ করা হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকে অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কলিকাতাস্থ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়।

পিটের ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪)

কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। কার্যকরী হওয়ার অলপকালের মধ্যে রেগুলেটিং অ্যাকটের বহু ত্রুটি ধরা পড়ে এবং কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার নানাবিধ অসুবিধা ও সমস্যা দেখা দেয়। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট **ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট** নামে একটি নতুন আইন পার্লামেণ্টে পাস করান। এই আইন অনুসারে ছ'জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি নবগঠিত 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল'-এর ওপর ভারতে ইংরাজ সরকারের সামরিক ও অসামরিক কর্তৃত্ব ও নীতি নির্ধারণের ভার দেওয়া হয়। যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যাপারে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সরকার বাংলার গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। কোম্পানীর ডিরেক্টর ও অংশীদারদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)

হেস্টিংসের পদত্যাগের পর এক বৎসরের জন্য স্যার জন ম্যাক্‌ফারসন অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হিসাবে কাজ করেন। তাঁর পর ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে **লর্ড কর্নওয়ালিস** গভর্নর জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করেন।

দায়িত্ব ও লক্ষ্য

ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার সত্ত্বেও কোম্পানীর শাসন পদ্ধতি বিশৃংখলা মুক্ত হয়নি। লর্ড কর্নওয়ালিসের (১৭৮৬-১৭৯৩) প্রধান দায়িত্ব ছিল শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন। তাঁর সংস্কারাদির প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতের শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সিভিল সার্ভিস

কর্নওয়ালিস কোড

ভারতীয়দের সম্পর্কে ধারণা

বস্তুতঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ের শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণের নীতি কর্নওয়ালিস আরও বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করেছিলেন। ভারতীয় অসামরিক শাসন ব্যবস্থাকে আরও কেন্দ্রীভূত করার জন্য তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্য স্থাপন করেন। তিনি যে সব নিয়ম কানুন প্রচলিত করেন সেগুলি '**কর্নওয়ালিস কোড**' নামে পরিচিত। কর্নওয়ালিস ভারতীয়দের চরিত্র ও সততা সম্পর্কে অত্যন্ত নিম্নধারণা পোষণ করতেন। এই কারণে তিনি তাদের কোন মর্যাদাপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন নি।

জেলা শাসন, ডিস্ট্রিক্ট জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টার

প্রাদেশিক আদালত

জেলার শাসন ব্যবস্থায় তিনি পরিবর্তন সাধন করেন। প্রতিজেলায় একজন জজ্ ও ম্যাজিস্ট্রেট (District Judge and Magistrate) এবং একজন কালেক্টার নিযুক্ত করেন। বিচার ও শান্তি রক্ষার ভার থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর এবং কালেক্টার রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বে থাকেন। নিম্ন আদালত থেকে আপীলের বিচারের জন্য চারটি প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করা হয় এবং প্রত্যেক প্রাদেশিক আদালতে তিনজন ইংরাজ বিচারক নিযুক্ত হন। এই বিচারকরা নিজেদের এলাকায় ঘুরে ঘুরে ফৌজদারী বিচার করতেন। বিচার কার্যে তাঁরা এদেশীয় হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ কর্মচারীদের সাহায্য নিতেন। কর্নওয়ালিস সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের অধীনে আনেন। নবাবের ক্ষমতা লুপ্ত হয়।

পুলিশ ব্যবস্থা

দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা সুরক্ষিত করার জন্য গ্রামাঞ্চলে থানা পুলিশ ব্যবস্থার উন্নতি করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

কর্নওয়ালিসের শাসন ব্যবস্থার সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন (১৭৯৩)**। এই ব্যবস্থা অনুসারে স্থির হয় যে জমিদার বংশানুক্রমিকভাবে জমির মালিক

থাকবেন এবং তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানীকে প্রদান করতে হবে। রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মত নির্ধারিত হবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জমিদার যদি তাঁর দেয় রাজস্ব জমা দিতে না পারেন তাহলে তাঁর জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদাররা অর্থাৎ যাঁরা এতদিন প্রকৃতপক্ষে রাজস্ব সংগ্রহকারীর কাজ করছিলেন, তাঁরা জমির স্থায়ী মালিকে পরিণত হলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ গুণ নিয়ে বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত এই ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সুদূর প্রসারী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মতভেদ নেই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ, ত্রুটিগুলির জন্য মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত রায়ত বা প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় ঐসব দোষ, ত্রুটি দূর করার জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

নূতন বিচার ও পুলিশ প্রশাসন সংগঠন ঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই নতুন বিচার ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। মোগল আমলের ধাঁচটিকে সম্পূর্ণ বর্জন না করলেও সুনির্দিষ্ট এক্তিয়ার ভুক্ত বিভিন্ন স্তরের আদালত প্রতিষ্ঠা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় নতুনত্ব এনেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতিটি জেলায় একটি **দেওয়ানী আদালত** ও একটি **ফৌজদারী আদালত** স্থাপন করেন। দেওয়ানী বিচারের ভার কালেক্টার (Collector)-দের ওপর এবং ফৌজদারী বিচারের ভার দেওয়া হয় দেশীয় বিচারকদের ওপর। কালেক্টররা ছিলেন রাজস্ব সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্মচারী। ফৌজদারী আদালতে কালেক্টারের উপস্থিতিতে মুসলমান বিচারকরা ইসলামের আইন অনুসারে দণ্ডদান করবেন বলে স্থির হয়। জেলা আদালতের আপীল বিচারের জন্য কলকাতায় **সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে** দু'টি উচ্চ আদালত স্থাপন করা হয়। সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তি করতেন গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের দু'জন সদস্য। সদর নিজামত আদালতের প্রধান ছিলেন বাংলার নবাব কর্তৃক নিযুক্ত একজন বিচারপতি। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। হেস্টিংস প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থায় ফৌজদারী বিচারের ভার দেশীয় বিচারপতিদের ওপর ন্যস্ত থাকলেও সমগ্র বিচার ব্যবস্থা কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়েছিল।

নতুনত্ব

জেলায় বিচার ব্যবস্থা

সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত

হেস্টিংসের বিচার ব্যবস্থায় যে সব বিষয়ের সুস্পষ্ট অগ্রগতি লক্ষ করা যায় সেগুলি হল **আদালতগুলির পারস্পরিক এক্তিয়ারে নির্দিষ্টকরণ, বিচার পদ্ধতির পরিবর্তন** এবং **আদালতের নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা।**

অগ্রগতি

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের পর বিচার বিষয়ক সংস্কার শুরু হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি নিয়ে কলকাতায় একটি **সুপ্রীম কোর্ট** স্থাপিত হয় (১৭৭৪ খ্রীঃ)। এছাড়া মাদ্রাজে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে এবং বোম্বাইতে ১৮২৩-এ। গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস ও তাঁর পরিষদ এবং সুপ্রীম কোর্টের পারস্পরিক এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের আইনে গভর্নর জেনারেল ও তাঁর পরিষদের সদস্যরা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ও সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে ঘোষিত হয়।

সুপ্রীম কোর্ট

১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের আইন

বিচার ব্যবস্থার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হয়েছিল লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় (১৭৮৬-১৭৯৩)। তিনি রাজস্ব ও বিচার বিভাগকে পৃথক করেন। প্রতি জেলায় একজন ইংরাজ জজের অধীনে জেলা আদালত স্থাপন করা হয়। নিম্ন আদালত থেকে আপীল বিচারের জন্য চারটি প্রাদেশিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রত্যেক প্রাদেশিক আদালতে তিনজন ইংরাজ বিচারক নিযুক্ত হন। এঁরা ছিলেন ভ্রাম্যমান বিচারক। এঁরা নিজেদের এলাকায় ঘুরে ঘুরে ফৌজদারী বিচার করতেন। হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ কর্মচারীরা বিচারকার্যে তাঁদের সাহায্য করতেন। এদেশে ফৌজদারী মামলা বিচারের **সর্বোচ্চ আদালত হয় সদর দেওয়ানী আদালত**। কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ইংলণ্ডের সম্রাট ও তাঁর পরিষদের কাছে আবেদন করাও যেত।

রাজস্ব ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ

চারটি প্রাদেশিক আদালত

কর্নওয়ালিস সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং নবাবের ক্ষমতা লুপ্ত করে এই আদালতকে সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের অধীনে আনা হয়। খুব ছোটখাট মামলার বিচার করার ক্ষমতা ভারতীয় মুন্সেফ ও সদর আমীনদের দেওয়া হয়। কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত বিচার সংস্কার ব্রিটিশ ভারতের বিচার ব্যবস্থার মূল কাঠামোটি স্থাপন করে।

মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সদর নিজামত আদালত স্থানান্তরকরণ

কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত শাসন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারগুলি সংকলিত হয়ে **কর্নওয়ালিস কোড নামে** লিপিবদ্ধ হয় (মে ১৭৯৩)। অতীতের বিশৃঙ্খলা ও অরাজক অবস্থার পুনরাবৃত্তি রোধ করা এবং সুশাসন-ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করাই ছিল এই কোডের উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে কর্নওয়ালিস কোড একটি অনমনীয় নিয়ম-বিধিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার ফলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কার্যকরী করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল।

রুল অফ ল

কর্নওয়ালিস বৃটিশ ভারতে **আইনের শাসন** (Rule of Law) নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের রাজকার্যে নিয়োগের ব্যাপারে অনুদার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেন নি।

লর্ড হেস্টিংস বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংশোধন

পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস বা আর্ল অফ ময়রা (১৮১৩-২৩) কর্নওয়ালিসের শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ব্যবস্থার সংশোধন করেন, কারণ ঐ ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকর করার অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। কালেক্টররা পুনরায় বিচার ক্ষমতা ফিরে পায়। জমিদারদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য কতকগুলি আইন চালু করা হয়।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকাল (১৮২৮-১৮৩৫) নানাবিধ সংস্কারের জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বেণ্টিংকের বিচার বিভাগীয় সংস্কারগুলির উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে বিচারকার্য নিষ্পন্ন করা।

বিচার বিভাগীয় সংশোধনের ক্রমবিকাশ

ইতিমধ্যে ১৭৯৩ থেকে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন হয়েছিল। ওয়েলেস্‌লি সদর দেওয়ানী আদালতকে সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব মুক্ত করে তিনজন বিচারপতি নিয়োগ করেন। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে স্থির হয় সদর দেওয়ানী আদালতে একজন প্রধান বিচারপতি থাকবেন এবং প্রয়োজন মত সাধারণ বিচারপতি নিয়োগ করবেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সনন্দ আইন পাস করার সময় বোর্ড-অফ-কণ্ট্রোল প্রস্তাব করেন যে ছোটখাট মামলার নিষ্পত্তির জন্য প্রাচীন পঞ্চায়েত প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করা আবশ্যক, কেননা তাহলে ইংরাজ বিচারপতিদের অধীনে আদালতগুলির ওপর চাপ কমবে।

বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ১৭৯৩-১৮২৮

বোম্বাই ও মাদ্রাজের সরকার এই প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু বাংলাদেশে লর্ড হেস্টিংস অধিক সংখ্যক নিম্ন পদস্থ ভারতীয় বিচারক নিয়োগ করে এবং তাদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। কর্নওয়ালিস বিচার এবং রাজস্ব ব্যবস্থা পৃথকীকরণের যে নীতি চালু করেছিলেন তাতে খুব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সব কটি প্রেসিডেন্সিতেই ক্রমে ক্রমে কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট পদে একই ব্যক্তি নিযুক্ত হবার প্রথা চালু হয়।

বেণ্টিংক, কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত প্রাদেশিক আপীল আদালত ও ভ্রামামাণ আদালতগুলি তুলে দেন। জেলার কালেক্টরদের ওপর ফৌজদারী বিচারের ভার দেওয়া হয়। কতকগুলি জেলা নিয়ে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগের ভার একজন কমিশনারের ওপর দেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টররা কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন হন।

বেণ্টিংকের বিচার-বিভাগীয় সংস্কার

আদালতে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে দেশী ভাষার ব্যবহার **প্রবর্তিত** হয়। দেশীয় বিচারপতিদের বেতন, ক্ষমতা ও মর্যাদা তিনি বৃদ্ধি করেন। আদালতে বকেয়া মামলার সংখ্যা কমে গিয়েছিল, বিচারের মান উন্নত হয়েছিল ও বিচারপ্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভ হয়েছিল। আইন বিধি সংকলনের প্রথম পর্যায়ের পর ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের **হাইকোর্টস এ্যাক্ট** অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট ও সদর কোর্টগুলির এক্তিয়ারের ক্ষেত্র সংযুক্ত করে বিচার-পদ্ধতিতে অভিন্নতা আনা হয়েছিল এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়েছিল।

হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা

পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা

কর্নওয়ালিস বৃটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থায় **নতুন পুলিশ বিভাগ পত্তন করেন।** পূর্বে জমিদাররাই গ্রামাঞ্চলে শান্তি রক্ষা করতেন। কর্নওয়ালিস তার পরিবর্তে জেলায় জেলায় থানা স্থাপন করেন। থানাগুলি 'দারোগা'দের অধীন করা হয়। জেলায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় থানাগুলিকে। দারোগারা জেলা শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। কলকাতার জন্য একজন পুলিশ কমিশনার নিযুক্ত হন। কর্নওয়ালিসের শাসনকালে প্রত্যেক জেলায় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট (District Judge and Magistrate) এবং কালেক্টর এই দুজন কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিল। রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় জেলা-শাসন পদ্ধতি।

কর্নওয়ালিস
থানা
দারোগা
পুলিশ কমিশনার

কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা (পুলিশ-ব্যবস্থা) বিশেষ সফল হয়নি। দেশে খুন, জখম, লুঠতরাজ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা আশঙ্কাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দারোগাদের ব্যর্থতা ও দুর্নীতি এর জন্য মুখ্যত দায়ী ছিল। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে একজন করে সুপারিনটেনডেণ্ট অফ পুলিশ নিযুক্ত করা হয়। অপরাধীদের ধরার জন্য গোয়েন্দার সাহায্য নেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়। গোয়েন্দাদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করায় এই প্রচেষ্টাও বিশেষ কার্যকরী হয়নি।

সুপারিনটেনডেণ্ট অফ পুলিশ
গোয়েন্দা

বেন্টিঙ্কের শাসনকালে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে সুপারিনটেনডেণ্টের পদ লুপ্ত করা হয়। কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটই পুলিশ বিভাগের তত্ত্বাবধানের কাজ করতেন। প্রতি ডিভিসনের কমিশনারই সুপারিনটেনডেণ্টের কাজ করবেন বলে স্থির হয়। কিন্তু এত পরিবর্তন সত্ত্বেও পুলিশ বিভাগের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে চৌকিদারী বা স্থানীয় পুলিশ আইন পাশ হয়। এর ফলে বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে স্থানীয় পুলিশ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

সুপারের পদ লোপ
চৌকিদারী ব্যবস্থা

কারাগার সংস্কার

কারাগারগুলির অমানুষিক অবস্থা দূর করার জন্য প্রথম একটি কমিটি গঠিত হয় ; কিন্তু কারা উন্নতির জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ১৮৫৫ সালে সর্বপ্রথম একজন কারাগার পরিদর্শক নিযুক্ত হন এবং কারাগারগুলির সংস্কার সম্বন্ধেও কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

ভূমি রাজস্ব থেকে বর্ধিত আয়ের প্রয়োজনীয়তা—এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা—ফলাফল

ওয়ারেন হেস্টিংসের পাঁচসালা বন্দোবস্ত

এক বছরের বন্দোবস্ত

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসাবাণিজ্য, প্রশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। ভূমি রাজস্ব ছিল আয়ের প্রধান উৎস। সেই জন্য ভূমি রাজস্ব থেকে আয় বৃদ্ধির জন্য কোম্পানীর শাসনে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বোচ্চ নিলামে পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারদের সঙ্গে জমির **পাঁচসালা বন্দোবস্ত করেন।** ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে পাঁচ বছরের পরিবর্তে **এক বছর মেয়াদী ব্যবস্থা** চালু করা হয়। এক বছর মেয়াদী ব্যবস্থার কুফল দেখা দিলে অনেক অনুসন্ধান ও আলোচনার পর ১৭৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দে **দশ বছর মেয়াদী** বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। দশ বছর মেয়াদী ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা হবে কিনা এই নিয়ে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্য স্যার জন শোরের সঙ্গে মত পার্থক্য দেখা দিলে ইংলণ্ডের বোর্ড অফ কণ্ট্রোল কর্নওয়ালিসের মত সমর্থন করেন। কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ দশ বছর মেয়াদী ব্যবস্থাকে **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করেন।** এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যাঁরা রাজস্ব সংগ্রহ করতেন তাঁদের রাজস্বের হার নির্দিষ্ট হল এবং তাঁরাই জমির স্থায়ী মালিক হলেন। স্থির হল, যতদিন জমিদাররা এই নির্দিষ্ট রাজস্ব সরকারকে দেবেন ততদিন তাঁরা নির্বিঘ্নে জমিদারী ভোগ করতে পারবেন।

কর্নওয়ালিসের দশ বছরের বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল
(১) নির্দিষ্ট রাজস্ব
(২) বাৎসরিক বাজেট তৈরীর সুবিধা
৩) অনুগত শ্রেণী

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে রাজস্বের পরিমাণ এবং আদায় ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয় এবং অনিশ্চয়তা দূর হয়। রাজস্বের পরিমাণ পূর্ব নিরূপিত হওয়ায় সরকারের পক্ষে আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে কোম্পানীর অনুগ্রহ পুষ্ট জমিদারেরা এদেশে বৃটিশ শাসনের সমর্থক শ্রেণীতে পরিণত হন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কর্নওয়ালিস ও অন্যান্যদের আশানুযায়ী কৃষক উৎপীড়ন বন্ধ হয়নি বা জমিদাররা নিশ্চিন্ত হয়ে জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও কৃষক কল্যাণের ব্যাপারে মনোযোগী হন নি। আবার জমিদারীর খাজনা নির্দিষ্ট থাকাতে জমির মূল্য এবং আয় বৃদ্ধি হলেও সরকারের আর আয় বৃদ্ধি হয়নি।

কুফল
(১) উৎপীড়ন
(২) জমিদারী লোপ

অনেক জমিদার নির্দিষ্ট দিনে খাজনা না দিতে পারায় জমিদারী হারিয়েছিলেন। আর এই বন্দোবস্তে কৃষকদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। প্রজারা সম্পূর্ণ জমিদারের মর্জি ও করুণার ওপর নির্ভরশীল ছিল। সমস্ত ব্যবস্থা জমিদার ও কোম্পানীর স্বার্থে করা হয়েছিল। বহু জমিদার জমিদারীতে কখনও না গিয়ে শহরেই জমিদারীর অর্থ ব্যয় করতেন। প্রজাদের প্রতি দায়-দায়িত্ব পালনে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর এক কুপ্রথা ছিল **পত্তনী প্রথার সূত্রপাত**। নানা কারণে রাজস্ব আদায়ের অসুবিধার জন্য জমিদারেরা নিজেদের জমিদারীকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অন্য লোকদের কাছে বিক্রয় করতেন এবং তাঁরা আবার দূর পাটনিদারদের কাছে বিক্রী করতেন। পাটনি প্রথার ফলে প্রজা শোষণ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

(৩) প্রজাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি
জমিদারদের নিজস্ব জমিদারীতে অনুপস্থিতি
(৫) পাটনি প্রথার কুফল

জমিদারী প্রথা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) প্রবর্তনের ফলে একদল অলস বিলাসী বিত্তবানের সৃষ্টি হয়েছিল, জমিদারদের মধ্যে মামলা বেড়ে গিয়েছিল এবং একদল ব্যবহারজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। কালক্রমে এই ব্যবহারজীবীরা ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

(৬) ব্যবহারজীবিদের উদ্ভব ও রাজনৈতিক ভূমিকা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, বারাণসী এবং মাদ্রাজের উত্তরাংশের কিছু এলাকায় প্রচলিত হয়। কিন্তু পাঞ্জাব, দিল্লী এবং বর্তমানের উত্তর ও মধ্য প্রদেশের কিছু অঞ্চলে গ্রামের সমষ্টি বা মহল অর্থাৎ গ্রামের প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে **মহল ওয়ারি** বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্বের হার নির্ণয় করা হত।

মহল ওয়ারি ব্যবস্থা

মাদ্রাজের **রায়ত ওয়ারি** বন্দোবস্তের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী কিন্তু অস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। এই ব্যবস্থায় জমিদার বা মধ্যবর্তী কোন লোকের স্থান ছিল না। জমির ওপর রায়তের মালিকানা স্বত্ব ছিল না কিন্তু ভোগ দখলের স্বত্ব ছিল। এই অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য এবং হস্তান্তর যোগ্য ছিল। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে রায়ত ওয়ারি বন্দোবস্তের পূর্ণ বিকাশ হয়নি।

রায়তওয়ারি ব্যবস্থা

বোম্বাইতে গভর্নর এলফিনস্টোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং রায়ত ওয়ারি বন্দোবস্তের সংমিশ্রণের চেষ্টা করেন। জেলা ভিত্তিতে গ্রামের প্রধানরা জমির উর্বরতা, শস্যের মূল্য ইত্যাদি অনুসারে এই খাজনা আনুপাতিক হারে প্রজাদের মধ্যে ভাগ করে দেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাও বিশেষ সফল হয়নি।

বোম্বাইতে মিশ্র ব্যবস্থা

এই সব নতুন ব্যবস্থায় রায়তরা উপকৃত হয়নি। জমি হয়ে উঠল বিক্রয়, বন্ধক এবং হস্তান্তর যোগ্য। জমি তখন থেকে পণ্যে পরিণত হয়েছিল প্রধানতঃ রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে। ফলে গ্রাম্য সমাজের কাঠামো প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত হল।

গ্রাম্য সমাজ কাঠামোতে আঘাত

সপ্তম অধ্যায়

শিল্প ও বাণিজ্য : ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার এবং কতকগুলি দেশীয় শিল্পের অবক্ষয়

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসার

অষ্টাদশ শতকে ইংলন্ডের এক চেটিয়া বাণিজ্য ও ভারতের বাণিজ্যের অবক্ষয়

সপ্তদশ শতাব্দীতে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের তুলনা মূলক হিসাব (Balance of trade) ভারতের অনুকূলে ছিল। ভারত পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর বিনিময়ে বহু সোনা, রূপা সংগ্রহ করতে পেরেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা কারণে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংলন্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য, ইংলন্ডের পক্ষে একচেটিয়া বাণিজ্যে পরিণত হয়। **১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ এই এক চেটিয়া বাণিজ্যের জায়গায় অবাধ বাণিজ্য স্থাপন** করে।

অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়া

অবাধ বাণিজ্যকারীদের কাজকর্মের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামো পরিবর্তিত হয়। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ভারতবর্ষে কোম্পানীর মোট বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস এবং অবাধ বাণিজ্যে লিপ্ত অন্যান্য বণিকদের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃটেনের শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পায় যে ভারতবর্ষ উত্তরোত্তর কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্র, এবং বৃটেনের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারীদের বাজারে পরিণত হয়। ১৮১৪ থেকে ১৮১৮ খ্রীঃ এর মধ্যে ইংলন্ড থেকে আমদানি পণ্যের মধ্যে ধাতু, পশম, সূতী দ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে যায়। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে আমদানী শুল্ক কমিয়ে বৃটিশ আমদানিতে সাহায্য করা হয়। রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদের কিছু অসুবিধে দেখা দেয় কারণ টাকার মূল্যমান কমে যায়। এতে ভারত-বৃটেন বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। ইংলন্ডের বাণিজ্যে মন্দা চলার জন্য ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়।

১৮৩০ এর পর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

১৮৩০ এর পর বাণিজ্য নীতিতে তিনটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়। বাংলায় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর শুল্ক তুলে দেওয়া হয় (১৮৩৫ খ্রীঃ)। এরপর অন্য দুটি প্রেসিডেন্সীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য শুল্কের নূতন হার এবং 'কোম্পানীর রূপী' নামে নতুন মুদ্রা চালু করা হয়। ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৯ সনের মধ্যে বৃটেন ভারতে তার রপ্তানী তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়, বিশেষ করে রেলওয়েতে, চা শিল্পে ও পাট শিল্পে।

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত-বৃটেন বাণিজ্য বেশীর ভাগ কলকাতা বন্দর দিয়ে হত। ১৮৩৩ সনের পর বোম্বাই ও মাদ্রাজের গুরুত্বও বাড়তে থাকল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সঙ্গে ছিল।

কলকাতা বন্দরের প্রাধান্য

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হল। বিদেশী বাণিজ্য প্রধানতঃ বৃটিশদের হাতে থাকায়, প্রথম দিকের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি তারাই গঠন করে। ১৮৩৪ সালে **ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স** গঠিত হয় এবং ১৮৫৪ সালে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স নামে এটি পুনর্গঠিত হয়। ১৮৩০ সালে ব্যবসায়ীদের জন্য **ক্যালকাটা ট্রেডার্স এ্যাসোসিয়েশন** গঠন করা হয়।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্ভব

নীল (Indigo) ইংলণ্ডে রপ্তানী করার প্রধান পণ্যদ্রব্য ছিল। বিলাতে যে কাপড় তৈরী হত তাকে রং করার জন্য বাংলায় নীলের বিশেষ চাহিদা ছিল।

অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণের ফলে দেশী শিল্পগুলির মধ্যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সুতী বস্ত্রের শিল্প। চরকা অবলম্বনে ভারতীয় তাঁত শিল্প অত্যন্ত উঁচুমানের তাঁত বস্ত্র প্রস্তুত করত এবং সারা বিশ্বে ভারতের তাঁত বস্ত্র সমাদৃত ছিল। পৃথিবীর নানান দেশে ঢাকার মসলিন কাপড়ের চাহিদা ও কদর ছিল। এ ছাড়া অন্যান্য সুতী ও সিল্কের পণ্য দ্রব্য, কাঁচা সিল্ক, সোরা, আফিম ইত্যাদি ভারত থেকে রপ্তানী হত। বাংলা দেশের চিনি ও পাট শিল্পও খুব সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের অর্থনীতি মূলতঃ গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক হলেও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য এবং হস্ত শিল্পের সুষ্ঠু সমন্বয় ছিল। লখ্নৌ, আহমেদাবাদ, নাগপুর, মাদুরা প্রভৃতি অঞ্চলের সুতীর কাপড় ও প্রসিদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদ, মালদার রেশমী কাপড়, বারাণসী ও আজমেনাবাদের কিংখাব, পুণা প্রভৃতি অঞ্চলের তাঁতে বোনা রঙীন কাপড় বিদেশে রপ্তানী হত। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের পশমের শাল বিখ্যাত ছিল। ভারতে প্রস্তুত বারাণসী, নাসিক, পুণা, হায়দ্রাবাদ, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের ধাতু নির্মিত জিনিষপত্র এবং কচ্ছ, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে প্রস্তুত ধাতুর ওপর খোদাই করা সৌখিন পণ্য দ্রব্যেরও বাইরে খুব চাহিদা ছিল। বড় বড় শহরের কারিগরদের নিজস্ব সংঘ ছিল (guilds)।

সুতী শিল্পের অবক্ষয়

অন্যান্য শিল্প

সুতী ও রেশম শিল্প

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে সমগ্র পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। ভারতীয় বাণিজ্য ও বস্ত্র শিল্পের বিপর্যয় দেখা দেয়। কোম্পানী একই সঙ্গে কর্তৃত্ব ও ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যেতে থাকায় অন্য কোন বিদেশী বণিকদের পক্ষে অতঃপর ইংরেজ কর্তৃত্বাধীন এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য করা সম্ভব ছিল না। **কোম্পানী তাদের নব অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এদেশীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করতে প্রয়োগ করে।**

পলাশীর পর তাঁত শিল্পের ধ্বংস

১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর ডাইরেক্টররা আদেশ জারি করেন যে বাংলা দেশে কাঁচা রেশমের উৎপাদনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে কিন্তু রেশমের বস্ত্র তৈরী করা চলবে না। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার স্বার্থে জোর জুলুম করে কাজ করিয়ে নিতে থাকে কিন্তু তাঁতীদের বাঁচার মত মজুরী পর্যন্ত দিত না। ফলে দেশে ক্রমশঃ তাঁতীর অভাব দেখা দেয়। বাংলার একদা সমৃদ্ধ সুতী এবং রেশম বস্ত্র শিল্প প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

দেশী শিল্পের অবলুপ্তির কারণ

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিনা শুল্কে ব্যবসা, দস্তক প্রথার অপব্যবহার ভারতীয় বণিকদের খুবই অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছিল।

ভারত কাঁচামাল রপ্তানী ও বিলাতী পণ্যের বাজারে পরিণত

শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃটেনের শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে বিলাতী পণ্যের বাজারে পরিণত করে। উন্নত যন্ত্রপাতি, কারিগরি বিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতি, আধুনিকতম উৎপাদন পদ্ধতি এবং বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ভারতীয় কারিগর এবং বণিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও সরকার বিভিন্ন আইন ও নীতির মাধ্যমে বৃটিশ শিল্পপতি ও বণিকদের সাহায্য এবং এদেশীয় বণিক ও উৎপাদনকারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। শুল্কের হার নির্ণয় এবং আমদানি রপ্তানী নীতির ক্ষেত্রে বৃটিশ পণ্যের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতমূলক নীতি অনুসৃত হতে থাকে। ভারতবর্ষ থেকে সুলভ মূল্যে বৃটিশ কলকারখানার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ভাবে এখানকার লবণ, চিনি, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাঁচা রেশম ও নীল চাষের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় কারণ এই দুটি জিনিষের উৎপাদন বৃটিশ বণিকদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক ছিল।

ভারতীয় বণিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ

ম্যানচেস্টারের পণ্য দ্রব্যের দ্বারা ভারতীয় সুতী শিল্প উৎপাত

ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পরেও ভারতীয় শিল্প উৎপাদনের পুরাণো পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁত শিল্পের গুরুত্ব-পূর্ণ কেন্দ্র বাংলার শান্তিপুরে কালিকো এবং মসলিনকে উৎখাত করে বৃটেনের ম্যাঞ্চেস্টারের কলে বোনা সুতীবস্ত্র। ১৮১৫ সালে বাংলা সরকার বৃটিশ পণ্য দ্রব্য আমদানীর ওপর শতকরা আড়াই টাকা হারে আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেন। এটা ছিল ভারতীয় শিল্পের ওপর একটি গুরুতর আঘাত। একে অসংগঠিত ভারতীয় শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনকারীরা উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অপারগ ছিলেন, তার ওপর শুল্কের ব্যাপারে বৈষম্যের জন্য তাঁরা অসম এবং অন্যায় প্রতিযোগিতায় পশ্চাদ্‌বর্তী হয়ে পড়লেন।

অসম প্রতিযোগিতা

মোটকথা, তাঁতির অন্ন গেল, চরকা কাটা সুতার বাজার নষ্ট হল, সব দিক দিয়েই ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ সাধন হল।

অষ্টম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও নবজীবনের প্রাণস্পন্দন

পুরাণো শিক্ষা ব্যবস্থা : পরিবর্তন : ইংরাজি শিক্ষা—দেশীয় ভাষায় শিক্ষার অবনতি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শ

ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরও ভারতের পূর্ব প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত পাঠশালায়। এই শিক্ষার প্রকৃতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় বস্তু, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি। মসজিদের সঙ্গে যুক্ত ছিল মকতব। উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ছিল টোল আর আরবী ফার্সীর জন্য ছিল মাদ্রাসা। এদের মধ্যে পাঠশালায় জনশিক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই। তবে বৃহত্তর জগতের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে এদের কোন সংযোগ না থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থায় অবক্ষয় এবং অচল অবস্থা দেখা দেয়। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন ইংরাজ অবশ্য এদেশের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে **কলিকাতা মাদ্রাসা,** জোনাথন ডানকান কাশীতে **সংস্কৃত কলেজ** (১৭৯২ খ্রীঃ) এবং উইলিয়াম জোনস প্রাচ্য বিদ্যা চর্চার জন্য কলকাতায় ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে **এশিয়াটিক সোসাইটি** স্থাপন করেন। বৃটিশ শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য ছিল কিন্তু এদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না করা। এই জন্য তারা মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন পাঠন হত এই রকম এদেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পুনরুত্থানের দিকে বিশেষ নজর দেয়নি। অবশ্য কোম্পানীর প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী জানা লোকের প্রয়োজনে প্রাচ্য বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি দেশীয় ভাষায় কোম্পানীর কর্মচারীদের শিক্ষা দেবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত করেন।

পুরাণো শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রাচ্য শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

তবুও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে এদেশে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠেছিল। বাঙ্গালী মধ্যবিত্তরা হয় ব্যবহারিক প্রয়োজনে নয়ত দেশীয় সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার দূর করার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা চাইতেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলে জনমত

কিন্তু এদেশে কোম্পানীর আগমনের আগেই চেষ্টা ব্যতিরেকেও ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা ছিল খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের। তাঁরা খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরাজী ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা দানের চেষ্টা করেন। **কেরী ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরে ইংরাজী বিদ্যালয় এবং ছাপাখানা স্থাপন করেন।** পরে এটি শ্রীরামপুর কলেজে পরিণত হয়। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে বিশপস কলেজ এবং ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ কর্তৃক (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) **জেনারেল এ্যাসেম্বলীস ইনস্টিটিউশন নামে** এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রধান ভূমিকা নেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্ট, কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং **ডেভিড্ হেয়ারের** চেষ্টায় হিন্দু কলেজ (পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন হেনরী লুই ভি ভি আন **ডিরোজিও**। বাংলার **নবজাগরণে** এই কলেজের ছাত্রদের বিশেষ অবদান ছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ডেভিড্ হেয়ারের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি এবং পরের বছর ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনা, প্রকাশ ও বিতরণ ইত্যাদির জন্য আর্থিক সাহায্যদান ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য।

ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে খ্রীস্টান মিশনারীদের উৎসাহ

রাজা রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষার আনুকূল্য

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা

ডেভিড্ হেয়ার

স্কুল বুক সোসাইটি

কোম্পানীর সরকার প্রথমদিকে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপে নারাজ ছিল। কিন্তু কোম্পানী ও বৃটিশ পার্লামেন্টের ওপর শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ইভান জেলিস্ট, খ্রীস্টান মিশনারী, ইউটিলিটারিয়ানস এবং উদার নীতিকরা চাপ দিতে থাকেন। এদেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে ছিলেন।

কোম্পানীর দৃষ্টিভঙ্গী

১৮১১ খ্রীস্টাব্দে **গভর্নর জেনারেল মিন্টো** মন্তব্য করেন যে সরকার যদি আর্থিক সাহায্য না করে, তাহলে এদেশের বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। ইংলণ্ডে এবং এদেশে খ্রীস্টান মিশনারীরাও কোম্পানীর নীতির তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। এই সব সমালোচনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নি।

এর ফলে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সনন্দ-আইনে সর্বপ্রথম ভারতে কোম্পানী শাসনাধীন অঞ্চলের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য নূন্যন পক্ষে বার্ষিক একলক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। পরবর্তী দশ বৎসরে ঐ অর্থ ঠিকমত ব্যয় করা হয়নি। এর অন্যতম কারণ ছিল সরকারের বরাদ্দ অর্থ কিভাবে এবং কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত এই নিয়ে মতভেদ।

১৮১৩ সালের সনন্দে শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপারে 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক্ ইনস্ট্রাকসান' (General Committee of Public Instruction) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্যদের মতে যাঁরা প্রাচ্য বিশারদ ছিলেন তারা সরকারী অর্থ প্রাচ্যবিদ্যা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনর্জীবন এবং প্রসার কল্পে ব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তাঁরা বরাদ্দ অর্থের কিছু অংশ ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা 'কমিটি অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকসনের' এই মনোভাব সমর্থন করেন নি। তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রাচ্য বিদ্যার পরিবর্তে এদেশের লোকেদের ইংরাজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। কেননা এদেশে ইংরাজী ভাষা-জানা পাশ্চাত্য শিক্ষিত কিছু লোক সৃষ্টি হলে, তাদের সরকারী কাজ কর্মে নিযুক্ত করা যাবে। ছোটখাটো সরকারী পদের জন্য ইংলণ্ড থেকে মোটা মাহিনা দিয়ে ইংরাজ কর্মচারী প্রেরণ করতে হবে না। অর্থাৎ ডাইরেক্টররা চাইছিলেন যে ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করে একদল এদেশীয় কেরাণী সৃষ্টি করা, যারা বৃটিশ ভারতরে শাসন ব্যবস্থার ব্যয় সঙ্কোচ করতে সাহায্য করবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কোম্পানীর ডাইরেক্টররা প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যন্ত নিম্ন ধারণা পোষণ করতেন।

জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন

উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন (১৮২৮) তখন শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ প্রাচ্য না পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের জন্য ব্যয় করা হবে তা নিয়ে প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থক বা **'ওরিয়েণ্টালিস্ট'** (Orientalist) এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচারের সমর্থক বা **অ্যাংলিসিস্ট** (Anglicist)-দের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলছিল। বেণ্টিঙ্ক নিজেও এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সমর্থক ছিলেন। কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকসানের সভাপতি এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষার উগ্র সমর্থক **টমাস মেকলের** (Maculay) ওপর এই সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত দেবার ভার অর্পণ করেন বেণ্টিঙ্ক। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে মেকলে প্রস্তাব করেন যে অতঃপর ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করা হবে। এবং বেণ্টিঙ্ক তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে ঐ মর্মে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্য-বাদীদের মধ্যে বিতর্ক

মেকলের মিনিট ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রবত ন পক্ষে মত

এই সিদ্ধান্ত এক ঐতিহাসিক ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পাশ্চাত্য ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের পথ সুগম হওয়ায় ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও পরিবর্তন দেখা দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে **কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের** প্রতিষ্ঠা হয়।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

এই কলেজটিই আমাদের দেশে প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা-চর্চার সূত্রপাত করে। কিন্তু **অ্যাংলিসিস্ট ও ওরিয়েন্টালিস্টদের** বিতর্কের ফলে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অবহেলিত থেকে যায়। সরকার মৌখিকভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করলেও সুনির্দিষ্ট নীতি, আন্তরিক প্রয়াস এবং শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকা অত্যন্ত সীমিত হওয়ার জন্য উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার প্রাধান্য বজায় থাকে। মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা অবহেলিত থাকে। ইংরাজী ভাষার গুরুত্বের মূল কারণ হল, এই ভাষা ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর ভাষা। পূর্বে ফারসী ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হত। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে ফারসীর জায়গায় ইংরাজী সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

মাতৃ ভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার অবহেলা

গভর্নর জেনারেল **লর্ড অকল্যাণ্ডের** শাসনকালে (১৮৩৬-১৮৪২) শিক্ষাখাতে অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করা হয় এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং গ্রন্থালয় স্থাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অবশ্য প্রাচ্য বিদ্যা চর্চার জন্য অনুদান তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন।

অকল্যাণ্ডের শিক্ষানীতি

১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্স্ট্রাকশন পুনর্গঠিত হয়ে **'কাউন্সিল অফ এডুকেশন'** (Council of Education) নামে অভিহিত হয়। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে **লর্ড হার্ডিঞ্জ** ইংরাজী ভাষা জ্ঞানকে সরকারী চাকুরী প্রার্থীদের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেন। কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতার প্রতি ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত বিস্তার, সরকারী বৃত্তিদান ও ইংরাজী শিক্ষায় ব্যবহারিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী জোরদার হতে থাকে।

কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনকালে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার **চার্লস উডের** (Charles Wood) **নির্দেশপত্র** অনুসারে (Education Despatch) একটি 'শিক্ষা বিভাগ' (Department of Public Instruction) স্থাপিত হয় এবং কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া উডের ডেস্প্যাচে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়। উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং পূর্বের শিক্ষানীতির কিছু পরিবর্তন করা হয়। উডের নির্দেশপত্র

উডের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭)

কার্যকরী করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপারে ডালহৌসী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অল্পকাল পরেই মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ফলাফল

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করেনি। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাও অবহেলিত থাকে। ইংরাজ সরকারের স্বার্থে সরকারী কাজে কেরানী তৈরী ছিল এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবুও ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার আন্দোলনে এঁরাই নেতৃত্ব দেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস—বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বিশেষ ভূমিকা : নবজীবনের প্রাণস্পন্দন :

পাশ্চাত্য সংঘাত ও আধুনিক যুগের সূচনা

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী জীবন অন্তঃসারশূন্য ও মৃতপ্রায় মনে হলেও এই সময় থেকেই আসন্ন নবজীবনের লক্ষণ অর্ধস্ফুট হয়ে ওঠে। পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে বাংলাদেশে ইংরাজী বা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। এর ফলে ভারতীয় চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং নবজীবনের সূচনা হয়। বাংলাদেশে বৃটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার এক বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ফল ছিল নাগরিক জীবন এবং সভ্যতা, বিশেষ করে কলকাতা মহানগরীর জন্ম এবং এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম। কলকাতাকে বাংলার রাজধানী করার পরিকল্পনা করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর আমলেই রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র বা রাজধানী রূপে কলকাতা চিহ্নিত হয়। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ তথা ভারতীয় জাগরণের পুরোধা ছিলেন **রাজা রামমোহন রায়** (১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪-১৮৩৩)।

নবজীবনের প্রথম লক্ষণ

বিগত শতকে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রাণচাঞ্চল্য ও পরিবর্তন দেখা দেয়। দীর্ঘ দিনের জড়ত্বের পর ভারতীয় জীবনে প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। প্রথমে বাংলা দেশে শুরু হয়ে এই আলোড়ন দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফলে সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের

সূচনা হয়েছিল। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটি** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ দেশে সদ্য আগত অনভিজ্ঞ তরুণ ইংরাজ রাজকর্মচারীদের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটির বাংলার নবজাগরণে, বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। **উইলিয়াম কেরী** এই কলেজের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতের বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। অন্য দিকে শ্রীরামপুর মিশনের তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। **শ্রীরামপুর মিশনও** ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়। মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড ছিলেন এই মিশনের অপর দু'জন খ্যাতনামা মিশনারী। উনিশ শতকের নবজাগরণের ক্ষেত্রপ্রস্তুতিতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে স্থাপিত এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণার সূচনা করে। এইসব গবেষণালব্ধ জ্ঞান গ্রন্থ ও প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হলে ভারতীয়রা নিজেদের বিস্মৃত গৌরব ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে আত্ম-গৌরব ও আত্ম-বিশ্বাসের উন্মেষ হয়।

রাজা রামমোহন রায়
(১৭৭২/১৭৭৪-১৮৩৩)

রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২, মতান্তরে ১৭৭৪-১৮৩৩) বহুমুখী ও বিস্ময়কর প্রতিভা, অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে নতুন যুগের সূচনা ত্বরান্বিত হয়েছিল। রামমোহন অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এবং উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন।



রাজা রামমোহন রায়

আদর্শ ও নীতি

আত্মীয় সভা

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন তাঁর বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের নিয়ে **আত্মীয় সভা** নামে একটি ঘরোয়া গোষ্ঠী স্থাপন করেন। এই সভার সদস্যদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন। রামমোহন মনে করতেন যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের অধঃপতনের মূল কারণ মূর্তিপূজা ও আড়ম্বরবহুল আচার অনুষ্ঠান। তিনি নিরাকার ব্রহ্মের আরাধনার শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা প্রচার করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি **ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা** করেন (১৮২৮)। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করলে ব্রাহ্ম সমাজ এক সংকটময় অবস্থায় পড়ে।

ব্রাহ্ম সমাজ

রামমোহনের সুহৃদ ও ঘনিষ্ট সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) যোগদান করার পর ব্রাহ্ম আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত **তত্ত্ববোধিনী সভা** (১৮৩৯) এবং **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** (১৮৪৩) বাংলার শিক্ষা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে। ব্রাহ্মসমাজের কর্ম তৎপরতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মূলে রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয় কুমার দত্তের বিশেষ অবদান ছিল।



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছুকাল পরে কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করলে ব্রাহ্ম আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁর বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে বহু তরুণ ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন এবং ব্রাহ্ম আন্দোলন ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রসার লাভ করে। কিন্তু দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে মত বিরোধের ফলে কেশব চন্দ্র **ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ** নামে এক পৃথক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৬৬)। মূল সমাজটি অতঃপর আদি ব্রাহ্ম সমাজ নামে পরিচিত হয়। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি **ভারতীয় সংস্কার সভা** (Indian Reform Association) স্থাপন করেন। সমাজ সংস্কার ও জনগণের নৈতিক উন্নতি সাধন ছিল এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ। এই উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র নারী প্রগতি, শিক্ষা প্রসার, সুলভ সাহিত্য, সেবাকার্য, সুরাপান এবং মাদক দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি প্রগতিশীল ও জনহিতকর কাজে ব্রতী হন। কিন্তু ঘটনাচক্রে অনতিকাল পরে কেশবচন্দ্র ও তাঁর একদল অনুগামীর মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। এর পর শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মদের সঙ্গে কেশব সেনের মতভেদ হয়।

কেশব চন্দ্র সেন

ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ



কেশব সেন

কালের প্রভাবে কেশব চন্দ্রের সমাজ সংস্কার বিষয়ক দৃষ্টি ভঙ্গীও তাঁদের কাছে যথেষ্ট প্রগতিশীল বলে বিবেচিত হয়নি। তাছাড়া নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যে কেশব চন্দ্র সম্বন্ধে ভক্তির আধিক্য ও তার ওপর দেবত্ব আরোপ এই তরুণদের পছন্দ

হয়নি। অবশেষে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি পৃথক ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর নব বিধান (New Dispensation) ঘোষণা করেন। তাঁর নববিধান সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসেছিলেন ও তাঁর ভাবধারার দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও নব বিধান

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ জনকল্যাণ, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রথমে ১৮৬৬ এবং পরে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে অন্তর্বিরোধের ফলে সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া এই সময় থেকে হিন্দু নব জাগরণের ফলেও ব্রাহ্ম আন্দোলনের অবদান হ্রাস পায় এবং গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। সমাজ সংস্কার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল প্রগতিশীলতার প্রতীক স্বরূপ। কিন্তু হিন্দু ধর্ম বহির্ভূত একটি পৃথক ধর্মান্দোলন রূপে ব্রাহ্ম আন্দোলন জনমানসে রেখাপাত করতে পারেনি।

ব্রাহ্ম-সমাজের প্রগতিশীল ভূমিকা

সমাজ সংস্কার আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম সুফল ছিল সমাজ সংস্কার আন্দোলন। অমানবিক নিষ্ঠুর সামাজিক কুসংস্কারের অবসানের জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ ও প্রগতিশীল ভারতীয় জনমতের সমর্থন সমাজ সংস্কার প্রবর্তনে সহায়তা করেছিল।

ভারতবর্ষের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কুসংস্কার হতে বন্ধন মুক্ত হয়ে নারী জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিতে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল; বহু বিবাহ প্রথা, সমাজে নারীর অমর্যাদা ও তাঁদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ ইত্যাদির তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শক্তিশালী ও সার্থক হয়েছিল। প্রগতিশীল ভারতীয় জনমতের সমর্থন না থাকলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পক্ষে এই নিষ্ঠুর প্রথা তুলে দেওয়া সম্ভব হতনা। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক নিষ্ঠুর ভয়াবহ সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

সতীদাহ প্রথা রদ

রামমোহন নিজে সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্যের জ্ঞানালোক, যুক্তিবাদ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ছাড়া ভারতীয়দের উন্নত ও প্রগতিশীল করে তোলা সম্ভব নয়। ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর পত্র থেকে ঐ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা

তিনি সম্ভবতঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রস্তাবনা ও আলোচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিবিধ আন্দোলনের পুরোধা

সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আন্দোলন (১৮২৩), বিচারের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ (১৮২৭) এবং ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ভারতীয়দের ন্যায় সঙ্গত অধিকার ও দাবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ও অন্যান্য নানা ভাবে তিনি ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে সহায়তা করেছিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশেও তাঁর অবদান আছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জীবন ও চিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাংলা তথা ভারতের **নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন** "ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ" রূপে অভিহিত হয়েছেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের বৃস্টল শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ

রামমোহনের মতামত ও কার্যাবলী, বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের কঠোর সমালোচনা রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই ভাবে প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে হিন্দু সমাজ যখন আলোড়িত, সেই সময় হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত **'নব্যবঙ্গ'** (**Young Bengal**) নামে অভিহিত একদল তরুণের মতবাদ ও আচরণ তুমুল উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

ইয়ং বেঙ্গল

ভারতীয় সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে **'ইয়ং বেঙ্গল'** বা নব্যবঙ্গ আন্দোলনের নামও বিশেষ ভাবে জড়িত। হিন্দু কলেজের তীক্ষ্মধী ছাত্র দলের সবচেয়ে প্রিয় ও আদর্শ তরুণ শিক্ষক ছিলেন **ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১)**। তিনি তাঁর অনুগত ছাত্রদের নিয়ে **এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন** (**Academic Association**) নামে একটি সমিতি গঠন করেন (১৮২৮)। তাঁর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি। হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ছিল তাঁদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। আতঙ্কিত হিন্দু নেতারা ডিরোজিওকে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করলে তিনি কলেজ থেকে পদচ্যুত হন এবং কয়েক মাস

ডিরোজিও



ডিরোজিও

পর এই মহান শিক্ষকের অকাল মৃত্যু হয় (১৮৩১)। ডিরোজিওর মৃত্যু হলেও তাঁর প্রভাব লুপ্ত হয়নি। নব্যবঙ্গীয়দের প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলি জ্ঞানান্বেষণ, এনকোয়ারার, হিন্দু পায়োনিয়ার, বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রভৃতি এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে সমাজ সংস্কার, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে এই তরুণরা Society for the Acquisition of General Knowledge নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা আন্দোলন, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাশ্চত্য শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানা জনহিতকর প্রচেষ্টার সঙ্গে নব্যবঙ্গীয়রা যুক্ত ছিলেন।

ইয়ং বেঙ্গলের কর্মকলাপ

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নব্যবঙ্গীয় নামে পরিচিত তরুণরা সমস্ত গঠন মূলক কাজে ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন ও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। হেয়ারও এই তরুণদের সততা, আন্তরিকতা ও দেশ কল্যাণের আদর্শকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের প্রগতিপন্থী, প্রাচীন পন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে ভাবগত সংঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নবজীবনের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল।

সতীদাহ প্রথার অবসান সমাজ সংস্কারকদের এবং সমাজ সংস্কারক আন্দোলন গুলিকে অনুপ্রাণিত করে। নব্যবঙ্গীয়রা সমাজ সংস্কারে খুবই আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, যদিও সুনির্দ্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে তাঁরা তেমন সাফল্য লাভ করেননি। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে সনন্দ আইনে ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতি ও কালক্রমে এই প্রথা অবলুপ্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে এক আদেশ জারী করে ভারতে ক্রীতদাস প্রথাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ ওড়িষ্যার কিছু অনুন্নত অঞ্চলে প্রচলিত নরবলি প্রথা বন্ধ করেন।

উনিশ শতকের সূচনার পূর্ব হতেই খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকরা হিন্দুধর্মকে ভ্রান্ত ও অসার প্রতিপন্ন করে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু ধর্মসংস্কারক ও অন্যান্যরাও হিন্দু ধর্মের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। রামমোহন ব্রাহ্ম ধর্মকে হিন্দু ধর্মের সমুন্নত রূপ মনে করলেও তাঁর মূর্তিপূজাবিরোধী প্রচারের ফলে হিন্দু সমাজে ক্ষোভ ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। কালক্রমে ব্রাহ্ম ধর্ম একটি পৃথক ধর্মমতে পরিণত হয় এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে হিন্দু বলতে ব্রাহ্মদের বোঝায় না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা অবশ্য এই মত সমর্থন করেননি।

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাফল্য সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করে। কয়েক বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় (১৮২০-১৮৯১) বিধবা বিবাহ আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ

বিদ্যাসাগর

নেয় এবং তাঁর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফলে বিধবা বিবাহ **বিধবাবিবাহ আইন** আইন সিদ্ধ হয় (১৮৫৬)। বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল ও তাঁর **নারীশিক্ষা** সমর্থন লাভ করেছিল। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি বেথুনের সহযোগিতা করেন। বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক-রূপে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। **বাংলা গদ্য সাহিত্য** বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা ও শিল্পী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বেতাল পঞ্চ বিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিরাট পণ্ডিত হয়েও শিশুদের জন্য 'বর্ণ পরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে তাঁর দূরদৃষ্টি ও শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত। অটুট সংকল্প, দুর্জয় সাহস ও অসীম মনোবলের অধিকারী এই পুরুষ সিংহের মন ছিল শিশুর মত কোমল ও পরদুঃখ-দুর্দশায় কাতর। কবি মাইকেল মধুসূদনকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর অসীম দয়া, মমতা, করুণার জন্য তিনি 'দয়ার সাগর' ও 'করুণা সাগর' রূপে বর্ণিত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বিদ্যাসাগর এক বরণীয় ও অনন্য চরিত্র।

হিন্দুধর্মের ওপর আক্রমণ তীব্রতর হওয়ার ফলে এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রক্ষণশীল হিন্দু নেতা ও ধর্মব্যাখ্যাতারা সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা ও প্রচার করতে সচেষ্ট হন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ লেখকদের রচনা হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানে সাহায্য করে। এই সময় হিন্দু ধর্ম ও সমগ্র ধর্মান্দোলনের এক নতুন রূপদান ও পথনির্দেশ করেন দক্ষিণেশ্বরের **শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব** (১৮৩৬-১৮৮৬)।



শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও সাধনার কাহিনী সুপরিচিত। খ্রীস্টীয় আঠারো শতকের শেষভাগে এক সামাজিক সংকট দেখা দেয় ও পাশ্চাত্যের ভোগবাদ সেই সময়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আত্মবিস্মৃত ভারত-বাসী যখন সেই সময়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করে ভারতীয় ভাবধারার জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতীর্ণ হন

মানব কল্যাণে। হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাংলা ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়।

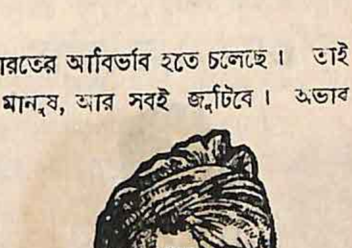
বাণী ও পথনির্দেশ

ধর্মীয় বিরোধ ও পারস্পরিক নিন্দা-সমালোচনার অবসান ঘটিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তিনি প্রচার করেছিলেন। সাকার বা নিরাকার, একেশ্বর বা বহু দেবদেবীর পূজা নিয়ে বিরোধের অসারতা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'যত মত তত পথ' তাঁর এই কটি বাণী ধর্ম ও মানবজীবনকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছিল। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শে তিনি তাঁর শিষ্যদের দীক্ষিত করেছিলেন। সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসে ও উপদেশ শুনে অপূর্ব অনুভূতি ও চিত্তশান্তি লাভ করেছিল। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ শিষ্য **স্বামী বিবেকানন্দ** ভারতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব প্রাণ সঞ্চার করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মসম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা ও সাফল্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সমগ্র দেশে তাঁর এই সাফল্য এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন—এক নতুন ভারতের আবির্ভাব হতে চলেছে। তাই তিনি যুবশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন—"চাই মানুষ, আর সবই জুটিবে। অভাব শুধু মানুষের। চাই বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাসী সম্পূর্ণ অকপট যুবকের দল। এইরূপ একশত যুবক জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইতে পারে।"



স্বামী বিবেকানন্দ

অস্পৃশ্যতা বর্জন করে, ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাবাদ দূর করে এবং সমস্ত ভারতবাসীকে এক ঐক্য-সূত্রে গ্রথিত করে জাতীয় সংহতি দৃঢ় করতে ভারতবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বামীজী :

"হে ভারত, ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে ডাকিয়া বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই……, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল,—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার আমার প্রাণ।…

বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

স্বামীজী বলেছিলেন "সকল শিক্ষা প্রণালীর লক্ষ্য হওয়া উচিত Man-Making (মানুষ-তৈরি)। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার যার দ্বারা চরিত্র গঠন হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে।" স্বামী বিবেকানন্দ **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পরিব্রাজক** ও **বর্তমান ভারত** প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উজ্জীবিত হিন্দুধর্ম নবজীবন ও আত্মবিশ্বাস লাভ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবকে শিব জ্ঞানে' সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ভারতবর্ষে জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কর্মযজ্ঞের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

স্যার সৈয়দ আমেদ খাঁ

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ভারতের মুসলমানদের নেতা ছিলেন দিল্লীর স্যার সৈয়দ আমেদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮)।



স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ

মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা

নিজের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি অনীহাই মুসলমানদের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি আলিগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ (১৮৭৫) প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যায়তনটি পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

কর্ণেল ওলকট্ ও মাদাম ব্লাডট্‌স্‌ক মাদ্রাজের আদিয়ারে **থিওসোফিক্যাল সোসাইটি** নামক এক সংস্থা স্থাপন করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে অ্যানি বেসান্ত এই সোসাইটিতে যোগদান করলে এর শক্তি বৃদ্ধি হয়। হিন্দুধর্ম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলাই ছিল এই সোসাইটির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অ্যানি বেসান্ত বারাণসীতে সেণ্ট্রাল স্কুল স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় পরবর্তীকালে কলেজ এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

থিওসোফিক্যাল সোসাইটি
এ্যানি বেশন্ত
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের আগে মহারাষ্ট্রের বোম্বাইতে পাশ্চাত্য শিক্ষার কিছু প্রসার হয়, কিন্তু বাংলার তুলনায় কম। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে **"বোম্বাই নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি"** (Bombay Native Education Society) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি তিনটি বিদ্যালয় খোলে।

গভর্নর এলফিন্‌স্টোন (Elphenstone) জনশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিতরণের পক্ষপাতী ছিলেন। পরের গভর্ণর জন ম্যালকাম (John Malcolm)ও এই মত বিশ্বাস করতেন। ১৮৪৮ পর্যন্ত বাংলার তুলনায় মহারাষ্ট্রে **মাতৃভাষায় শিক্ষার** অনেক বেশী প্রসার হয়। ১৮৫০ পর্যন্ত বোর্ড অফ এডুকেশন-এর (Bcard of Education) অধীনে মাত্র আটটি ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় ছিল। খ্রীস্টান মিশনারীরা ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করে। তারা স্ত্রী শিক্ষায় বেশী আগ্রহী ছিল। ১৮১৪ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা (Engineering Education) শুরু হয়। ১৮৪৫ সালে গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়।

মহারাষ্ট্রে মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

১৮৬৭ সালে কেশব চন্দ্র সেনের উৎসাহে মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ **প্রতিষ্ঠিত** হয়। ব্রাহ্মদের মত প্রার্থনা সমাজের সদস্যারাও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ও সমাজ সংস্কারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের মত তাঁরা নিজেদের হিন্দু ধর্ম ও সমাজ বহির্ভূত স্বতন্ত্র কোন ধর্মমতের অনুগামী বলে মনে করতেন না। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদে বিশ্বাসী প্রার্থনা-সমাজের সদস্যারা সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানাবিধ কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলেন। প্রার্থনা সমাজের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে **মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রার্থনা সমাজ
উদ্দেশ্য
অ্যানি বেসান্ত


মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে

আর্য সমাজ
স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

বৈদিক আদর্শের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু সমাজের ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন। তিনি 'শুদ্ধি' অর্থাৎ অহিন্দু ও ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুদের হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। উত্তর ভারতের জনসাধারণের মধ্যে আর্য সমাজ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

নবম অধ্যায়

ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধের সূচনা ঃ কৃষক বিদ্রোহ ও আদিবাসী আন্দোলন ঃ

বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ঃ পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের সূচনা হলেও সারা ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার সহজ হয়নি।

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে তাদের নানা বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিদ্রোহগুলির মধ্যে খাসী, খন্দ, ভীল, গুজার, মীর, কোল প্রভৃতি আদিবাসীদের বিদ্রোহ, জাঠ বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বদেশ চেতনা ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী বর্জিত হলেও এইসব স্বতঃস্ফূর্ত গণ-বিদ্রোহগুলি ছিল ইংরাজ শাসন ও রাজকর্মচারীদের শোষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। মুখ্যত অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হলেও এই সব **গণ-বিদ্রোহগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব উপেক্ষনীয়** নয়। বাস্তবিক বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানা রকম প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। এই সব একটানা প্রতিরোধ চিরাচরিত ধাঁচের ছিল এবং একে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—**অসামরিক বিদ্রোহ, আদিবাসীদের অভ্যুত্থান** এবং **কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ**।

তিন প্রকারের বিদ্রোহ

ভারতীয় কৃষকদেরই ঔপনিবেশিক শোষণের প্রধান দায়ভার বহন করতে হয়েছিল। ফলে সেই কৃষকরাই রুখে দাঁড়ায়। জমিদার এবং ছোটখাট সামন্তরা নেতৃত্ব দিলেও কৃষকরাই অসামরিক বিদ্রোহগুলির মেরুদণ্ড ছিল।

অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদ

আর এক ধরনের কৃষক বিদ্রোহ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। প্রধানতঃ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার এবং শুদ্ধি আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও, খুব শীঘ্রই আন্দোলনকর্মীরা জমিদার, মহাজনদের আক্রমণ করে তাদের আন্দোলনের কৃষক চরিত্রটি প্রকাশিত করেছিল—যেমন, ফেরাজি এবং ওয়াহাবি আন্দোলন।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া সংস্কারবাদী মুসলিম আন্দোলনগুলি আসলে ছিল একটি ক্ষয়িষ্ণু, হতাশাক্লিষ্ট মুসলমান সমাজের হৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

মুসলিম আন্দোলনের চরিত্র

ফেরাজী আন্দোলন (১৭৮১-১৮৪০)ঃ বাংলাদেশে ফেরাজী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ফরিদপুরের **শরিয়ৎ উল্লাহ** (১৭৮১-১৮৪০)। আরবী শব্দ **ফরজ এর অর্থ আল্লার আদেশ**। আঠার বছর বয়সে তিনি মক্কা যান। ১৮০৪ থেকে তিনি তাঁর ভাবধারা প্রচার করতে শুরু করেন। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি ছিল ফেরাজি প্রভাবিত অঞ্চল। ফেরাজিরা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর সব মানুষের জন্যই জমি সৃষ্টি করেছেন। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা উচিত নয়। সরকারকে উৎপন্ন ফসলের একাংশ খাজনা হিসেবে দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু জমিদারদের খাজনা আদায়ের কোন অধিকার নেই। বে-আইনি করদানের বিরুদ্ধে ফেরাজিরা জনমত গঠন করে। নীল চাষের মালিকদের বিরুদ্ধেও ফেরাজিরা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। বাংলার অবহেলিত কৃষক সমাজকে নতুন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন **শরিয়ৎ উল্লাহ**। কিন্তু ফেরাজিদের হিন্দু মূর্তিপূজা বিরোধী মনোভাব ও কার্যকলাপ হিন্দুদের মনে আঘাত করে এবং বিশেষ করে হিন্দু জমিদারদের আশঙ্কিত করে তোলে। হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে ফেরাজিদের সংঘর্ষ ধর্মীয় কারণে শুরু হলেও তার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাও জড়িয়ে পড়ে।

শরিয়ৎ উল্লাহ | আদর্শ ও কর্মসূচী | হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক

শরিয়ৎ উল্লার জীবিত কালে তাঁর পুত্র **দুধু মিঞা** (১৮১৯-৬২) ফেরাজি আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সংগঠকরূপে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি জমিদার এবং ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য দূর করাও তাঁর লক্ষ্য ছিল। দুধু মিঞার নেতৃত্বে ফেরাজি আন্দোলন গ্রামবাংলায় প্রসার লাভ করতে থাকে। বহুস্থানে ফেরাজিরা বলপ্রয়োগ করে মুসলমানদের এই আন্দোলনে যোগদান করতে বাধ্য করে। দুধু মিঞা খিলাফতের সাহায্যে প্রায় সমান্তরাল সরকার স্থাপন করেন। নিজের ট্যাক্স এবং আদালত চালু করেন।

দুধু মিঞা | কার্যকলাপ

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর অঞ্চলে ফেরাজি আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে ও ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে তীব্রতম হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ফেরাজি আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ, জোর জুলুম করে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ আদায় ও দলভুক্ত করার চেষ্টা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফেরাজিরা জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। অনেকেই সন্দেহ করতে থাকে যে ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়া ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ এবং মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাও ছিল ফেরাজিদের উদ্দেশ্য। যশোহর, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলায় দুধু মিঞার বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা থেকে

বলপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়া

ডিটেকটিভ পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল লেখেন যে এই জেলাগুলিতে মুসলমান অধিবাসীরা যে বৃটিশ শাসন মেনে নেবেনা সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত। ফেরাজিদের কার্যকলাপের ফলে গ্রামাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ায় ইংরাজ সরকার উদ্বিগ্ন বোধ করতে থাকে। ইতিপূর্বে কয়েকবার বিভিন্ন অভিযোগে দুধু মিঞার বিচার হলেও তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ শুরু হলে দুধু মিঞার প্রভাবের কথা চিন্তা করে তাঁকে বন্দী করা হয়। কয়েক বছর পর তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফেরাজি আন্দোলনে ভাটা পড়ে এবং অল্পকালের মধ্যেই আন্দোলনের অবসান হয়। দুধু মিঞার তিন ছেলের নেতৃত্বে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় পর্যবসিত হয় এবং দুধু মিঞার কনিষ্ঠ পুত্র খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন।

ইংরাজ কর্তৃপক্ষের দমনমূলক ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মক্কায় **আব্দুল ওয়াহাব** নামক এক ব্যক্তি এক ধর্ম সংস্কার আন্দোলন করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের নাম **ওয়াহাবিবাদ**। আব্দুল ওয়াহাব ঈশ্বরের একত্ববাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ধর্মের বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ও পুরোহিত তন্ত্রকে অসার ও অবাঞ্ছিত বলে অভিহিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওয়াহাবিবাদ ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

ওয়াহাবিবাদের জন্ম

বেরিলির **সৈয়দ আহমদ** (১৭৮৬-১৮৩১) এই মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচারে অগ্রণী হন। তিনি কতটা মূল ওয়াহাবিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা সঠিক নির্ধারণ করা সহজ নয়। তিনি দিল্লীতে **পীরশাহ ওয়ালিউল্লার** কাছে ইসলাম ধর্মশাস্ত্র ও নীতি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮২২-১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ মক্কায় যান, কিন্তু সেখানকার শাসন-কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কৃত করেন। অপমানিত ও ক্ষুব্ধ সৈয়দ আহমদ এক নতুন ধর্মপ্রচারে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজেকে **ইমাম** বলে ঘোষণা করেন। নিজের ধর্মমত প্রচারের জন্য তিনি এক সুসংহত সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর ধর্ম প্রচারকরা সুদূর পল্লী-অঞ্চলের মুসলমান জনগণের কাছে ওয়াহাবিবাদের নীতি ও শিক্ষা পৌঁছে দেন। ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল পাটনা।

সৈয়দ আহমদ

প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সংস্কার করে ইসলামের পবিত্রতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা ছিল ওয়াহাবি আন্দোলনের ধর্মীয় উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনের আসল নাম ছিল **তারিকা-ই-মুহাম্মদিয়া** (Tariqa-I-Muhammadia) আন্দোলন। কিন্তু ভারতে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ্যও ছিল। এটি হল বিধর্মী শাসক গোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা। পাঞ্জাবে শিখ-শাসনের অবসানের জন্য ওয়াহাবিরা ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে। সীমান্তের বিভিন্ন

তারিকা-ই মুহাম্মদিয়া ওয়াহাবি আন্দোলনের নীতি ও লক্ষ্য

উপজাতি যোগদান করায় এই আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি পায় এবং ওয়াহাবিরা পেশোয়ার জয় করে (১৮৩০ খ্রীঃ)। কিন্তু এই সাফল্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে এক যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ নিহত হন। ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ফলে ভারতে বৃটিশ অধিকার স্থাপিত হবার পর বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন ওয়াহাবিদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিণত হয়।

১৮৫৭-এর বিদ্রোহের প্রতি ওয়াহাবিদের মনোভাব

ওয়াহাবি আন্দোলন সামগ্রিক ভাবে ১৮২০ থেকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে ওয়াহাবিরা দলগত ভাবে যোগদান করেনি, যদিও কোনো অঞ্চলে ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল।

পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে ১৮২৭ থেকে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত **তিতুমীরের** নেতৃত্বে ওয়াহাবি আন্দোলন হয়েছিল। কলকাতার নিকটবর্তী বারাসাতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মক্কায় তীর্থ করতে গিয়ে ওয়াহাবি নেতা সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তিতুমীরের যোগাযোগ হয়। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিতুমীর পশ্চিম বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন গড়ে তোলে। তিতুমীরের অনুগামীরা কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামিমুক্ত ছিলেন না। স্থানীয় মুসলমান কৃষক ও তাঁতী সম্প্রদায় এই আন্দোলনের হাতিয়ার হয়েছিল। ওয়াহাবি ধর্মমতাবলম্বীদের ওপর জমীদার কৃষ্ণ রায় কর বসালে তারা তিতুমীরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু করে। হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে সাফল্য ওয়াহাবিদের স্থানীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে উৎসাহিত করে। কিন্তু মেজর স্কটের নেতৃত্বে এক ইংরাজ বাহিনী ওয়াহাবিদের সম্পূর্ণ পরাজিত করে (নভেম্বর ১৮৩১)। তিতুমীর ও তাঁর বহু অনুগামী যুদ্ধে নিহত হন।

বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনে তিতুমীর

বাংলা দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানেও ওয়াহাবি আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল। বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ওয়াহাবিরা সক্রিয় ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষকে ইসলাম ভূ-খণ্ডে পরিণত করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

ভারতের অন্যান্য স্থানেও ওয়াহাবি আন্দোলন

১৮০০ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ওয়াহাবিদের ধ্বংস করার জন্য ইংরাজ সরকার বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। **ওয়াহাবিদের প্রধান ঘাঁটি ছিল উত্তর ভারতের সীতানা।** বহু চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত ইংরাজ বাহিনী সীতানা ধ্বংস করে ওয়াহাবি আন্দোলন দমনে সফল হয়।

বাংলা দেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে ওয়াহাবি আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে।

ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮২০-১৮৭০): মুসলমান প্রতিক্রিয়া

রফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর দি বেঙ্গল মুসলিমস (১৮৭১-১৯০৬) গ্রন্থে লিখেছেন ফেরাজি এবং তারিকা-ই-মহম্মদীয়া (ওয়াহাবি) আন্দোলন দুটি ছিল নিজস্ব নীতি ও সংগঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু প্রকৃত সত্য যা রফিউদ্দিন সাহেবেরও দৃষ্টিগোচর হয়েছিল তা হচ্ছে এই যে ফেরাজি ও তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের কার্যসূচীর মধ্যে মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্যগত দিকও ছিল—যেমন তাদের ধর্মীয় সংস্কার, কৃষক বিদ্রোহ এবং সরকার বিরোধী মনোভাব। তবে দুটি আন্দোলনের ভেতর মৌলিক তত্ত্বগত পার্থক্য ছিল। এম. এ, খানের মতে শরিয়ৎ উল্লা আরব দেশ থেকে তাঁর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তিতুমীরের সংস্কার কার্যসূচী, শাহ্ ওয়ালিউল্লা এবং সৈয়দ আহমেদের পশ্চিমবঙ্গের জন্য কার্যসূচীর বিস্তার। ওয়াহাবিরা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বা যেহাদ ঘোষণা এবং পরিচালনা করেছিলেন। ফেরাজিরা সরকারী বিভাগগুলির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় অ-সহযোগিতা ঘোষণা করেছিলেন এবং বৃটিশ ভারতে ঈদ ও শুক্রবারের নমাজ প্রার্থনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মুসলিম আন্দোলনগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

ভারতের আদিবাসী আন্দোলন—কোল—সাঁওতাল

ভারতের প্রাচীন আদিবাসীরা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিস্তারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ শোষণের যন্ত্র স্বরূপ মহাজন, ব্যবসায়ী, খাজনা আদায়কারীদের তারা খুব অপছন্দ করত। এদের মধ্যে **১৮২০-৩৭ সালের কোল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫-৫৬-র সাঁওতাল বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য।**

কোল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ

কোল বিদ্রোহ

কোলরা তাদের প্রাচীন আরণ্যক বিধিগুলির পুনঃ প্রচলন চেয়েছিল। কোল বিদ্রোহের কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত নতুন প্রশাসনিক পদ্ধতির গভীরে নিহিত ছিল। সিংভূম বৃটিশ অধিকারে যাওয়ার পর যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তা' শেষ পর্যন্ত ১৮৩১-৩২-এর কোল বিদ্রোহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

সিংভূমে বৃটিশ অধিকারের ফল

কোলদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শাখা ছিল। এর মধ্যে **'হো' রা ছিল উন্নত।** **মুণ্ডারা** ছিল আর একটি শাখা। ১৮২৯ সালের শেষ দিকে সম্বলপুর গোলযোগ দেখা দেয়। ১৮৩১ সালে ছোটনাগপুরের মুণ্ডারা বিদ্রোহ করলে, 'হো' রা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

'হো' এবং মুণ্ডা গোষ্ঠী

সাধারণভাবে কোল বিদ্রোহ বলে কথিত ঘটনাটির প্রধান উপলক্ষ ছিল ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। ছোটনাগপুরের ভূস্বামী সামন্তরা ঐ অঞ্চলের গ্রাম্য প্রধান বা মুণ্ডাদের দাবী উপেক্ষা করে তাঁদের জমিদারীর অন্তর্গত গ্রামগুলি বিদেশী জোতদারদের কাছে বিলি বন্দোবস্ত করে দেন। এর ফলে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলকারীদের অনেকে জমির অধিকার থেকে বিচ্যুত হন। বাংলার সরকারের রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত বিধি নিয়মগুলি অনেক জায়গায় অবমাননাকর মনে করা হত। এর ফলে 'হো' এবং মুণ্ডাদের অভ্যুত্থান ঘটে এবং রাঁচী, হাজারিবাগ, মানভূম, পালামৌতে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের তীব্র আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল বিদেশী বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে। দু'মাস পরে (মার্চ, ১৮৩২) সেনাবাহিনীর সাহায্যে এটা দমন করা হয়। বিদ্রোহী নেতারা, **সুরগা** এবং **সিংগ্রা ভ্রাতৃদ্বয়** শেষ পর্যন্ত বীরত্ব দেখান। ১৮৩৬-৩৭ সালে 'হো'-দের বৃটিশের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কিন্তু বৃটিশ শোষণের দরুন তারা বিক্ষুব্ধ থেকে যায় এবং ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় তারা এই শৃঙ্খল খুলে ফেলার চেষ্টা করে।

কোল বিদ্রোহের কারণ

বিদ্রোহের বিস্তার

বিদ্রোহী নেতৃবর্গ

সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেউ বলেন ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগমণের আলোক-দিশারী। কেউ বা বলেন ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সঙ্গে এর কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। **বিদ্রোহীদের প্রতিবাদ ছিল মহাজন, জমিদার, রাজস্ব আদায়কারী এজেন্টদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।**

১৮৫৭ সালের মহা-বিদ্রোহের অগ্রদূত

১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বোধহয় ভারতে সব থেকে বড় **আদিবাসী অভ্যুত্থানের** সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আদিবাসীদের আদিম অস্ত্র শস্ত্র বৃটিশের বন্দুককে স্তব্ধ করতে পারেনি কিন্তু আত্মশক্তিতে নির্ভর করে যে প্রতিরোধ তারা গড়ে তুলেছিল, তা' ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাঁওতালরা ভারতের ছয়টি প্রাচীন বৃহৎ আদীবাসী গোষ্ঠীদের অন্যতম। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে শিক্ষিত এবং জমিদার শ্রেণীর ওপর নির্ভর করেছিল। আদিবাসীরা যখন দেখল তাদের ধর্মকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে, তাদের ঐতিহ্যবাহী রীতি, জনজীবনের অধিকার, বিচার পদ্ধতি, মর্যাদা সব কিছুই বাতিল করা হচ্ছে, তখনই তাদের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বৃটিশ প্রশাসনের নীতির ফলে সাধারণ জন-অসন্তোষ দেখা দেয়। আদিবাসী বিদ্রোহ এই জন-অসন্তোষ থেকে অভিন্ন ছিল না।

অভ্যুত্থানের কারণ

রাজনৈতিক

সামাজিক

অর্থনৈতিক

যে সমস্ত জমিতে সাঁওতালরা শত শত বছর ধরে চাষ আবাদ করে আসছিল, সেগুলিকে জমিদারদের হাতে তুলে দেওয়া হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে। তার পরই শুরু হল খাজনা বাড়ানোর দাবী। এই সব নতুন ব্যবস্থাকে সাঁওতালরা উপদ্রবমূলক মনে করতে লাগল। সাঁওতালরা ছিল স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়। তাই তারা কটক, ধলভূম, মানভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের জেলাগুলি থেকে সরে গেল। সেখান থেকে তারা রাজমহলের পর্বত বেষ্টিত সমতল ভূমিতে এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং জমিগুলিকে চাষের আওতায় নিয়ে এসে **মুক্ত অঞ্চল** গঠন করে।

রাজমহলে অভিবাসন

জমিদার, ব্যবসায়ী, ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার

কিন্তু এখানেও জমিদাররা তাদের বিব্রত করতে শুরু করলেন। তাঁরা নতুন পরিষ্কৃত জমির মালিকানা দাবী করতে লাগলেন। মহেশপুর ও পাকুড়ের রাজারা অ-সাঁওতাল বাঙ্গালী জমিদার এবং মহাজনদের সাঁওতাল গ্রামগুলি লীজ ভিত্তিতে জমা দিয়ে দিলেন। সুদের হার ছিল খুব বেশী। গ্রামের ময়রা ও বেনিয়া পরিবারভুক্ত ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের শোষণ করতে থাকে। রেলের সড়ক নির্মাণে এবং অন্যান্য সরকারী দপ্তরে নিযুক্ত ইউরোপীয়রাও অত্যাচার শুরু করে দিল। **দীর্ঘদিনের অত্যাচার অবশেষে তাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের পথে নিয়ে এল**। সরকার ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। ১৮৫৪ সালে তাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ অবশেষে আত্মপ্রকাশ করল মহাজন ও জমিদারদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ ডাকাতি করে কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে। পুলিশের দমন নীতি কেবল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ করল।

জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও সম্পদ লুন্ঠন

সাঁওতাল সমাবেশ ও বিদ্রোহ ঘোষণা

১৮৫৫ সালের গোড়াতে বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ থেকে ছয় থেকে সাত হাজার সাঁওতাল সমবেত হল—আগের বছরে তাদের সহযোগী বন্ধুদের ওপর যে শাস্তিবিধান করা হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নিতে। অন্যান্য সাঁওতালদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হল **শাল গাছের একটি প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে**। ১৮৫৫ সালের ৩০শে জানুয়ারী ভাগনা ডিহিতে দশ হাজার সাঁওতালের এক সমারেশে অত্যাচারী শাসনের অবসান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। জমিদারদের কাছে একটি চরম পত্রও পাঠানো হল। সরকার সাঁওতালদের পত্রগুলির ব্যাপারে বধির হয়ে রইলেন। ঐ সব অঞ্চলের কিছু অন্যান্য নীচু বর্ণের অ-সাঁওতালী অধিবাসীরা সাঁওতাল কৃষকদের সমর্থন করল। **জমিদার, মহাজন ও সরকার এই ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে সাঁওতাল কৃষকরা**

জমিদারদের কাছে চরম পত্র প্রেরণ

প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিদ্রোহীরা তাদের প্রাথমিক সাফল্যকে সুসংহত করে তাদের বিদ্রোহকে দ্রুত বিস্তৃত করে দিল। তারা গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে লড়াই করে যেতে থাকে। সশস্ত্র কৃষকেরা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শৃংখলাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যে ডাক, তার ও রেল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। তারা কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়েছে বলে ঘোষণা করল। অতঃপর ১৯শে জুলাই সামরিক আইন জারী করে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে নির্মমভাবে বিদ্রোহ দমন করা হল। জমিদার ও নীলকরেরা তাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে সরকারের পিছনে দাঁড়াল। এই সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন সিধু ও কানু নামে দুই সাঁওতাল ভ্রাতা।

গেরিলা যুদ্ধ

সামরিক আইন জারী ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমন

তাদের বীরত্ব সত্ত্বেও সাঁওতালরা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল যেখানে তাদের সাফল্য ছিল দুরাশা মাত্র। ভারতের বাকী অংশে কোন চাঞ্চল্য ছিল না এবং শক্তিশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমগ্র সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিল।

১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে **সিধু, কানু** ও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতারা বন্দী হলেন এবং তারপর তাদের মৃত্যু দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। পনের থেকে পঁচিশ হাজার সাঁওতাল প্রাণ হারান। ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া এবং ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় কঠোরতর শাস্তির দাবী করা হয়। বহু সংখ্যক সাঁওতাল কৃষক বন্দী হন। অবশ্য তাদের অপরাধ সপ্রমাণ করার মত সাক্ষী মেলা কঠিন হয়েছিল।

কানু ও অন্যান্য বিদ্রোহীরা ধৃত এবং তাদের ফাঁসী

যদিও সাঁওতাল বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হয়েছিল, তবুও একদিকে এর গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল। যে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে ইতিপূর্বে ভেঙ্গে দিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, সেগুলিকে পুনর্গঠিত করে একটি পৃথক অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এই অঞ্চল **সাঁওতাল পরগণা** নামে পরিচিত হল। সাঁওতালরা অন্ততঃ একটি জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে তাদের প্রাপ্য মর্যাদার স্বীকৃতি আদায়ে সফল হয়েছিল। এছাড়াও এই বিদ্রোহ নীল বিদ্রোহে প্রেরণা যুগিয়েছিল। ডঃ এস্, বি, চৌধুরীর মতে যদিও এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল এবং বিদ্রোহের ক্ষতগুলি শুকিয়ে গিয়েছিল, তবুও এই অভ্যুত্থান একটি বিষাদজনক এবং শিক্ষাদায়ক আঘাতের মত স্থায়ী হয়েছিল। ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তির নীচে যে অগ্নি উদ্‌গীরণকারী স্তরগুলি অবস্থান করছিল এই অভ্যুত্থান তার সংকেত দিয়েছিল।

ফলাফল

নতুন সাঁওতাল পরগণা গঠন

নীল বিদ্রোহে প্রেরণা

বৃটিশ শাসনের ভিত্তির নীচে আগ্নেয়গিরির প্রজ্বলন্ত স্তর

কোলি ঃ কোলিদের জনবসতি ছিল থানা জেলায় পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ওপর এবং নীচে। তবে মোটামুটি কাছ থেকে পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় তারা ছড়িয়ে ছিল। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের কোলিরা বিদ্রোহী হয়; তাদের প্রারম্ভিক কিছু সাফল্যও হয়।

রামজী ভাংগ্রিয়া নামে এক কোলি পুলিশ অফিসার এক সরকারী আদেশের প্রতিবাদে পদত্যাগ করে। এছাড়া স্থানীয় দুর্গগুলি ভেঙ্গে ফেলার জন্য কোলিদের মধ্যে ব্যাপক বেকার সমস্যা দেখা দিয়ে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

সাতারার রামোসিদের সফল বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত হয়ে ভাংগ্রিয়ার নেতৃত্বে কোলিরা ১৮২৮ সালে বিদ্রোহ করে এবং কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলে। তাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী নিযুক্ত হয়। কোলিদের গুপ্ত আশ্রয় বহু কষ্টে তারা খুঁজে বের করে এবং সাময়িকভাবে বিদ্রোহ থেমে যায়। কিন্তু আবার ১৮৩৯ সালে কোলিরা সহ্যাদ্র পর্বতমালা অঞ্চলের অনেকগুলি গ্রাম লুঠপাট করে। পার্বত্য অঞ্চলের দুর্ধর্ষ গোষ্ঠীরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এবার তিন ব্রাহ্মণ ভাউখারে, চিম্‌নাজি-যাদব এবং নানা দরবারে সম্ভবতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এদের নেতৃত্ব দেয়। এটিকে ঠিক পার্বত্য উপজাতিদের স্বাভাবিক বিস্ফোরণ বল চলে না। পেশোয়ার পুনর্বাসনের চিন্তাও তারা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ সফল হয় না। ১৮৪৪ সালে আবার রঘু ভাংগ্রিয়া এবং বাপু ভাংগ্রিয়ার নেতৃত্বে কোলিরা ব্যাপকভাবে গোলমাল শুরু করে। পুণার উত্তর পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চলে তাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। তারা নাসিক ও আহমদনগরে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করে। ১৮৪৪ সালে রঘু ভাংগ্রিয়ার দল কিছু পুলিশকে হত্যা করে। ১৮৪৫ সালে বিদ্রোহ পুরন্দর ও সাতারায় ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়। ১৮৪৫ সালের আগস্ট মাসে বাপু ভাংগ্রিয়া ধরা পড়ে কিন্তু তার অনুগামীরা লুণ্ঠন কাজ চালিয়ে যায়। তাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল পুলিশ, মহাজন এবং সরকারের টাকা। সেনাবাহিনীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকে দমন করা হয়। ১৮৪৬ সালে কিছু বিদ্রোহী ধরা পড়লেও, রঘু ভাংগ্রিয়া পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে সে ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসী হয়। ১৮৫০ সালের মধ্যে বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়।

দশম অধ্যায়

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের সূচনা হলেও সারা ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার সহজ হয়নি। পলাশীর পরবর্তী প্রায় একশো বছর ধরে কিভাবে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ক্লাইভ থেকে শুরু করে ডালহৌসী পর্যন্ত ইংরাজ শাসনকর্তারা মারাঠা, মহীশূর, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ছোট-বড় বহু ভারতীয় রাজ্য একের পর এক গ্রাস করেছিলেন। যদিও ভারতীয়দের মধ্যে তখন রাজনৈতিক চেতনা ও স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ হয়নি, তবুও পুরাতন রাজবংশের উচ্ছেদ এবং প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

ভূমিকা

পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব সম্বন্ধে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সচেতন ছিল না। কিন্তু মীরজাফর ও মীরকাসিম ইংরাজদের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তার ফলে রাজকোষে অর্থাভাব দেখা দেয়। তাছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থলিপ্সা, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার দোষত্রুটি ইত্যাদির ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই অর্থনৈতিক শোষণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

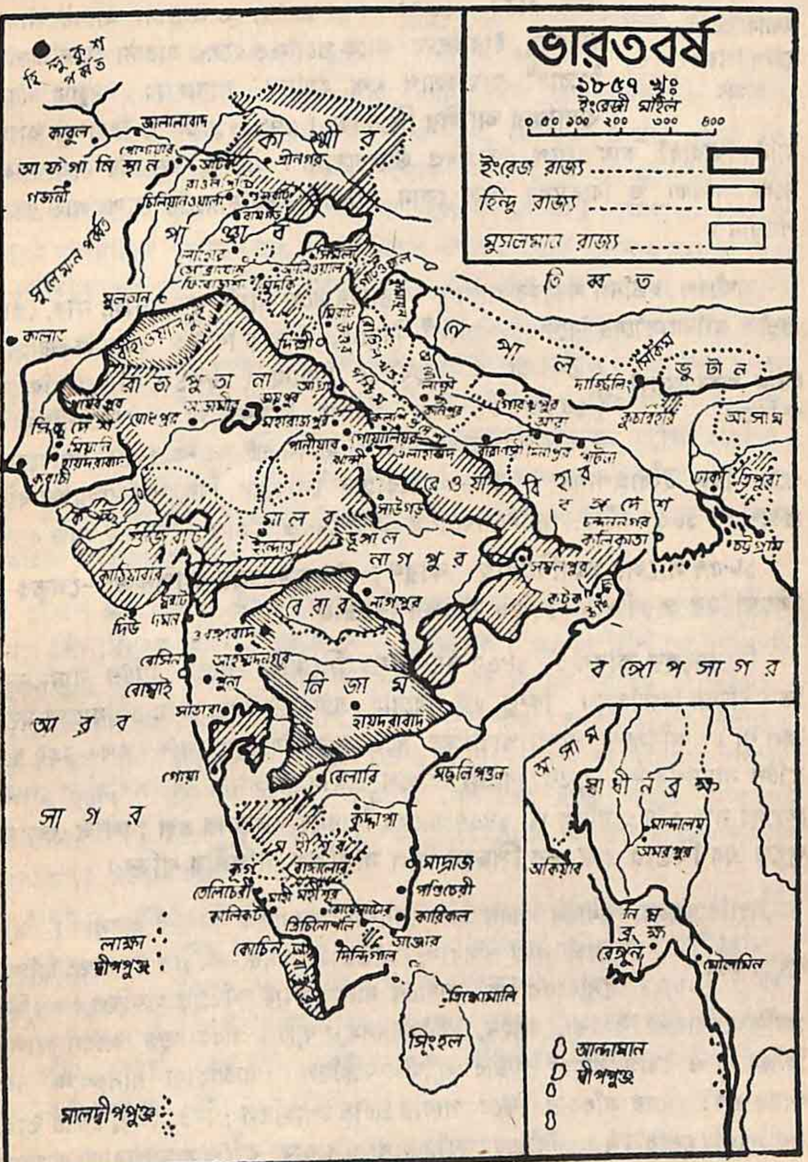
অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দেশের আর্থিক দুরবস্থা

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদাচ্যুত ব্যক্তিরাও ইংরাজশাসন-বিরোধী ছিলেন। এঁদের মধ্যে মেদিনীপুরের জমিদার, বীরভূমের রাজা এবং বর্ধমানের মহারাজার বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। নবাবের উচ্চপদস্থ ও প্রভাবশালী কর্মচারী **মহারাজ নন্দকুমার** পণ্ডিচেরীর ফরাসী সরকারের সঙ্গে তাঁর গোপন যোগাযোগ ও কোম্পানীর শাসন-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য ইংরাজদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। অবশ্য ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে অন্য এক অভিযোগে তাঁকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ নন্দকুমারকে ইংরাজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রথম শহীদ বলে আখ্যা দিলেও ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে একমত নন।

বাংলায় জমিদারদের বিদ্রোহ

মহারাজ নন্দকুমার

টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর মহীশূরে **ধুন্দিয়া** নামে এক বীর নায়কের নেতৃত্বে


ভারতবর্ষ
১৮৫৭ খৃঃ
ইংরেজী মাইল
০ ৫০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০
ইংরেজ রাজ্য
হিন্দু রাজ্য
মুসলমান রাজ্য
হিন্দুকুশ পর্ব্বত
কাবুল
জালালাবাদ
আফগানিস্থান
গজনী
পেশোয়ার
কাশ্মীর
শ্রীনগর
পাঞ্জাব
লাহোর
সুলেমান পর্ব্বত
মুলতান
কালাট
তিব্বত
নেপাল
সিকিম
ভুটান
দার্জিলিং
কুচবিহার
আসাম
দিল্লী
রাজপুতানা
আগ্রা
জয়পুর
আজমীর
যোধপুর
মহারাজপুর
সিন্ধুদেশ
হায়দরাবাদ
করাচী
গোয়ালিয়র
ঝান্সী
এলাহাবাদ
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
আরা
পাটনা
বিহার
রেওয়া
বঙ্গদেশ
চন্দননগর
কলিকাতা
ঢাকা
ত্রিপুরা
চট্টগ্রাম
মালব
ভূপাল
ইন্দোর
গুজরাট
কাথিয়াবার
সুরাট
দিউ
দমন
নাগপুর
বেরার
সম্বলপুর
কটক
বঙ্গোপসাগর
নিজাম
হায়দরাবাদ
ঔরঙ্গাবাদ
আহম্মদনগর
বেসিন
পুনা
বোম্বাই
সাতারা
আরব সাগর
গোয়া
বেলারি
কুদ্দাপা
মছলিপত্তন
মহীশূর
কুর্গ
ব্যাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
কারিকল
তেলিচেরী
কালিকট
ত্রিচিনোপলি
তাঞ্জোর
কোচিন
দিন্দিগাল
লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ
মালদ্বীপপুঞ্জ
সিংহল
ত্রিঙ্কোমালি
আসাম
স্বাধীন ব্রহ্ম
মান্দালয়
অমরপুর
আকিয়াব
নিম্ন ব্রহ্ম
রেঙ্গুন
মৌলমিন
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

কিছুকাল বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম চলেছিল। শেষ পর্যন্ত ওয়েলেসলি এই বিদ্রোহ দমন করেন (১৮০০)। পেশোয়া ও অন্যান্য মারাঠা সামন্ত-নায়করা, ইংরাজদের কাছে পরাজিত হলেও মারাঠা রাজ্যে ইংরাজ বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। অযোধ্যার পদচ্যুত নবাব **ওয়াজির আলির বিদ্রোহ** (১৭৯৯-১৮০০), ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে বৃটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধের ফলে কোন প্রচেষ্টাই সর্বভারতীয় রূপ লাভ করতে পারেনি।

অন্যান্য রাজ্যে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের অন্যান্য বিদ্রোহের মধ্যে খাসী, খন্দ, ভীল, নীর, কোল প্রভৃতি আদিবাসীদের বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, ফেরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলন ও তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩১), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী বর্জিত হলেও এই সব স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহগুলি ছিল ইংরাজশাসন ও রাজ-কর্মচারীদের শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে এই বিক্ষোভ চূড়ান্ত অভিব্যক্তি লাভ করে।

ইংরাজ শাসন-বিরোধী গণবিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ—কারণ ঃ গণ-সমর্থনের ব্যাপকতা—নেতৃত্ব—বিদ্রোহের প্রকৃতি ঃ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণ ঃ ১৮৫৭ সালের **মহাবিদ্রোহ** ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহ একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতন ছিল না। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পলাশীর যুদ্ধ থেকে একশত বছর ধরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় অভ্যুত্থান এবং অসামরিক গোলযোগের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের **নতুনত্ব হল বিশাল এলাকা জুড়ে এর বিস্তার এবং এর পিছনে ছিল সামরিক বাহিনীর শক্তি।**

মহাবিদ্রোহের সাধারণ কারণ হল পুরাণো রাজনৈতিক শাসনের অবসান। যার ফলে রাজ পরিবার, অভিজাত সামন্ত, কর্মচ্যুত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈনিকের দল, সাধারণ মানুষ সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বৃটিশ প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থা, আইন, প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃটি। অধিকারভুক্ত অঞ্চলে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা ও যোগাযোগের অভাব সৃষ্টি করেছিল। রাজ্যহারা শাসকবৃন্দ এবং সামন্তশ্রেণী তাদের অধিকার ফিরে পাবার প্রয়াস পেয়েছিল; কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা জন সমর্থন পেয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর চাপা অসন্তোষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অত্যাচারী প্রকৃতি এবং অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে। তাদের এই শাসন পদ্ধতির ভাঙ্গন দেখা দেয় ১৮৫৭ সালে সশস্ত্র সিপাহীদের বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে।

সাধারণ কারণ

ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে সৃষ্ট ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব এবং আরও কয়েকটি কারণের সমাবেশে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই ছিল এদেশীয় সিপাই। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য এই সৈন্যদের বীরত্ব, যোগ্যতা ও আনুগত্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের তুলনায় এদেশীয় সৈন্যদের বেতন, মর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছিল অত্যন্ত কম। যোগ্যতা থাকলেও তাদের পদোন্নতির পথ ছিল বন্ধ। সদ্যনিযুক্ত তরুণ শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের সমতুল্য বেতন ও মর্যাদালাভের জন্য একজন ভারতীয় সিপাইকে প্রায় তিরিশ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। এ ছাড়া প্রায়ই অন্যায় ও অযৌক্তিক কঠোর আদেশের ফলে ভারতীয় সিপাইদের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস আহত হত। এই সব বিভিন্ন কারণে ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন টমাসনের (Thomasson) জমির ওপর ধার্য কর অতিরিক্ত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে বেঙ্গল আর্মিতে আগত পশ্চিমা সিপাইরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ভারতীয় সিপাইদের প্রতি অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণ

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ঐতিহাসিক বিদ্রোহের পূর্বেই একাধিকবার বিক্ষিপ্ত ভাবে সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে ভেলোরের বিদ্রোহ এবং ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ব্যারাকপুরের সিপাই বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে আসাম, সোলাপুর, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানেও সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিদ্রোহী নেতাদের আত্মদান সিপাইরা বিস্মৃত হয়নি। এই সব বিদ্রোহ ভারতীয় সিপাইদের মধ্যে গভীর ও ব্যাপক অসন্তোষের ইঙ্গিত করলেও বেতন, ভাতা, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণের অবসান হয়নি।

ইতিপূর্বে প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় (১৮৪১) হিন্দু সৈন্যরা সিন্ধুনদ পার হয়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে আপত্তি ও বিক্ষোভ জানিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সময় (১৮৫২) যখন সিপাইদের সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশে যেতে বাধ্য করা হয় তখন তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। সমুদ্রযাত্রায় জাতিনাশের আশঙ্কাই ছিল হিন্দু সিপাইদের আপত্তির কারণ।

হিন্দু সিপাইদের সমুদ্রযাত্রায় আপত্তি

বিভিন্ন কারণে সিপাইরা যখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ঠিক সেই সময় **এনফিল্ড রাইফেল নামে** এক নতুন ধরনের বন্দুকের প্রবর্তন সিপাইদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে। **গুজব প্রচারিত হয় যে এই বন্দুকের টোটা শূকর ও গরুর চর্বিতে প্রস্তুত এবং হিন্দু ও মুসলমান সিপাইদের জাতিধর্ম নষ্ট করবার কুমতলবেই এই টোটার ব্যবহার**

এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন

বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই গুজব ঘৃতাগ্নির মত সিপাইদের ইংরাজ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হয়। এই কারণে এন্ফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তনকে সিপাই বিদ্রোহের আশু ও প্রত্যক্ষ কারণ মনে করা হয়।

সিপাইদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভই ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের একমাত্র কারণ ছিল না। নানাবিধ কারণে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভারতীয়দের মনে ইংরাজ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যগ্রাস নীতি ভারতীয় রাজ্যগুলিকে আশঙ্কিত করে তুলেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তারের ফলে শুধুমাত্র যে দেশীয় রাজারা রাজ্য ও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল তা নয়, রাজ্যের জমিদার, তালুকদার, কর্মচারী, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি সকলেরই স্বার্থহানি ঘটেছিল। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের এক লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, যে সব রাজ্যের রাজা, সামন্তশ্রেণী, সৈন্যদল ইত্যাদি ক্ষমতা ও মর্যাদাচ্যুত হয়েছিল; সেই সব রাজ্যের বিদ্রোহ ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করেছিল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানাসাহেব, ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, জগদীশপুরের (বিহার) কুনওয়ার সিংহ, দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ প্রভৃতি ব্যক্তিরা, যাঁরা বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিলেন অথবা বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরা সকলেই কোন না কোন কারণে আগে থেকেই ইংরাজদের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

কোম্পানীর রাজ্যগ্রাস নীতির প্রতিক্রিয়া

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থিতি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবার পর ইংরাজ সরকারের উদ্যোগে একাধিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল। এইগুলির মধ্যে সতীদাহ প্রথার বিলোপ, ধর্মান্তরিত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের দাবী স্বীকার, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদি সংস্কারমূলক ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রগতিশীল জনমতের সমর্থন লাভ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের কার্যকলাপ এবং সরকারী নীতির ফলে বহু গোঁড়া হিন্দুর মনে আশঙ্কা দেখা দেয় যে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে বিনষ্ট করাই ইংরাজ সরকারের গোপন উদ্দেশ্য। যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ডালহৌসীর আমলে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এই আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হয়। রক্ষণশীল হিন্দুদের সন্দেহ ও অসন্তোষ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংরাজ-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি করে।

সংস্কার প্রবর্তনের ফলে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

ঘটনাচক্রে সিপাই বিদ্রোহের অনতিকালপূর্বে দুটি ধারণা বা বিশ্বাসের ব্যাপক প্রচলন বিদ্রোহীদের আশাবাদী করে তুলেছিল। ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-১৮৫৬) রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ী

সমসাময়িক দুটি বহুল প্রচলিত ধারণার প্রভাব

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের দুর্বলতার প্রকাশ

হয়েও ইংলণ্ডের সামরিক বিভাগের অব্যবস্থা ও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। এর ফলে ভারতে আসন্ন ইংরাজ-বিরোধী বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারীদের মনে হয়েছিল যে কোন ব্যাপক বিদ্রোহ ইংরাজবাহিনীর পক্ষে দমন করা সম্ভব হবে না। এই বিশ্বাস বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করে।

ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের সূচনা হয়েছিল। একটি বহুল প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে ভারতে ইংরাজ শাসন একশো বছর স্থায়ী হবে। ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসী বহুলোকের ধারণা ছিল যে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে শতবর্ষপূর্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হবে। এই দুটি বিশ্বাস সিপাইদের বিদ্রোহ ঘোষণার সময়ের প্রকৃষ্টতা এবং ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত করেছিল।

বিদ্রোহের গতি ঃ পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর এবং কলিকাতার নিকটবর্তী **ব্যারাকপুরে** সিপাই বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়। ব্যারাকপুরের ঘটনার জন্য সিপাই **মঙ্গল পাণ্ডে** মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু এই দুটি ঘটনা প্রকৃতপক্ষে আদেশ অমান্যের ঘটনা ছিল। সঙ্ঘবদ্ধ-বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয় মীরাটে (১০ মে, ১৮৫৭)। বিদ্রোহী সিপাইরা বহু ইংরাজকে হত্যা করে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং দিল্লী অধিকারের পর তারা বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে (১২ মে, ১৮৫৭)। দিল্লীর পতনের সংবাদ সমগ্র দেশে দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং বিদ্রোহ চতুর্দিকে দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে। উত্তর ভারতের অযোধ্যা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, মধ্য ভারতের ঝান্সি এবং বিহারের জগদীশপুরে বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা গভীর, ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারন করে। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কানপুরে **নানাসাহেব,** মধ্য ভারতে ঝান্সির **রাণী লক্ষ্মীবাঈ,** মারাঠা বীর **তাঁতিয়া তোপি** এবং জগদীশপুরের জমিদার **কুনওয়ার সিংহ।** বৎসরাধিক কাল ধরে এই বিদ্রোহ চলেছিল এবং এক সময় বিদ্রোহের সাফল্য ও ইংরাজ-শাসনের উচ্ছেদের সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে হয়েছিল।

বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ



রাণী লক্ষ্মীবাঈ

কিন্তু শেষ পর্যন্ত হ্যাভেলক, নীল, স্যার কলিন ক্যাম্পবেল, হিউ রোজ প্রমুখ ইংরাজ সেনাপতিদের নেতৃত্বে ইংরাজবাহিনী কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, ঝান্সি ও দিল্লী প্রভৃতি স্থান পুনরুদ্ধারে ও বিদ্রোহ দমনে সফল হয়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। ভারতে বৃটিশ অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে **রাণী লক্ষ্মীবাঈ** ও **কুনওয়ার সিংহ** যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন। নানাসাহেব নিরুদ্দেশ হন। তাঁতিয়া তোপি বন্দী হন ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বন্দী বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

বিদ্রোহের ব্যর্থতা

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণঃ ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ নয়। ব্যাপক বিস্তার লাভ করলেও এই বিদ্রোহ জনসাধারণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করতে পারেনি। অযোধ্যা প্রভৃতি দুই একটি অঞ্চলে মাত্র এই বিদ্রোহ গণসমর্থনপুষ্ট হয়ে জাতীয় রূপ লাভ করেছিল। পাঞ্জাবের শিখরা বিদ্রোহে যোগদানের পরিবর্তে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেছিল। বহু দেশীয় রাজাও সঙ্কটমুহূর্তে ইংরাজ সরকারের পক্ষ সমর্থন করে বিদ্রোহদমনে সহায়তা করে। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয়রাও ইংরাজদের প্রতি আনুগত্য ও সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন।

গণসমর্থন ও সহানুভূতির অভাব

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীরা বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করার ফলে এই বিদ্রোহ পূর্ণশক্তি ও বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কার্যপদ্ধতি, আদর্শ ও সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন ঐকমত্য ছিল না। ইংরাজ-প্রভুত্বের উচ্ছেদের পর দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গঠন সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণার অভাব ছিল। মতৈক্যের ও সংহতির অভাব বিদ্রোহের অন্যতম দুর্বলতা ছিল।

বিদ্রোহীদের মধ্যে সংহতি ও সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে মতৈক্যের অভাব

সামরিক উপকরণ, রণ-কৌশল ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও বিদ্রোহীরা ইংরাজবাহিনীর তুলনায় হীনবল ছিল। যোগাযোগ-ব্যবস্থাও ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। রণক্ষেত্রে রাণী লক্ষ্মীবাঈ অসীম সাহস ও অপূর্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করার মত সামরিক অভিজ্ঞতা ও কূটবুদ্ধি তাঁর ছিল না। অন্যান্য বিদ্রোহী নেতারাও প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি।

সামরিক উপকরণ ও রণ-কৌশলে ইংরাজদের শ্রেষ্ঠত্ব

উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব

বিদ্রোহের প্রকৃতিঃ ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। একটি মতানুসারে এই বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। সুস্পষ্ট দুর্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ভারতীয়দের স্বাধীনতাস্পৃহার

বিভিন্ন মত

প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল। ভারতে বৃটিশ শক্তির উচ্ছেদই ছিল এই পূর্বপরিকল্পিত ও সংগঠিত রাজনৈতিক ও সামরিক উত্থানের উদ্দেশ্য। সব ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মর্যাদা দানে সম্মত নন। বৃটিশ লেখকগণ যেমন, ডাফ (Dult), ম্যালেসন (Malleson), কে (Kaye), বল (Ball) প্রভৃতি তাঁদের মহাবিদ্রোহের ওপর লেখা গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে দেখেছেন জনগণের বিদ্রোহ হিসেবে। তাঁদের মতে এটা নিছক সিপাহীদের বিদ্রোহ ছিলনা বরং এটা ছিল ভারত থেকে বৃটিশদের বিতাড়িত করার একটা সংঘবন্ধ প্রয়াস। যেহেতু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটতে শুরু করেছিল, সেইজন্য কিছু ভারতীয় নেতা এই মতকে সমর্থন করেছিলেন। ভি. ভি সাভারকর তাঁর **'ওয়ার অফ্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্'** গ্রন্থে বলেছেন যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল **পরিকল্পিত এবং সংগঠিত সামরিক অভ্যুত্থান যার লক্ষ্য ছিল ভারতে বৃটিশ শক্তির ধ্বংস সাধন।**

(১) ১৮৫৭-এর বিদ্রোহই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ

কিন্তু অধ্যাপক অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সিপাহীদের বিদ্রোহ জাতীয় মাপের ছিল না ; তাদের অভ্যুত্থান ছিল অঞ্চল বিশেষে সীমাবন্ধ, সংকুচিত আকারের এবং অসংবন্ধ। সমসাময়িক বাঙ্গালী কিশোরী চাঁদ মিত্র, হরিশ মুখার্জী, এ ভিন্ন স্যার সৈয়দ আহমদ মনে করতেন অযোধ্যা ছাড়া এটি মূলতঃ সিপাহীদের বিদ্রোহ। কলকাতার বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন এর বিপক্ষে ছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে এই বিদ্রোহ মূলত ছিল বিক্ষুব্ধ সিপাইদের বিদ্রোহ। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যাপক ষড়যন্ত্রের পূর্ব-পরিকল্পনা করা হয়নি। কয়েকটিমাত্র অঞ্চলে এই বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র স্বদেশপ্রেমের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অধিকাংশই এই প্রবল বিদ্রোহের ফলে রাজশক্তি ও শাসন-ব্যবস্থা বিপন্ন হওয়ায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত মনে করে তৎপর হয়েছিল। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয়রাও এই হিংসাত্মক রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানকে নিন্দা করে ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের বেশীর ভাগই ইংরাজ-সমর্থক ও নিশ্চেষ্ট ছিল। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকে বৃটিশবিরোধী এক বিরাট, ব্যাপক ও প্রচন্ড সংগ্রাম বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত করার কোন সর্বজনীন আদর্শ ও লক্ষ্যের অনুপস্থিতিতে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহকে কোন মতেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আখ্যা দেওয়া যায় না।

(২) মূলতঃ সিপাইদের বিদ্রোহ ঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া চলে না

উপরোক্ত দুটি পরস্পর-বিরোধী মতবাদ ছাড়া ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও ১৮৫৭-এর

রক্তাক্ত সংগ্রামকে কোন কোন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন। এঁদের অন্যতম হলেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর মতে সিপাই বিক্ষোভের ফলে শুরু হলেও এই বিদ্রোহ অসামরিক জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। সিপাইদের মধ্যে আরম্ভ হলেও শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই এই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষ এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল ও নানা স্থানে সিপাই বিদ্রোহ গণসমর্থনও লাভ করেছিল। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন রাজ্যে এই বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল। দোয়াব অঞ্চলে ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগ ও ক্ষোভ ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সামন্ত শ্রেণী তাদের হারানো সুযোগ সুবিধাগুলি ফিরে পেতে চেয়েছিল। একটা অরাজক আবহাওয়ার সুযোগে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার মতলব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অধ্যাপক অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী লিখছেন যে সীমিত অঞ্চলে যেখানে অসামরিক জনগণ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল, সেখানকার শাসক গোষ্ঠী এবং তাদের অনুগতরা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সব জায়গায় সাম্প্রদায়িক ঐক্যও সংগঠিত হয়নি। ১৮৫৭ সালের মে মাসে দিল্লীর জুম্মা মসজিদে মুসলমানরা ইংরাজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে, কিন্তু বেরিলি, বিজনোর, মোরাদাবাদে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়।

(৩) সিপাই বিদ্রোহ কোন কোন অঞ্চলে জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল

ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগ

কোন কোন অঞ্চলে শাসক গোষ্ঠী বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিল।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অভাব

বিদ্রোহীদের মধ্যে সম্মিলিত রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না। মুঘল সম্রাটের এবং অযোধ্যায় নবাবের পুনর্বাসন, রোহিলখণ্ডে রোহিলাদের শাসন ফিরিয়ে দেওয়া এবং নানা সাহেবকে পেশোয়া হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া আসলে পরিস্থিতির ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সুপরিকল্পিত জবাব ছিল না। এগুলি বৃটিশ শাসনের জায়গায় সারা ভারতে, এমন কি ভারতের এক বৃহৎ অংশে, একটি সুগ্রথিত দেশীয় শাসন ব্যবস্থার ধরণ ধারণের সঙ্গে মিল খায়না বলে তার পরিবর্ত হতে পারেনি।

বিভিন্ন নেতাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য

বিদ্রোহী নেতাদের পরিকল্পনা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিকল্প ছিল না

এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলা যায় না। এটা ছিল বিভিন্ন নেতাদের পারস্পরিক বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত পরপর কয়েকটি যুদ্ধ। দেশের বৃহত্তর অংশ এবং জনসাধারণ এই বিদ্রোহে অংশ নেয়নি। মুঘল শাসনের স্মৃতি বিজড়িত যুগ বিরোধী রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল এর উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গঠিত নতুন ভারতের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি ছিল না। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে

স্বাধীনতার সংগ্রাম বলা যায় না

যুগের বিরোধী ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা

যখন বিদ্রোহ শ্রু হয় তখনও ভারতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বিদ্রোহীদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল সংস্কারের ও প্রগতিশীলতার বিরোধী। কিন্তু তবুও এই বিদ্রোহ ছিল অবশ্যম্ভাবী। কোনও জাতি চিরকাল বিদেশী প্রভুত্ব সহ্য করতে পারে না। শিক্ষিত ভারতীয়রা বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, তার কারণ তাঁরা এদেশে বৃটিশ সরকারের প্রগতিশীল নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আস্থাবান ছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এই শিক্ষিত সমাজের কাছে বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক উপায়ে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

শিক্ষিত ভারতীয়দের বিদ্রোহের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কারণ বিশ্লেষণ

ফলাফল ও গুরুত্ব: পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যর্থ হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের গুরুত্ব উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশ ও অগ্রগতিতে এই বিদ্রোহ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিক্ষুব্ধ ভারতীয় জনগণের সম্ভাব্য বিদ্রোহের শক্তি ইংরাজ সরকারকে চিন্তিত করে তুলেছিল। প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হলে কতখানি বিপন্ন ও অসহায় বোধ করতে পারে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। **১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের স্মৃতি পরবর্তী যুগে ভারতীয় বিপ্লববাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।**

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের প্রভাব

ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

১৮৫৭-এর বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এই বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ডের শাসনকর্তারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ও ভারতীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ-ভারতের শাসনভার রাণী ভিক্টোরিয়া নিজে গ্রহণ করেন। কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়। এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা (১ নভেম্বর, ১৮৫৮) তিনি ভারতীয়দের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। প্রজাকল্যাণ, ন্যায়নীতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করার আশ্বাস তিনি প্রদান করেন। চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসানের কথাও তিনি ঘোষণা করেন।

ভারতে নতুন যুগের সূচনা

কোম্পানীর শাসনের অবসান ঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র

ভারতীয় শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়। ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য ভারত-শাসন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত হন। তিনি **'ভারত-সচিব'** নামে (Secretary of State for India) পরিচিত হন। তাঁকে উপদেশ দান ও সহায়তা

করার জন্য পনের জন সদস্যবিশিষ্ট একটি **কাউন্সিল** (Council of India) গঠিত হয়। ভারতের গভর্নর-জেনারেল **'ভাইসরয়'** (Viceroy) বা রাণীর প্রতিনিধি আখ্যা লাভ করেন। ডালহৌসীর পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল **লর্ড ক্যানিং ছিলেন ভারতের প্রথম ভাইসরয়।** ভারতস্থ ইংরাজ সৈন্যবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রোধ এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

বংশাবলী

হিন্দুযুগ

১। মৌর্য বংশ

চন্দ্রগুপ্ত
|
বিন্দুসার
|
অশোক প্রিয়দর্শী

(অশোকের পর আরও সাত জন রাজা রাজত্ব করেন।)

২। গুপ্তবংশ

- গুপ্ত
  - ঘটোৎকচ
    - ১ম চন্দ্রগুপ্ত = কুমারদেবী (লিচ্ছবি)
      - সমুদ্রগুপ্ত
        - ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
          - ১ম কুমারগুপ্ত
            - স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য
            - পুরুগুপ্ত
              - নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য
                - ২য় কুমারগুপ্ত
                  - বিষ্ণুগুপ্ত
              - বুধগুপ্ত
            - ঘটোৎকচ গুপ্ত
          - প্রভাবতী (বাকাটক রাজমহিষী)

সুলতানা যুগের মুসলমান রাজবংশসমূহ (সিংহাসনারোহণের তারিখসহ)

১। দাশ রাজবংশ

(১) কুতবুদ্দিন (১২০৬)

(২) আরাম (১২১০)   (৩) (ইলতুৎমিস ১২১১) = কন্যা   (৯) গিয়াসুদ্দীন বল্‌বন্‌ (১২৬৬)

(৪) রুকনুদ্দিন (১২৩৬) (৫) রজিয়া (১২৩৬) (৬) বাহ্‌রাম (১২৪০)   (৮) নাসিরুদ্দীন — কন্যা (১২৪৬)   বঘরা খাঁ

(৭) মাসুদ (১২৪২)   (১০ কায়কোবাদ (১২৮৭)

২। খল্‌জী বংশ

(১) জালালুদ্দীন খল্‌জী (১২৯০)
(২) আলাউদ্দীন খল্‌জী (জালালের ভ্রাতুষ্পুত্র) (১২১৬)
(৩) আলাউদ্দীনের শিশুপুত্র (৩৫ দিন)
(৪) কুতবুদ্দীন মবারক শাহ্‌ (আলাউদ্দীনের পুত্র) (১৩১৬)
(৫) খসরু (অনধিকারী) (১৩২০)

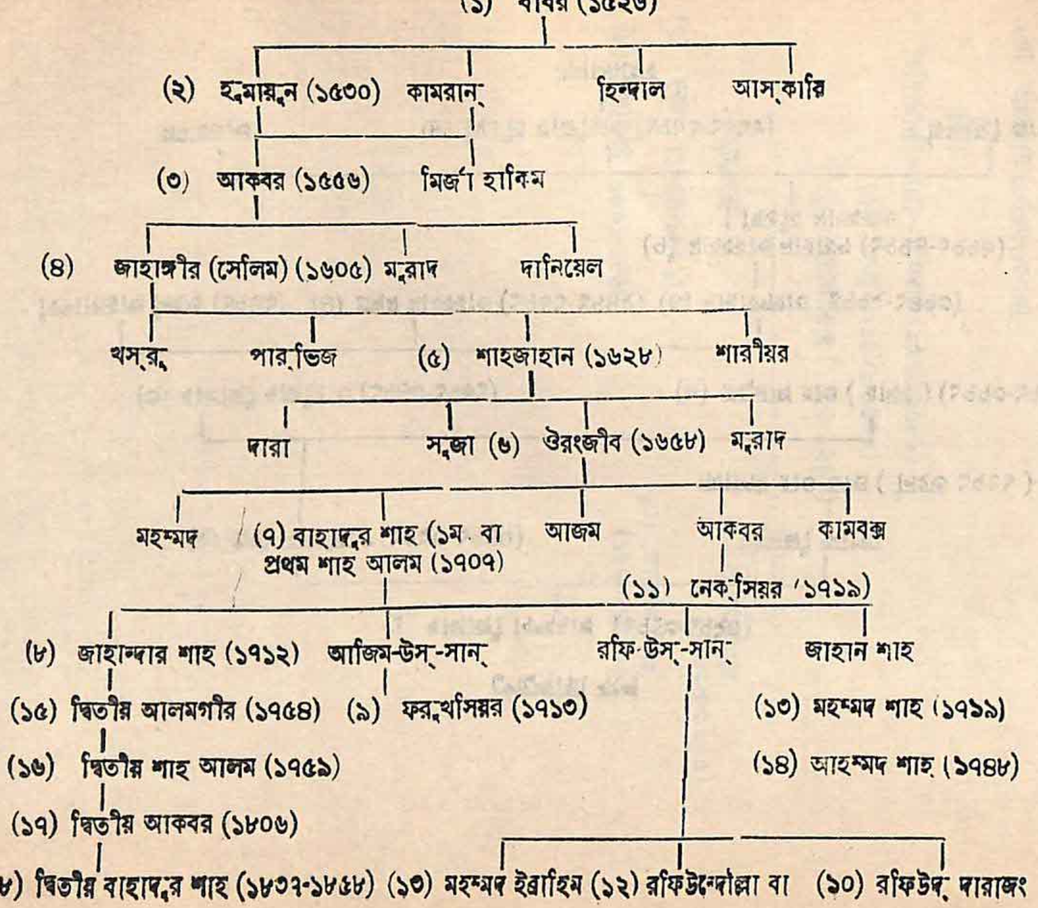
৩। তুঘ্‌লক বংশ

(১) গিয়াসুদ্দীন তুঘ্‌লক (১৩২০)
(২) মহম্মদ তুঘ্‌লক (গিয়াসের পুত্র) (১৩২৫)
(৩) ফিরোজশাহ্‌ তুঘ্‌লক (মুহম্মদের জ্ঞাতি ভ্রাতা) (১৩৫১)
(এর পর কয়েকজন নামে মাত্র রাজা সিংহাসনে বসেছিলেন।)

৪। লোদী বংশ

(১) বাহ্‌লুল লোদী (১৪৫১)
(২) সিকন্দর লোদী (বাহ্‌লুলের পুত্র) ১৪৮৯)
(৩) ইব্রাহিম লোদী (সিকন্দরের পুত্র) (১৫১৭)

মুঘল বংশ


(১) বাবর (১৫২৬)
(২) হুমায়ুন (১৫৩০)
কামরান্
হিন্দাল
আস্কারি
(৩) আকবর (১৫৫৬)
মির্জা হাকিম
(৪) জাহাঙ্গীর (সেলিম) (১৬০৫)
মুরাদ
দানিয়েল
খস্রু
পার্ভিজ
(৫) শাহজাহান (১৬২৮)
শারীয়র
দারা
সুজা
(৬) ঔরংজীব (১৬৫৮)
মুরাদ
মহম্মদ
(৭) বাহাদুর শাহ (১ম বা প্রথম শাহ আলম (১৭০৭)
আজম
আকবর
কামবক্স
(১১) নেক্সিয়র (১৭১৯)
(৮) জাহান্দার শাহ (১৭১২)
আজিম-উস্-সান্
রফি-উস্-সান্
জাহান শাহ
(১৫) দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪)
(৯) ফর্রুখসিয়র (১৭১৩)
(১৩) মহম্মদ শাহ (১৭১৯)
(১৬) দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯)
(১৪) আহম্মদ শাহ (১৭৪৮)
(১৭) দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬)
(১৮) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৮)
(১৩) মহম্মদ ইব্রাহিম
(১২) রফিউদ্দৌল্লা বা
(১০) রফিউদ্ দারাজং

পেশোয়া বংশ

- (১) বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০)
  - (২) প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০)
    - (৩) বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-১৭৬১)
      - বিশ্বাসরাও নিহত (১৭৬১)
      - (৪) প্রথম মাধবরাও (১৭৬১-১৭৭২)
      - (৫) নারায়ণরাও (১৭৭২-১৭৭৩)
        - (৭) মাধবরাও নারায়ণ (১৭৭৪-১৭৯৬) (দ্বিতীয় মাধবরাও)
    - (৬) রঘুনাথ রাও (রাঘব) (১৭৭৩-১৭৭৪)
      - অমৃতরাও
      - (৮) দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৬-১৮১৮)
        - নানাসাহেব
      - চিমনজী আপ্পা
  - চিমনজী আপ্পা
    - সদাশিব রাও ভাও (নিহত ১৭৬১)

শিখ গুরুগণ

(১) নানক (১৪৬৯-১৫৩৮)

(২) অঙ্গদ (গুরুপদে স্থিতিকাল ঃ ১৫৩৮-১৫৫২)

(৩) অমরদাস (১৫৫২-১৫৭৪)

|

কন্যা

বিবি ভানী = (৪) রামদাস (১৫৭৪-১৫৮১)

(৫) অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬)

(৬) হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫)

গুরুদিত্তা

(৭) হররায় (১৬৪৫-১৬৬১)

(৮) হরকিষণ (১৬৬১-১৬৬৪)

(৯) তেগবাহাদুর (১৬৬৪-১৬৭৫)

(১০) গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮)

১। বাংলার গভর্নর-জেনারেল (১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে নিযুক্ত)

খ্রীস্টাব্দ

১৭৭৪ ওয়ারেন্ হেস্টিংস্
১৭৮৫ স্যার্ জন্ ম্যাক্ফারসন্
১৭৮৬ আর্ল (মার্কুইস্) কর্নওয়ালিস্
১৭৯৩ সার্ জন্ শোর (লর্ড টেইন্মাউথ)
১৭৯৮ সার এলিউর্ড ক্লার্ক
১৭৯৮ মার্কুইস ওয়েলেস্লি
১৮০৫ মার্কুইস্ কর্নওয়ালিস্ (২য় বার)
১৮০৫ সার জর্জ বার্লো
১৮০৭ আর্ল অব্ মিণ্টো (প্রথম)
১৮১৩ মার্কুইস্ অব্ হেস্টিংস্
১৮২৩ জন্ অ্যাডাম
১৮২৩ ব্যারন্ আর্ল আমহার্স্ট
১৮২৮ উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেইলি
১৮২৮ লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্ডিস্ বেণ্টিঙ্ক

২। ভারতের গভর্নর-জেনারেলগণ (১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে নিযুক্ত)

খ্রীস্টাব্দ

১৮৩৩ লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্ডিস্ বেণ্টিঙ্ক
১৮৩৫ সার্ চার্লস্ (লর্ড) মেট্কাফ্
১৮৩৬ ব্যারন (আর্ল অব্) অক্ল্যাণ্ড
১৮৪২ ব্যারন (আর্ল অব্) এলেনবরা
১৮৪৪ সার্ হেন্রী (ভায়কাউণ্ট) হার্ডিং
১৮৪৮ আর্ল (মারকুইস্) অব্ ডালহৌসী
১৮৫৬ ভাইকাউণ্ট (আর্ল) ক্যানিং

(মহারাণীর ঘোষণা-পত্র অনুসারে নিযুক্ত প্রথম ভাইসরয়)

১৮৫৮ আর্ল ক্যানিং

প্রাচীন ভারত

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। হিমালয় পর্বত কিভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে?

২। তিনটি গিরিপথের নাম কর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গিরিপথগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। কোন্ ঐতিহাসিক ভারতবর্ষকে 'নৃতাত্ত্বিক যাদুশালা' বলে বর্ণনা করেছেন? এই কথার তাৎপর্য কি?

৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' কথাটি কোন্ ঐতিহাসিক বলেছেন? এই কথাটির সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌলিক ঐক্যগুলির উল্লেখ কর। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৭। ইতিহাসের 'উপাদান' কাকে বলে? প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় সাহিত্য ও শিলালিপির কতখানি গুরুত্ব আছে?

৮। কৌটিল্য কে? তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কি? ঐ গ্রন্থে কোন্ যুগের ইতিহাস জানা যায়

৯। বাণভট্ট কে? তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কি? ঐ গ্রন্থ থেকে কোন্ রাজা সম্বন্ধে এবং কি জানা যায়?

১০। আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে কোন্ সাহিত্য পাঠ করলে জানা যায়?

১১। কয়েকজন বিদেশী পরিব্রাজকের নাম কর, যাঁদের বিবরণ থেকে প্রাচীন ভারতের সমসাময়িক ইতিহাস জানা যায়।

১২। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মুদ্রার গুরুত্ব আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। পুরাতন প্রস্তর যুগ, অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। সিন্ধু নদ কোন অঞ্চলে প্রবাহিত? সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক কারা?

৩। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো কোথায় অবস্থিত? সিন্ধু সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতা বলা হয় কেন?

৪। হরপ্পান সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা কারা ছিলেন ? এই সভ্যতার ধ্বংসের কারণ কি ?

তৃতীয় অধ্যায়

১। 'আর্য' শব্দের অর্থ কি ? আর্যদের আদি বাসভূমি ও আর্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতগুলির উল্লেখ কর।

২। 'বেদ' কি ? বেদ কয় ভাগে বিভক্ত এবং ভাগগুলির নাম কি ?

৩। আর্যদের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। চতুরাশ্রম বলতে কি বোঝায় ? চতুরাশ্রমের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখ।

৫। বর্ণভেদ প্রথা কাকে বলে ? এই প্রথার কিভাবে জন্ম হয়েছিল ?

৬। ভারতে আর্যদের বসতি বিস্তারের বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। আর্যদের সাহিত্যের নাম কি ? ঐ সাহিত্য পাঠ করে আমরা আর্যদের ধর্মজীবন সম্বন্ধে কি জানতে পারি ?

৮। আর্য সভ্যতাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ? আর্য সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৯। লৌহযুগ বলতে কি বুঝায় ? লৌহযুগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১০। ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদিক সংস্কৃতির প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে প্রতিবাদ আন্দোলন বলতে কি বোঝায় ? ঐ আন্দোলনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণগুলি আলোচনা কর।

২। জৈন ধর্মের সূত্রপাত কে করেছিলেন ? তাঁর মূলশিক্ষা কি ছিল ?

৩। মহাবীরের পূর্বনাম কি ছিল ? তিনি কোথায় জন্মেছিলেন ? তাঁর কোথায় মৃত্যু হয়েছিল ?

৪। পঞ্চ মহাব্রত কে প্রচার করেছিলেন ? পঞ্চ মহাব্রত বলতে কি বোঝায় ?

৫। জৈন নামের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছিল ? জৈন ধর্মের মূল নীতিগুলি কি ?

৬। জৈন ধর্মের দুটি শাখার নাম কর। এই দুটি শাখার জন্ম কিভাবে হয়েছিল ? দুটি শাখার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর মূল পার্থক্য উল্লেখ কর।

৭। বুদ্ধের জন্মস্থান কোথায় ? বুদ্ধ শব্দের অর্থ কি ? বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম কোথায় ধর্মপ্রচার করেছিলেন ? কোথায় তাঁর দেহান্ত হয়েছিল ?

৮। আর্যসত্য কে প্রচার করেছিলেন ? আর্যসত্যগুলি কি কি ?

৯। 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' কাকে বলে ? এই মার্গগুলি কি কি ? 'নির্বাণ' কি ?

১০। 'পঞ্চশীল' কোন ধর্মের বৈশিষ্ট্য ? পঞ্চশীলের উল্লেখ কর।

১১। 'ত্রিপিটক' কি ? ত্রিপিটকের অংশগুলির নাম কর।

১২। 'জাতক' বলতে কি বোঝায় ?

১৩। বৌদ্ধ ধর্মের দুটি শাখার নাম কর।

১৪। 'বৌদ্ধ সঙ্ঘ' ও 'বৌদ্ধ সঙ্গীতি' কি? প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি কেন এবং কোথায় আহ্বান করা হয়েছিল?

১৫। ভারতবর্ষের বাইরে যে সব দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটির নাম কর। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর।

১৬। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও তাঁর মূলনীতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৭। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে চারটি বৃহত্তম রাজ্যের নাম কর। এইগুলির মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন্ রাজ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

২। বিম্বিসার কে? তাঁর পুত্রের নাম কি?

৩। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কি ভাবে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা কে ছিলেন?

৪। চাণক্য কে? তাঁর কি অন্য কোন নাম ছিল? তাঁর গ্রন্থের নাম কি?

৫। বিম্বিসার কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? বিন্দুসার কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? বিম্বিসারের পর কে রাজা হয়েছিলেন? বিন্দুসারের পুত্রের নাম কি?

৬। মেগাস্থিনিস কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন? তিনি কোন্ যুগে ভারতবর্ষে এসেছিলেন? তাঁর গ্রন্থ থেকে আমরা ঐ যুগ সম্বন্ধে কি জানতে পারি?

৭। অশোক 'ধর্মাশোক' নামে কেন খ্যাত হয়েছিলেন?

৮। তুমি কাকে মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট মনে কর? তাঁর কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সূচনা কে করেছিলেন?

১০। আলেকজাণ্ডার কোন্ দেশের রাজা ছিলেন? তিনি যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন মগধে কোন্ বংশের রাজত্ব ছিল? আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি কে ছিলেন?

১১। পুরু কোন্ দেশের রাজা ছিলেন? তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ কেন?

১২। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোন্ রাজবংশকে উচ্ছেদ করেছিলেন? তাঁর সঙ্গে কোন্ গ্রীক সেনাপতির যুদ্ধ হয়েছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

১৩। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল আলোচনা কর।

১৪। গান্ধার কোথায়? গান্ধার-শিল্পের বিকাশ কোন্ যুগে হয়েছিল? এই শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য কি?

১৫। বৌদ্ধ ধর্মে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১৬। ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের সামাজিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।

১৭। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর। তিনটি রাজপুত রাজ্যের নাম কর।

১৮। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কে এবং কেন বিখ্যাত?

আলেকজাণ্ডার, সেলুকাস, খারবেল, গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি, মিহিরকুল, যশোধর্মন।

১৯। কুষাণদের আদি বাসস্থান কোথায়? কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজার কৃতিত্ব আলোচনা কর।

২০। কণিষ্ক কোন্ বংশের রাজা? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল? তাঁর রাজসভার দুজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম কর।

২১। শাতবাহন রাজাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?

২২। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি কে ছিলেন? তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম কর।

২৩। গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২৪। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? গুপ্তবংশের প্রথম খ্যাতনামা সম্রাট কে ছিলেন? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল?

২৫। হরিষেণ কার সভাকবি ছিলেন? তাঁর, রচিত প্রশস্তি থেকে আমরা ঐ সম্রাটের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কি জানতে পারি?

২৬। গুপ্তবংশের কোন্ সম্রাট 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? তিনি অন্য কোন্ নামে খ্যাত হয়েছিলেন? তাঁর রাজসভার বিখ্যাত তিন ব্যক্তির নাম কর।

২৭। ফা-হিয়েন কার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন? তিনি তাঁর বিবরণে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি লিখেছিলেন?

২৮। প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন্ যুগকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়? তার কারণ কি?

২৯। কালিদাস কোন্ রাজার সমসাময়িক ছিলেন? তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম কর। 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

৩০। গুপ্তযুগকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুবর্ণযুগ বলে অভিহিত করার কারণ কি? গুপ্তযুগের অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে কি কারণ ছিল?

৩১। গুপ্তবংশের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর।

৩২। গুপ্তযুগের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩৩। গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। হূণ কারা ছিল? একজন হূণ নেতার নাম কর। হূণদের পরাজিত করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এমন এক ভারতীয় রাজার নাম বল।

২। গৌড় রাজ্যের অবস্থান কোথায় ছিল?

৩। গৌড় রাজ্যের উত্থানের মূলে কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। হর্ষবর্ধন কোন্ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন? তাঁর সঙ্গে শশাঙ্কের কেন যুদ্ধ হয়েছিল? দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে হর্ষ কোন্ রাজার কাছে বাধা পেয়েছিলেন?

৫। হিউয়েন-সাঙ কার রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন? তাঁর লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৬। কোন্ অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'ত্রি-শক্তি সংগ্রাম' হয়েছিল? কোন্ কোন্ শক্তি এই সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল?

৭। কনৌজের গুর্জর-প্রতিহার বংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৮। প্রতিহার বংশের পতনের পর কোন্ কোন্ রাজপুত রাজ্যের জন্ম হয়?

৯। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কিভাবে সিংহাসনে বসেছিলেন?

১০। ধর্মপাল কিভাবে উত্তর ভারতে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন? তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন?

১১। দেবপালকে পাল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?

১২। সেন যুগের একজন খ্যাতনামা কবি এবং তাঁর কাব্যের নাম কর।

১৩। কৌলিন্য প্রথা কে প্রবর্তন করেছিলেন? কৌলিন্য প্রথার অর্থ কি?

১৪। দক্ষিণ ভারতের তিনটি খ্যাতনামা রাজত্বের নাম কর।

১৫। প্রাচীন তামিল রাজ্যগুলির সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৬। দ্বিতীয় পুলকেশী কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৭। 'আইহোল' লিপি কার রচনা?

১৮। রাষ্ট্রকূট শক্তির উত্থান ও পতন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৯। রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?

২০। চালুক্য স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২১। পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন?

২২। পল্লব ও চালুক্যদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের আলোচনা কর।

২৩। তাঞ্জোরের চোল রাজ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২৪। চোল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২৫। রাজরাজ প্রথম ও রাজেন্দ্র চোলদেবের বহির্ভারতে অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

১। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

২। বাণভট্ট কে? তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থের নাম কর।

৩। প্রাচীন ভারতের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৪। শীলভদ্র কে? দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ কে ছিলেন? তিনি কোথায় দেহরক্ষা করেছিলেন?

৫। মহাবলীপুরম কোথায়? রামানুজ কোন্ ধর্মের সাধক ছিলেন?

৬। দক্ষিণ ভারতে বিদ্যাচর্চার প্রসার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। 'আলবার' নামের অর্থ কি?

৮। অদ্বৈতবাদ কে প্রচার করেছিলেন? এই মতবাদের মূল কথা কি?

৯। গুপ্তোত্তর যুগে ভক্তিবাদের জন্ম এবং প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১০। সেন যুগের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১১। পাল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?
১২। বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

মধ্যকালীন ভারত

প্রথম অধ্যায়

১। মুসলিম ভারত না বলে 'মধ্যকালীন ভারত' বলা যুক্তিসংগত কেন ?
২। মধ্যযুগে ফার্সী ভাষায় যে সব ইতিবৃত্ত লেখা হয়েছিল, তার দুটির নাম কর।
৩। ভারতে ইসলামের অভ্যুদয় ও আরব অভিযানের বিষয় আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। সবুক্তগীন কোন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ?
২। উত্তর ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৩। ভারতে মুসলমান বিজয়ের সূচনা কে করেন ? তিনি কাকে পরাজিত করেন ?
৪। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৫। সুলতান মামুদ কত খ্রীস্টাব্দে সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন? এসম্বন্ধে যা জান লেখ।
৬। তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৭। দাস বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন ? দাস বংশ নামকরণ কেন হয়েছিল ?
৮। ইলতুৎমিসকে দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয় কেন ?
৯। সুলতানা রজিয়া কে ছিলেন? রজিয়া শান্তিতে রাজ্যশাসন করতে পারেন নি কেন?
১০। সুলতানী আমলের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১১। গিয়াসুদ্দীন বলবন কোন বংশের শাসক ছিলেন? তিনি কিভাবে তাঁর সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেছিলেন ?
১২। তুঘ্রিল খাঁ কে ছিলেন? তাঁর বিরুদ্ধে কে অভিযান করেছিলেন? তুঘ্রিল খাঁর শেষ পরিণাম কি হয়?
১৩। গিয়াসুদ্দীন বলবনের সামরিক সংস্কার ও রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১৪। আলাউদ্দীন খলজী কি উপায়ে সিংহাসন লাভ করেছিলেন?

১৫। আলাউদ্দীন খলজী কিভাবে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন? তাঁর একজন বিখ্যাত সভাসদের নাম কর।

১৬। আনন্দপাল, পৃথ্বীরাজ, মালিক কাফুর এবং আমীর খসরু কে এবং কেন বিখ্যাত?

১৭। আলাউদ্দিন সাম্রাজ্যে ষড়যন্ত্র ও বিশৃংখলা প্রতিরোধের জন্য কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন?

১৮। তুঘলক বংশের সূচনা কিভাবে হয়?

১৯। ইতিহাসে 'পাগলা রাজা' নামে কে পরিচিত? তাঁকে এই নামে অভিহিত করার কারণ কি?

২০। মহম্মদ-বিন্ তুঘলকের পর কে দিল্লির সিংহাসনে বসেছিলেন? তাঁর রাজত্ব কালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২১। তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২২। লোদীবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? কিভাবে?

২৩। প্রথম পানিপথের যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী ছিল?

২৪। সুলতানী-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

তৃতীয় অধ্যায়

১। বাংলা দেশে ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়?

২। হুসেন শাহ এবং নসরৎশাহের রাজত্ব কাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। বাহমণী-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে? এই রাজ্যের নাম বাহমণী-কেন হল?

৪। বিজয় নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? বিজয় নগরের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। বাহমণী ও বিজয় নগরের দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও কারণগুলি আলোচনা কর।

৬। বিজয় নগর রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে লেখ।

৭। বাহমণী রাজ্যের শেষ অবস্থায় যে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হয়, তাদের নাম লেখ।

৮। দেবরায় ও কৃষ্ণ রায়ের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। ভক্তি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?

২। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা দুজনের নাম কর।

৩। শ্রীচৈতন্যদেব কোথায় জন্মেছিলেন? তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল কথা কি?

৪। নামদেব ও একনাথ কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন? তাঁদের শিক্ষার মূল কথা কি?

৫। সুলতানী যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। দুজন সুফী সাধকের নাম কর। লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

৭। সুলতানী যুগে শিল্পরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের উল্লেখ কর।

মুঘল যুগ ১৫২৬-১৭০৭

প্রথম অধ্যায়

১। মুঘল যুগে ফার্সী ভাষায় রচিত দুটি ইতিবৃত্তের নাম কর।

২। আবুল ফজল কে ছিলেন? তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কি?

৩। মুঘল যুগের তিনজন বৈদেশিক পর্যটকের নাম কর।

৪। মুঘল যুগের অধিকাংশ ইতিহাসগুলি নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য নয় কেন?

৫। বাবরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। তিনি কিভাবে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন?

৬। বাবরের আত্মজীবনীর নাম কি? এই গ্রন্থটি কোন্ ভাষায় রচিত হয়েছিল?

৭। খানুয়া ও গোগরার যুদ্ধ কত খ্রীস্টাব্দে হয়? এই দুটি যুদ্ধ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৮। হুমায়ুনের গুজরাট অভিযান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। হুমায়ুন ও শের খাঁর বিরোধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১০। কোন্ আফগান নেতা মুঘলদের পরাজিত করে উত্তর ভারতে আফগান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন? মুঘল সম্রাটের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনী বিবৃত কর।

১১। শেরশাহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১২। শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা কর।

১৩। শেরশাহের ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৪। শেরশাহের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ও অন্যান্য সংস্কার সম্বন্ধে পর্যালোচনা কর।

১৫। শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের পরিণতি কি হয়?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বৈরাম খাঁ কে? তিনি কেন বিখ্যাত? তাঁর পরিণতি কি হয়েছিল?

২। আকবর কিভাবে সিংহাসনে বসেন? তখন মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা কি ছিল?

৩। শেরশাহ ও আকবরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। শেরশাহ ও আকবরের হিন্দু নীতির বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৫। আকবরের রাজপুত নীতি পর্যালোচনা কর।

৬। সম্রাটরূপে আকবরের সাফল্যের কারণ কি ছিল?

৭। সুশাসক এবং শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগীরূপে আকবরের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৮। মেবারের দুজন বিখ্যাত রাণার নাম কর এবং তাঁদের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা কর।

৯। আকবরের রাজসভা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১০। আকবরের আমলের গৃহনির্মাণ ও স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

১১। আকবরের রাজত্বকালে দুজন ঐতিহাসিকের নাম কর।

১২। আকবরের রাজসভায় যে সকল কবি, গায়ক, সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ, সুরসিক, চিত্রকর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, তাঁদের নাম কর।

তৃতীয় অধ্যায়

১। জাহাঙ্গীর কে ছিলেন? জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরুর বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। নুরজাহান কে? তাঁর কতৃত্বের বিরুদ্ধে কে বিদ্রোহ করেছিলেন?

৩। শাহজাহানের দাক্ষিণাত্যে রাজ্যজয় সম্বন্ধে যাহা জান বিবৃত কর।

৪। শাহজাহানের রাজত্বকাল গৌরবময় বলে খ্যাত কেন?

৫। শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তির নাম কর।

৬। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের ইউরোপীয় বণিকদের প্রতি বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ ভাগে উত্তরাধিকারের যুদ্ধ বলতে কি বোঝ? এই যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল? এর পরিণতি কি হয়েছিল?

২। কত খ্রীস্টাব্দে ঔরংজীবের রাজ্যাভিষেক হয়? 'আলমগীর' শব্দের অর্থ কি?

৩। ঔরংজীবের রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। ঔরংজীব ও আকবরের ধর্মনীতির পার্থক্য কি ছিল?

৫। ঔরংজীবের রাজপুত নীতি ব্যাখ্যা কর।

৬। দুর্গাদাস ও রাজসিংহ কে ছিলেন? রাজপুতদের সঙ্গে ঔরংজীবের সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণনা কর।

৭। ঔরংজীবের সামরিক ও অসামরিক শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৮। 'পার্বত্য মূষিক' বলতে কাকে বোঝায়? 'দাক্ষিণাত্যের ক্ষত' কথাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি?

৯। ঔরংজীবের চরিত্রের প্রশংসনীয় দিকগুলি উল্লেখ কর।

১০। ঔরংজীবের দাক্ষিণাত্য নীতির সুদূরপ্রসারী ফল কি হয়েছিল?

১১। শিবাজীর সামরিক ও অসামরিক শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা কর।
১২। শাসক হিসাবে শিবাজীর মূল্যায়ন কর।
১৩। ঔরংজীবের রাজত্বকালে ইউরোপীয় বণিকদের কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১৪। শাসক হিসাবে ঔরংজীবের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। মুঘল যুগে ভারতের বেশীর ভাগ অংশে রাষ্ট্রীয় ঐক্য গঠনের প্রয়াস সম্বন্ধে আলোচনা কর।
২। মুঘল যুগের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা কর।
৩। মুঘল যুগে জায়গীরদারি প্রথা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আলোচনা কর।
৪। মুঘল যুগে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে যা জান বিবৃত কর।
৫। মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৬। মুঘল যুগে হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক আদান প্রদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৭। মুঘল যুগের দুজন সাহিত্যিক ও তাঁদের একটি করে গ্রন্থের নাম কর।
৮। ইন্দো-পারসীক শিল্প বলতে কি বোঝায়? এই শিল্পরীতির নিদর্শনের উল্লেখ কর।
৯। মুঘল যুগের চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১০। মুঘল যুগের কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
১১। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুঘল যুগের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ভারতের ইতিহাস—১৭০৭-১৮৫৭

প্রথম অধ্যায়

১। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি? এ সম্বন্ধে ঔরংজীবের দায়িত্ব কতখানি?
২। নাদির শাহ কে ছিলেন? নাদির শাহের ভারত আক্রমণের ফল কি হয়েছিল?
৩। আহম্মদ শাহ দুরাণী কে ছিলেন? আহম্মদ শাহ দুরাণী কোন ঐতিহাসিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন? ঐ যুদ্ধে তাঁর প্রতিপক্ষ কারা ছিল?
৪। মুঘল যুগের পতনোন্মুখ অবস্থায় জায়গীর প্রথার কি অবস্থা হয়েছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থায় আঞ্চলিক শক্তির উত্থান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। মুর্শিদকুলি খাঁ কত খ্রীস্টাব্দে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে কারা বিদ্রোহ করেন এবং সেই বিদ্রোহের ফল কি হয়েছিল?

৩। আলিবর্দি কিভাবে বাংলার নবাব হন?

৪। মুর্শিদকুলির আমলে জায়গীর এবং ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সংক্ষেপে আলোচনা কর। এই সময়ে বিদেশী বণিকদের কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। নিজাম-উল-মুলুক্ আসফ ঝা কত খ্রীস্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন? আসফ ঝার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। সাদাত খাঁ কত সালে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন? অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করে তিনি কাদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন এবং এই বিদ্রোহের পরিণতি কি হয়?

৭। সাদাত খাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা কর।

৮। সফদর জঙ্গ কে ছিলেন? তিনি কবে অযোধ্যার নবাব হন?

৯। সফদর জঙ্গ এর সময়ে রাজ্যে যে সব সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, তিনি কিভাবে তার মোকাবিলা করেন?

১০। হায়দার আলী কে ছিলেন? তিনি কিরূপে মহীশূরের শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করেন।

১১। টিপু সুলতান কি ধর্মান্ধ ছিলেন? আলোচনা কর।

১২। মারাঠা জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সাহায্য করেছিলেন এমন একজন ধর্মসংস্কারকের নাম কর।

১৩। শিবাজীর জন্মস্থান কোথায়? তিনি কাদের নিয়ে সৈন্যদল গঠন করেন?

১৪। শিবাজী প্রথম কোন দুর্গ জয় করেন ও তাঁর রাজ্যাভিষেক কোন সালে হয়েছিল?

১৫। শিবাজীর সঙ্গে ঔরংজীবের সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত কর।

১৬। পেশোয়া পদের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? 'চৌথ', 'সরদেশমুখী', 'বারগীর' ও 'শীলাদার' বলতে কি বোঝায়?

১৭। পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কে? তাঁর শাসনকাল পর্যালোচনা কর।

১৮। বালাজী বাজীরাও কে ছিলেন? তাঁর সময়ে কোন ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়েছিল? ঐ যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর।

১৯। 'গ্রন্থসাহেব' কি? এটি কে সঙ্কলন করেছিলেন? মসন্দ প্রথা কে প্রবর্তন করেন?

২০। তেগ বাহাদুর কে? তাঁর কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল? তাঁর পুত্রের নাম কি?

২১। গুরু গোবিন্দ শিখ ইতিহাসে কিভাবে নবযুগের সূচনা করেছিলেন?

২২। মোট কজন শিখগুরু ছিলেন? প্রথম ও শেষ গুরুর নাম কর। 'খালসা' শব্দের অর্থ কি? 'খালসা' সৃষ্টির তাৎপর্য কি?

তৃতীয় অধ্যায়

১। কত খ্রীস্টাব্দে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার হয় এবং কে প্রথম ভারতবর্ষের উপকূলে উপনীত হন ?

২। পোর্তুগীজরা কোন্ সময়ে এবং কোথায় কোথায় ভারতে প্রথম বাণিজ্যকুঠী স্থাপন করে ?

৩। কত খ্রীস্টাব্দে ওলন্দাজ বাণিজ্যিক সংস্থা স্থাপিত হয় এবং তার নাম কি ?

৪। কত খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় ? ভারতে সর্বপ্রথম কোথায় ইংরাজ কুঠি নির্মিত হয় ?

৫। কলকাতা নগরীর পত্তন কে এবং কোন্ সালে করেছিলেন ? কলকাতায় নির্মিত দুর্গের নাম কি ?

৬। মুঘলদের সঙ্গে ইংরাজদের কি জন্য বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের পরিণতি কি হয়েছিল ?

৭। প্রেসিডেন্সি শব্দের অর্থ কি ? ভারতবর্ষে তিনটি ইংরাজ প্রেসিডেন্সির নাম কর।

৮। দুপ্লে কে ছিলেন ? তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল ? তাঁর উদ্দেশ্য কেন ব্যর্থ হয়েছিল ?

৯। ফরাসী বাণিজ্যিক সংস্থা কোন্ সময় গঠিত হয় ? ফরাসীরা কোথায় কোথায় বাণিজ্যকুঠী নির্মাণ করে।

১০। কটি কর্ণাটকের যুদ্ধ হয়েছিল ? কর্ণাটকের তখন নবাব কে ছিলেন ? কর্ণাটকের দুজন ফরাসী ও একজন ইংরাজ নায়কের নাম কর।

১১। কর্ণাটকের যুদ্ধে ফরাসী ব্যর্থতার কারণ কি ?

১২। ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান কখন ও কিভাবে হয়েছিল ?

চতুর্থ অধ্যায়

১। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল ?

২। ১৭১৭ সালের (ফারমান) সনদ কোন্ মুঘল সম্রাট ইংরাজদের দিয়েছিলেন ? এই সনদের দ্বারা ইংরাজরা ভারতে বাণিজ্য করার কি কি সুবিধা পেয়েছেন ?

৩। সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধের কারণগুলি আলোচনা কর।

৪। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পক্ষে দুজন বীর সেনাপতির নাম কর। কোন্ সর্তে মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদের ষড়যন্ত্র হয়েছিল ? এই যুদ্ধের গুরুত্ব কি ?

৫। ১৭৫৭, ১৭৬৪, ১৭৬৫—এই তিনটি সালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

৬। মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজদের কেন বিরোধ দেখা দিয়েছিল ?

৭। মীরকাশিম ও মীরজাফরের চরিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কি ?

৮। বক্সারের যুদ্ধে কোন্ পক্ষের পরাজয় হয় এবং বক্সারের পর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত হয়?

পঞ্চম অধ্যায়

১। বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার গভর্ণর কে হন? তাঁর শাসনকালে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ দাও।

২। ক্লাইভের কৃতিত্ব ও তাঁর চরিত্র বর্ণনা কর।

৩। প্রথম মাধব রাও পেশোয়া কে ছিলেন? 'তাঁর শাসনকালে, তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন'—আলোচনা কর।

৪। সুরাটের সন্ধি কত সালে হয়। এই সন্ধি কার কার সঙ্গে হয় এবং সন্ধির সর্ত বিবৃত কর।

৫। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান কোন্ সন্ধির দ্বারা হয়েছিল? ঐ সন্ধির সর্ত কি ছিল?

৬। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের কারণ কি? এই যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

৭। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় পেশোয়া কে ছিলেন? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

৮। মারাঠা শক্তির পতনের কারণ বর্ণনা কর।

৯। হায়দার আলির সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধের কাহিনী বর্ণনা কর।

১০। টিপু সুলতান কে ছিলেন? তাঁর সঙ্গে ইংরাজদের সংঘর্ষের কাহিনী বিবৃত কর।

১১। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির সর্ত কি ছিল? এই সন্ধির গুরুত্ব কি?

১২। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ কত সালে হয়? এই যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

১৩। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক কে? এই নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

১৪। চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের কারণ কি ছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

১৫। পিণ্ডারী কারা? পিণ্ডারীদের কে কিভাবে দমন করেছিলেন?

১৬। প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সময়ে শিখদের নেতা কে ছিলেন? কোন্ সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়?

১৭। স্বত্বলোপ নীতির প্রবর্তক কে? এই নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

১৮। ডালহৌসী প্রধানতঃ কোন্ নীতির সাহায্যে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন? ডালহৌসী নীতির কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল?

১৯। ব্রিটিশ ভারতের সহিত পাঞ্জাবের সংযুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২০। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য এবং ব্রিটিশদের যুদ্ধে জয়লাভের মুখ্য কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। 'দেওয়ানী' বলতে কি বোঝায়? কোম্পানী কি ভাবে 'দেওয়ানী' লাভ করেছিল?

২। 'দ্বৈত শাসন' কে প্রবর্তন করেছিলেন? দ্বৈতশাসন বলতে কি বোঝায়? এই শাসন ব্যবস্থার কুফল কি হয়েছিল?

৩। হেস্টিংসের শাসন, বিচার বিষয়ক ও রাজস্ব সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' কোন সালে প্রবর্তিত হয়? এই অ্যাক্টের সর্তগুলি উল্লেখ কর।

৫। 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিটের 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' এর ফলে কোম্পানীর গঠনতন্ত্র ও ভারত শাসন ব্যবস্থার কি কি পরিবর্তন হয়েছিল উল্লেখ কর।

৬। কর্ণওয়ালিসের শাসন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারের পর্যালোচনা কর।

৭। ব্রিটিশ-ভারতের প্রেসিডেন্সিগুলির শাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা কর।

৮। ব্রিটিশ ভারতে বিচার ব্যবস্থার সূচনা, সুপ্রীম কোর্ট ও সদর আদালত স্থাপনের বিবরণ লেখ।

৯। উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের অর্থসংক্রান্ত ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারগুলির বিবরণ দাও।

১০। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন সালে এবং কে প্রবর্তন করেন? এই বন্দোবস্তের সুফল এবং কুফলগুলি আলোচনা-কর।

১১। ব্রিটিশ ভারতে পুলিশ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও ঐ ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১২। ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং তার ফল কি হয়?

সপ্তম অধ্যায়

১। ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও দেশীয় হস্ত শিল্পের বিনাশ কিভাবে হয়েছিল?

২। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের বিপর্যয়ের কারণ বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

১। কোম্পানীর শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। এশিয়াটিক সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন? এই সোসাইটি কত সালে এবং কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৩। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা-সংস্কারক রূপে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। সতীদাহ প্রথা কোন্ গভর্নর-জেনারেল উচ্ছেদ করেছিলেন? কোন্ ভারতীয় নেতা এই প্রথার অবসানে সহায়তা করেছিলেন। বিধবাবিবাহ আইন কোন্ বৃটিশ শাসকের সময় প্রবর্তিত হয়েছিল? বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?

৫। উইলিয়াম কেরী এবং ডেভিড হেয়ার কেন প্রসিদ্ধ?

৬। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালের শিক্ষাসম্বন্ধীয় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার নাম কর।

৭। শিশুহত্যা প্রথা কে নিষিদ্ধ করেছিলেন? কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কার শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত হয়? সতীদাহ প্রথার অবসান কোন্ সালে হয়েছিল? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৮। উনিশ শতকের নবজাগরণের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

৯। রাজা রামমোহন রায়কে ভারতবর্ষে নবযুগের প্রবর্তক রূপে অভিহিত করার সপক্ষে তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজের আলোচনা কর।

১০। ব্রাহ্মসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? এই সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ছিল? পরবর্তী যুগের ব্রাহ্ম নেতাদের মধ্যে দুজনের নাম কর।

১১। ডিরোজিও কে ছিলেন? তাঁর অনুগামী ছাত্ররা কি নামে পরিচিত হয়েছিল? তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে দুজনের নাম কর।

১২। নব্যবঙ্গীয় বলে কারা পরিচিত হয়েছিলেন? তাঁদের প্রগতিশীল ভূমিকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

১৩। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ব্রাহ্ম আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা আলোচনা কর।

১৪। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামহের নাম কি? বাংলার নবজাগরণে তাঁদের অবদান কি ছিল?

১৫। প্রার্থনা-সমাজের নীতি ও আদর্শ কি ছিল? এই সমাজের একজন বিশিষ্ট নেতার নাম কর।

১৬। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? এর মূলনীতি ও কর্মসূচীর আলোচনা কর।

১৭। 'যতমত তত পথ'—এই বাণী কার? তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য কে?

১৮। 'দয়ার সাগর' নামে ইতিহাসে কে পরিচিত? শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৯। আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

২০। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে চেতনার উন্মেষে স্যার সৈয়দ আহমদের ভূমিকা আলোচনা কর।

২১। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা কর।

২২। ভারতীয় ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দর ভূমিকা আলোচনা কর।

২৩। ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে রামমোহনের অবদানের কথা আলোচনা কর।

২৪। উনিশ শতকের সূচনা থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের একটি বিবরণ দাও।

নবম অধ্যায়

১। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের পূর্বে ভারতবর্ষে যে সব বৃটিশ বিরোধী প্রচেষ্টা হয়েছিল তার উল্লেখ কর।

২। ওয়াহাবি ও ফেরাজি আন্দোলন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ।

৩। কোল এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। তিতুমীর কে ছিলেন? তাঁর আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

দশম অধ্যায়

১। ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের আগে বৃটিশ বিরোধী তিনটি আন্দোলনের এবং দুজন নেতার নাম কর।

২। মহারাজ নন্দকুমার, ধুন্দিয়া ও ওয়াজির আলি কেন প্রসিদ্ধ?

৩। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

৪। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করার পক্ষে এবং বিপক্ষে যে মতগুলি আছে তা আলোচনা কর।

৫। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের তিনজন নেতার নাম এবং তাঁরা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন তা উল্লেখ কর।

৬। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

৭। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের ফলাফল কি হয়েছিল?

বিষয়মুখ প্রশ্নের অনুশীলন

(Objective Questions)

১। গঙ্গা ও সিন্ধুনদীর উৎসস্থল কোথায়?

২। কোন সভ্যতা "নীলনদের দান" রূপে খ্যাত?

৩। প্রাচীন ইতিহাসের একটি উপাদানের উল্লেখ কর।

৪। সিন্ধু সভ্যতা মূলতঃ কি সভ্যতা ছিল?

৫। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা কোনটি?

৬। বৈদিক আরাধনার অন্তর্নিহিত মূল আদর্শ ও লক্ষ্য কী ছিল?

৭। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় সন্ধান করা কোন ধর্মের প্রধান লক্ষ্য?

৮। কুষাণ যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন?

৯। ঐতিহাসিক স্মিথ কোন্ সম্রাটকে "ভারতের নেপোলিয়ন" আখ্যা দিয়েছেন?

১০। হিউয়েন-সাঙ কার রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন?

১১। পাল রাজত্বের সূচনা করেছিলেন কে?

১২। কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন কে ?
১৩। আঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দিরটি কোথায় অবস্থিত ?
১৪। শৈলেন্দ্রবংশের স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি ?
১৫। দাসবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন ?
১৬। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন কোন সুলতান ?
১৭। খানুয়ার যুদ্ধে বাবর কাকে পরাজিত করেন ?
১৮। তানসেন কোন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন ?
১৯। হলদিঘাটের যুদ্ধে কে পরাজিত হন ?
২০। কোন সম্রাটের রাজত্বকাল থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল ?
২১। কোন সম্রাটের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ?
২২। আফজল খাঁকে কে নিহত করেছিলেন ?
২৩। দশম শিখগুরু কে ছিলেন ?
২৪। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে প্রবর্তন করেছিলেন ?
২৫। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ কার শাসনকালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?
২৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেছিলেন ?
২৭। ব্রাহ্ম সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
২৮। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কে আন্দোলন করেছিলেন ?
২৯। আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
৩০। ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন ?
৩১। ফেরাজি আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন ?
৩২। ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রবক্তা কে ?
৩৩। তিতুমীর কে ?
৩৪। মহাবিদ্রোহ কত খ্রীস্টাব্দে হয় ?

(খ) কোন উত্তরটি সঠিক নির্দেশ কর ঃ

[উদাহরণ ঃ প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সূচনা করেন (ক) আলেকজাণ্ডার (খ) কুজল কদফিস্ (গ) কুরুস।

উত্তর ঃ কুরুস।]

১। আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ঃ (ক) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (খ) রামায়ণ-মহাভারত (গ) বৈদিক সাহিত্য (ঘ) বৈদেশিক বিবরণ।

২। মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন ঃ
(ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ) বিন্দুসার (গ) অশোক (ঘ) বিম্বিসার।

৩। সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় ঃ
(ক) মৌর্য যুগকে (খ) কুষাণ যুগকে (গ) পাল যুগকে (ঘ) গুপ্ত যুগকে।

৪। বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন ঃ
(ক) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ (খ) শীলভদ্র (গ) জ্ঞানচন্দ্র (ঘ) বোধিসেন।

৫। ভারতে মুসলমান বিজয়ের সূচনা করেছিলেন ঃ
(ক) বাবর (খ) আলাউদ্দীন খলজী (গ) মহম্মদ বিন্ কাসিম (ঘ) কুতবউদ্দীন।

৬। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' ও কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' রচিত হয়েছিল ঃ
(ক) গুপ্তযুগে (খ) সেনযুগে (গ) সুলতানী যুগে (ঘ) মুঘল যুগে।

৭। "চৌথ" ও "সরদেশমুখী" ছিল ঃ
(ক) দুজন রাজার নাম (খ) জায়গার নাম (গ) দুই প্রকার কর (ঘ) দুই শ্রেণীর সৈন্য।

৮। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন ঃ
(ক) লর্ড ক্যানিং (খ) লর্ড ডালহৌসী (গ) লর্ড ওয়েলেসলি।

(গ) সময়ানুক্রমিকভাবে সংখ্যা নির্দিষ্ট কর ঃ

[উদাহরণ ঃ হুমায়ুন ২ ঔরংজীব ৬ জাহাঙ্গীর ৪
বাবর ১ আকবর ৩ শাহজাহান ৫]

১। কুষাণ যুগ
মৌর্য যুগ
হর্ষের রাজত্বকাল
গুপ্ত যুগ
পাল যুগ

২। মেগাস্থিনিস
আবুল ফজল
মহাবীর বর্ধমান
কালিদাস
দয়ানন্দ সরস্বতী

৩। আলাউদ্দীন খলজী
ইব্রাহিম লোদী
মহম্মদ বিন্ তুঘলক
ইলতুৎমিস
মহাবিদ্রোহ

৪। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ
বক্সারের যুদ্ধ
দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ
হলদিঘাটের যুদ্ধ

৫। বিধবা বিবাহ আন্দোলন
ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
সতীদাহ প্রথার অবসান

(ঘ) নিম্নলিখিত তারিখগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি ঃ

২৭৩ খ্রীঃ পূঃ ; ৬০৬ খ্রীস্টাব্দ ; ১৫২৬ ; ১৫৫৬ ; ১৭৫৭ ; ১৭৬১ ; ১৭৬৪
১৭৬৫ ; ১৭৮৪ ; ১৭৯৩ ; ১৮৩৬ ; ১৮৫৭।

S.C.E.R.T., West Bengal Library

H IX
N I M

Bose : History of India for Class IX, Bengali

Rs. 25.00